স্ত্রী

বিমল মিত্র

boiRboi.blogspot.com

স্ত্রী

বিমল মিত্র

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট • কলিকাতা-৭৩

দ্বিতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪০৫

—ষাট টাকা—

STREE
A novel by Bimal Mitra. Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd., 10 Shyama Charan Dey Street, Calcutta-700 073

Price Rs. 60/-

ISBN : 81-7293-503-8

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ, ১৫২ মানিকতলা মেন রোড,
কলিকাতা-৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

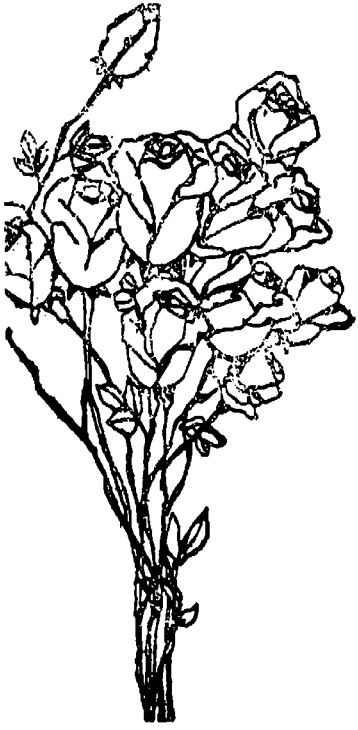

উপন্যাস সূচী

স্ত্রী	১
স্ত্রী জাতক	৪৩
বেনারসী	১১৫

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সবিশেষ নিবেদন

আমার পাঠক-পাঠিকাবর্গের সতর্কতার জন্য জানাচ্ছি যে সম্প্রতি তিন-চারটি উপন্যাস 'বিমল মিত্র' নাম-যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। অপরের প্রশংসাও যেমন আমার প্রাপ্য হওয়া উচিত নয়, তেমনি অপরের নিন্দাও আমার প্রাপ্য নয়। অথচ প্রায় প্রত্যহই আমাকে সেই দায় বহন করতে হচ্ছে। পাঠক-পাঠিকাবর্গের প্রতি আমার বিনীত বিজ্ঞপ্তি এই যে সেগুলি আমার রচনা নয়। একমাত্র 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ছাড়া, আমার লেখা প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার স্বাক্ষর মুদ্রিত থাকে।

বিমল মিত্র

स्त्री

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

খবরটা কেমন করে যেন জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। হয়ত এ-সব খবর সাধারণত চাপা থাকে না। হয়ত মধুসূদন স্যাকরাই সকলকে বলে দিয়েছিল। কিংবা হয়ত বলরামবাবুই বলে দিয়েছিলেন। কারণ, মাধব দত্ত যখন বাগবাজারে গিয়েছিলেন তখন বলরামবাবুই সেখানে হাজির ছিলেন। তিনিই বলতে গেলে একমাত্র সাক্ষী ছিলেন এ-ব্যাপারে।

গল্পটা গোড়া থেকে শুনুন।

ফড়িয়াপুকুরের মাধব দত্তরা আজকের লোক নয়। এককালে বৈভব ছিল, বোল-বোলা ছিল। বাইরে থেকে লাল রং-এর বাড়িটা দেখলে ভেতরের ঐশ্বর্যের পরিচয় কিছু পাওয়া যেত না বটে, কিন্তু বাড়ির ভেতরে ঢুকলেই আর চোখ ফেরানো যেত না। গেট পেরিয়ে সোজা ইট-বাঁধানো লম্বা রাস্তাটা একেবারে উত্তর প্রান্তের ঘোড়ার আস্তাবলে গিয়ে ঠেকেছে। সেখানে সহিস-কোচোয়ান আর চাকর-বাকরদের আস্তানা। তার বাঁদিকে পশ্চিম দিক ঘেঁষে আসল বাড়িটা। সেখানে উত্তরমুখো বৈঠকখানায় ফরাসের ওপর ফরসা চাদর পাতা থাকতো—সার সার তাকিয়া থাকতো। গড়গড়া ফরসি তামাক পানের আয়োজন থাকতো। আর সামনের গাড়ি-বারান্দার পরেই ছিল লম্বা একটা বারান্দা। সেখানে থাকতো খানচারেক বেঞ্চি। কাঠের বেঞ্চি। সেখানেই মাধব দত্ত বসতেন, আড্ডা দিতেন, তামাক খেতেন, এবং আরো অনেক কিছুই খেতেন। তা-ও শেষকালের দিকে। তখন মাধব দত্তর বয়েস হয়েছে অনেক। রক্তের তেজ কমে গিয়েছে। তখন আর নড়তে পারতেন না যখন-তখন। তখন আর খুশিমত রাত জাগতে পারতেন না। রাত জেগে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ফুর্তি করতে পারতেন না। একটু বেশি খেলেই পেটের বাঁ-দিকটা কন্-কন্ করতো। সময়-সময় কোমরও ভাল করে সোজা করতে পারতেন না। তখন গরম-জলের বোতল আসতো, মালিশ হতো ঘণ্টায় ঘণ্টায়, তখন ডাক্তার-কবিরাজ আসতো। তখন মাধব দত্তর পড়তি অবস্থা।

আসলে পৈতৃক সম্পত্তি হলেও, কাকারা খুড়োরা আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন অনেক দিন আগেই। কেউ বাড়ি করেছিলেন হাটখোলায়, কেউ হাতীবাগানে। অর্থাৎ মাধব দত্তর যখন পরিপূর্ণ যৌবন সেই সময়েই প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়ে গেলেন তিনি। বাবা শশী দত্তর একমাত্র ছেলে মাধব দত্ত। সুতরাং মাধব দত্তর সম্পত্তি আর ভাগাভাগি হলো না। তিনি রাতারাতি একেবারে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসলেন। আর মোসাহেব জুটে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। মোসাহেব ছিলই আগে থেকে, কিন্তু তারা সংখ্যায় বাড়লো, তোষামোদ তীব্রতর হলো, বিনয়ও আরো বিগলিত হলো। তখন আর রাত্রে বাড়িতে থাকবার মত মেজাজ নয় তাঁর। যেমন হয় এসব ক্ষেত্রে, তেমনিই হলো। মাধব দত্ত সারা রাত বাইরে কাটিয়ে ভোরবেলা বাড়ি আসতেন। এসে নিদ্রাটা দিতেন নিজের বাড়িতে। বেলা বারোটা-একটার সময় একবার উস্‌খুস করতেন, আড়ামোড়া ভাঙতেন পাশ ফিরতেন। সেই সময় কিছু পেটে পড়তো তাঁর। একটু চা, কি দুটো বিস্কুট, কি ওই রকম কিছু। তারপর সেই ঘুম ভাঙতো বিকেল চারটের সময়। সকাল থেকে যে-সব লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বসে থাকতো, সেই সময়টা সামনে আসবার জন্যে তাদের হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। অ্যাটর্নী, উকিল, দালাল, তাগাদাদার, দেনদার, পাওনাদার,

BanglaBook.org

প্রার্থী সবারই সেই একটা মাত্র সময়। সারা দিনের মধ্যে ওই একটা সময়েই কেবল মাধব দত্তর সঙ্গে দেখা করবার পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু আরো একটা ল্যাঠা ছিল। সেই বিকেল চারটের সময় ঘুম থেকে উঠে তখন পুজোয় বসবার সময় তাঁর। আধঘণ্টা সময় লাগতো তাঁর পুজোর জন্যে। চারটে থেকে সাড়ে চারটে। শিবপুজো করতেন তিনি পুজোর দালানে। যেখানে চাকর-বাকর তটস্থ হয়ে থাকতো তাঁর জন্যে। বাঘছালের আসন, কোষাকুষি, বেলপাতা, গঙ্গাজল—সমস্ত আয়োজন নিখুঁত হওয়া চাই। না হলে, মাধব দত্তর হাতে মাথা কাটা যাবে সকলের।

যখন পুজো থেকে উঠবেন, তখন বৈঠকখানায়, খাজাঞ্চিখানায়, সেরেস্তার ভিড় জমে গেছে লোকের।

মাধব দত্ত বৈঠকখানায় নামতেন আর অপেক্ষমান জনতা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতো তাঁর সঙ্গে আগে কথা বলবার জন্যে। সরকার হিসেবের খাতাপত্র নিয়ে হাজির করতো। চাকর-বাকররা পানদান, তামাক, গড়গড়া-ফরাসী নিয়ে হাজির করতো। আর মোসাহেব বন্ধুরা কাছে এগিয়ে সরে বসতো। আরো কাছে। মাধব দত্তর একেবারে মুখের কাছাকাছি। কিন্তু বেশিক্ষণ কাজের কথা বলবার লোক নন মাধব দত্ত। দু-চারটে সই দিতে দিতেই তিনি ব্যাজার হয়ে উঠতেন। উকীল-অ্যাটর্নীরা হাজার চেষ্টা করেও আর তাঁকে কাজে নামাতে পারতো না। তখন একজন মোসাহেব গল্পের খেই ধরিয়ে দিয়েছে, বাকিরা তারিফ করতে শুরু করেছে। মাধব দত্তও গুলজার হয়ে যেতেন গল্পের মধ্যে। খাতাপত্র কাজ-কর্ম ছেড়ে তিনিও তখন মশগুল হয়ে পড়তেন। বলতেন—তারপর? তারপর কী হলো হে চাটুজ্যে?

সংসারবাবু বলতো—তারপর সেই মেয়েটা বাড়ি থেকে একদিন বেরিয়ে দে-চম্পট—

মাধব দত্ত আরও কৌতূহলী হয়ে উঠতেন। বলতেন—বামুনের কুমারী মেয়ে বাড়ি থেকে চম্পট দিলো? বলো কী?

—তবে আর বলছি কি কর্তাবাবু, সর্বনাশের একেবারে মাথায় পা!

মাধব দত্ত বলতেন—তা গেল কোথায় মেয়েটা? খোঁজ নিলে না কেউ? কেমন বে-আক্কেলে সব লোক হে?

—কে আর খোঁজ নেবে বলুন, কার অত বুকের পাটা?

—তা পাড়ায় কোনও ভদ্দরলোক ছিল না? বামুনের মেয়েটা জলজ্যান্ত বেরিয়ে গেল?

সংসারবাবু বলতো—তা আপনার মত পরোপকারী লোক তো আর সবাই নয় কর্তাবাবু, আপনার মত সবাই হলে পৃথিবীটা তো স্বর্গ হয়ে যেত—

মাধববাবু বলতেন—সে তো কথা নয়, এখন মেয়েটা গেল কোথায় সেটা তো আমাদের দেখতে হবে। জলজ্যান্ত বামুনের কুমারী মেয়েটা একেবারে পালিয়ে গেলেই হলো অমনি? তোমরা তবে আছ কী করতে?

সংসারবাবু বলতো—আজ্ঞে, আমি গরীব লোক, আমি কী আর করতে পারি—

মাধব দত্ত বলতেন—তুমি না-হয় গরীব লোক, কিন্তু আমি তো আছি, আমাকেও তো বলতে পারতে, আমি তো মারা যাইনি—

—আহা-হা, কী যে বলেন আপনি—অমন অলুক্ষুণে কথা বলবেন না।

সবাই আহা-হা করে উঠতো সঙ্গে সঙ্গে। নিতাইবাবু, গৌরীহরবাবু, প্রাণ-কেষ্টবাবু, তারাও মনে কষ্ট পেত। বলতো—ছি ছি, আপনার মুখে কিছুই বাধে না কর্তাবাবু, আজ মঙ্গলবার, এমন অমঙ্গুলে কথাটা বলে ফেললেন টপ্ করে—

মাধব দত্তবাবু রেগে যান। বলেন—তোমরা তাহলে ওই কথা নিয়েই থাকো,

BanglaBook.org

আর ওদিকে যে একটা বামুনের কুমারী মেয়ে বাড়ি থেকে চম্পট দিলে, সে-কথাটা কেউই ভাবছ না—তোমাদের মত বন্ধু আমার থাকলেই বা কী আর না-থাকলেই বা কী—

মুখ গম্ভীর হয়ে গেল মাধব দত্তর। আসর সুদ্ধ লোক দম আটকে বসে রইল। নরহরিবাবু অ্যাটর্নী মানুষ, অনেকক্ষণ ধরে একটু ফাঁক খুঁজছিলেন, এবার ব্যাপার দেখে তিনি আর সাহস পেলেন না। আস্তে আস্তে কাগজ-পত্র গুটিয়ে উঠলেন। পরের দিন বেলা বারোটার মধ্যেই প্রোবেট নিতে হবে হাটকোর্টে। খুবই জরুরী কাজ। কিছুই হলো না। সাড়ে তিন লাখ টাকার আদ্যশ্রাদ্ধহবার যোগাড়। কী করবেন, কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। আস্তে আস্তে জুতোটা পায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। হেমদাবাবুও উঠলেন। তাঁর লোয়ার কোর্টের কেস। এক লটে চল্লিশটা ভাড়াটে বাড়ির সেলডীড্-এর জন্যে তিনি ক'দিন ধরে ঘোরাঘুরি করছেন, কিছুতেই আর মাধব দত্তর ফুরসুৎ হচ্ছে না। আজকেও হলো না। গল্প এমন জমে গেছে যে আর ভরসা নেই। আবার কাল ট্রাই করতে হবে। হেমদাবাবু উঠলেন। ঘর আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে গেল। যারা পাওনাদার, তারাও একে একে চলে গেল সব। তখন রইলেন শুধু সংসারবাবুর দল। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে বেশ।

অনেকক্ষণ তামাক টানার পর মাধব দত্তর মুখ দিয়ে কথা বেরোল। বললেন—তা মেয়েটার বয়স কত?

সংসারবাবু বললে—আজ্ঞে, ষোল—

—ষোল?

যেন চমকে উঠলেন মাধব দত্ত। শুধু চমকেই উঠলেন না। রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। বললেন—ষোল বছরের ব্রাহ্মণ কুমারী মেয়ে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেল, আর তোমরা সব উজবুকের মত মুখ বুজে রইলে!

এতক্ষণে সংসারবাবু সবিনয়ে নিবেদন করলেন। বললেন—একেবারে যে মুখ বুজে ছিলাম তা নয় কর্তাবাবু, খোঁজ-খবর নিয়েছি বৈ কি!

—তা খোঁজ-খবর নিয়ে ফয়দা কী হলো শুনি? যদি মেয়েটার পাত্তাই না-পেলে তো অমন খোঁজ-খবরের ফয়দা কী?

—আজ্ঞে, খোঁজ পেয়েছি!

মাধব দত্ত গড়গড়ার নলটা সরিয়ে সোজা হলেন। বললেন—পেয়েছ? কোথায় আছে?

সংসারবাবু বললেন—আজ্ঞে, হাটখোলায়। হাটখোলার এক টিনের বস্তিতে—

মাধব দত্ত বললেন—তাহলে, খোঁজ পেয়েছ, তখন আর চুপ করে বসে থাকা যায় না—ষোল বছরের ব্রাহ্মণ কুমারী মেয়ে—

সেই রকমই সাব্যস্ত হলো। আর বেশি দেরি করা উচিত নয়। অনাথা ষোল বছরের মেয়ে হাটখোলার বস্তিতে অভিভাবকহীন অবস্থায় থাকবে, তা হতে পারে না। সংসারবাবুর দলও কোঁচা-চাদর গুছিয়ে উঠে পড়লেন। গাড়ি জোতা হলো, 'জিনিস-পত্র' দেওয়া হলো। মাধব দত্ত বললেন—চলো চলো, দেরি হয়ে গেল আবার—তোমরা এমন সব বে-আক্কেলের মত কাজ করো—

সংসারবাবু নিতাইবাবু, গৌরীহরবাবু, প্রাণকেষ্টবাবুও উঠলেন গাড়িতে। দরোয়ান উঠলো, পেয়ারের খানসামা আদালত আলী উঠলো। সদলবলে রুক্মিণী-উদ্ধারের পালা আরম্ভ হলো।

গাড়িতে ওঠবার আগে মাধব দত্ত একবার চারিদিকে দেখে নিলেন। বললেন—ওরে আদালত, সবাই উঠেছে তো?

BanglaBook.org

—হুজুর, সীতাপতিবাবু উঠছেন না।

—কেন হে সীতাপতি, তুমি উঠছ না কেন? তোমার আবার কী কাজ?

সীতাপতিবাবু মোসাহেবদেরই একজন। বেশ বাবরি চুল, কোঁচানো ধুতি, চাদর। তাঁরও লপেটা চেহারা। তিনিও সংসারবাবুদের সঙ্গে একদিন আরম্ভ করেছিলেন। আসরের একজন নিয়ম করা সভ্য হয়ে গেছেন।

সীতাপতিবাবু বললে—আমার একটা মুজরো আছে এখন—

—মুজরো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তাবাবু, একজনের ফটো তুলতে হবে।

মাধব দত্ত একটু অবাকই হলেন। সীতাপতিবাবুর ফটোগ্রাফিক ব্যবসা ছিল এককালে। খুব ভালো ছবি তুলতে পারতেন। সকলের ছবি তুলে দিয়েছেন। মাধব দত্তর স-মোসাহেব ফোটো তুলেছেন। মাধব দত্তর বাগানবাড়ির নানান রকম ছবি, মাধব দত্তর মেয়েমানুষের ছবি, মাধব দত্তর নৈশ-কীর্তিকলাপের ছবি। সে-সব ছবি আদালত আলীর কাছে গচ্ছিত থাকে। সে-সব সাধারণত প্রকাশ্যে বার করবার মত নয়। বলতে গেলে সীতাপতিবাবু সে ব্যবসা ছেড়েই দিয়েছে। শ্যামবাজারের দোকানও উঠে গেছে। এখন সীতাপতিবাবুকে বেকারই বলা চলে। সেই বেকার লোকের কাজের কথা শুনে একটু অবাক হয়ে গেলেন মাধব দত্ত। একটু হাসলেন গোঁফের ফাঁকে।

বললেন,—তুমি খুব কাজের মানুষ হয়ে গেলে দেখছি সীতাপতি—

সীতাপতি বললে—আজ্ঞে, কাজের মানুষ আর হতে পারলুম কই—

—ভালো ভালো, এবার গেরুয়া পরে লোটা-কম্বল নিয়ে সন্নিসী হয়ে যাও।

তা সন্ন্যাসী হয়ে যাবার মতই অবস্থা সীতাপতিবাবুর। সবাই কথাটা শুনে হাসলো। মাধব দত্তর হাসির কথাতে হাসাই নিয়ম। সেই নিয়মই সবাই মেনে আসছে বরাবর। সংসারবাবু হাসলেন, নিতাইবাবু হাসলেন, গৌরীহরবাবু হাসলেন, প্রাণকেষ্টবাবুও হাসলেন। সীতাপতিবাবু নিজে হেসে একটু সায় দিলেন মাত্র।

কিন্তু গাড়িতে উঠে মাধব দত্ত বললেন—দেখলে তো চাটুজ্যে, সীতাপতি দিন-দিন কেমন বেরসিক হয়ে উঠছে—

সংসারবাবু বললে—আজ্ঞে, বেরসিকের বেহদ্দ!

মাধব দত্ত বললেন—সীতাপতির জন্যে দুঃখও হয় আমার, জানো হে—

গৌরীহরবাবু বললে—দুঃখ তো হবারই কথা স্যার—বউ নেই, ছেলে-মেয়ে নেই, ব্যবসাটা ছিল, তাও লোপাট হয়ে গেল—

সেদিন হাটখোলার টিনের বস্তিটার মধ্যে রুক্মিণী-উদ্ধার হলো কি হলো না, তা শেষ পর্যন্ত আর কেউ জানলো না। জানলো শুধু সংসারবাবু, নিতাইবাবু, গৌরীহরবাবু, প্রাণকেষ্টবাবু। আর জানলো আদালত আলী। তার পরদিন যখন মাধব দত্ত বাড়ি ফিরলেন তখন সকাল হবো-হবো। আদালত আলী গাড়ি থেকে দুহাতে জাপটে ধরে মাধব দত্তকে নামিয়ে নিলে। মাধব দত্তর তখন আর জ্ঞান থাকবার কথা নয়। পকেটের চেক-বইটা সাবধানে তুলে রেখে দিতে হয় আদালতকে। সেই তখন যে শোবেন, আবার উঠবেন বেলা গড়িয়ে গেলে। বিকেল চারটে নাগাদ। তখন আবার আসবে সংসারবাবু, আসবে গৌরীহরবাবু, আসবে নিতাইবাবু, আসবে প্রাণকেষ্টবাবু। আর আসবেন অ্যাটর্নী নরহরিবাবু, আর হেমদাকান্তবাবু। আর যারা সকাল থেকে বসে আছে মাধব দত্তর সঙ্গে দেখা করতে, তারা তো বসে আছেই। আর সকলের পেছনে আসবে সীতাপতিবাবু। তারপর মাধব দত্ত যখন রোজকার মত শিবপুজো সেরে আসরে আসবেন, তখন নরহরিবাবু কাগজ-পত্র

BanglaBook.org

নিয়ে প্রথমে নমস্কার করবেন। এগিয়ে যাবেন সামনের দিকে। হাইকোর্টের প্রোবেটের কেসটায় কোনও রকমে দিন পেছিয়ে নিয়েছেন। হেমদাকান্তবাবু এক লটে চল্লিশটা ভাড়াটে-বাড়ির ট্রান্সফার ডীডটা বাগিয়ে ধরবেন। আদালত আলী তামাক-ফরসী এগিয়ে দেবে। সংসারবাবু গল্প আরম্ভ করবেন। কাগজ-পত্র নামমাত্র দেখতে দেখতে হঠাৎ একবার জিজ্ঞেস করবেন—তারপর? তারপর কী হলো হে চাটুজ্যে?

সংসারবাবু বলবে—তারপর আর কী হবে, মেয়েটা বিধবা হলো।

মাধব দত্ত কাগজ-পত্রের দিকে চোখ রেখেই বলবেন—বিধবা হলো মানে?

—আজ্ঞে, বিধবা হলো মানে অনাথা হলো।

মাধব দত্ত আবার জিজ্ঞেস করলেন—তা, কে আছে অনাথার?

—আজ্ঞে, কে আর থাকবে, কেউ-ই নেই।

—তাহলে কে দেখছে এখন?

সংসারবাবু বললেন—আজ্ঞে, কে আর দেখছে? ভগবান! যার কেউ নেই তার ভগবান আছে।

মাধব দত্ত রেগে গেলেন, বললেন—ভগবান মানে? তোমাদের ওই তো দোষ, সব কাজ ভগবানের ওপর ছেড়ে দিয়েই তোমরা নিশ্চিন্ত, এদিকে একজন অনাথা বিধবা অসহায় অবস্থায় পড়েছে, আর তোমরা থাকতে কিনা বিধবার একটা গতি হবে না?

তারপর একটু থেমে গিয়ে বললেন—তা, বয়েস কত মেয়েটার?

—আজ্ঞে, কত আর, এই আঠারো-উনিশ হবে, ছেলে-মেয়ে তো হয় নি।

মাধব দত্ত গড়গড়ার নলটা তখন ছুঁড়ে ফেলে দেন। সর্বনাশ করেছে! এই আঠারো-উনিশ বছর বয়সের নিঃসন্তান অনাথা বিধবা মেয়ে, সে কি আর এতক্ষণ আছে? এতক্ষণে বোধহয় যা হবার হয়ে গিয়েছে!

সংসারবাবু বললেন—আজ্ঞে, আমরা গরীব লোক, আমরা কী করতে পারি বলুন?

মাধব দত্ত বলবেন—তা আমি তো আর মরিনি, আমাকে একবার বলবে তো? তা, কত টাকা লাগবে?

সংসারবাবু বললেন—আজ্ঞে, টাকা দিলে সাত ভূতে লুটে-পুটে খাবে, তার চেয়ে আপনি নিজে একবার চলুন, তার দুঃখ দেখলে আপনিও চোখের জল রোধ করতে পারবেন না—

—তা, তাই চলো, এই সব নানান ঝঞ্ঝাটে দেখছি কাজ-কর্ম হবার আর উপায় নেই।

বলে মাধব দত্ত উঠবেন। অ্যাটর্নী নরহরিবাবু তখন বেগতিক দেখে কাগজ-পত্র গুটিয়ে উঠে পড়বেন। হাইকোর্টের প্রোবেটের কেসটা আরো দিন কতক ঠেকিয়ে রাখতে হবে, হেমদাকান্তবাবুও গতিক-সতিক দেখে সরে পড়বেন। এক লটে চল্লিশটা ভাড়াটে বাড়ির ট্রান্সফার ডীড্‌টা নিয়ে তাঁর হয়েছে জ্বালা। এক-মাস এই হুজ্জৎ চলেছে। কবে যে কর্তাবাবুর ফুরসৎ হবে, তার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। তখন আদালত আলীর কাজের পালা। মাধব দত্ত তখন জামা-কাপড় বদলে গাড়িতে উঠবেন। গাড়িতে ওঠবার মুখে একবার জিজ্ঞেস করবেন—ওরে আদালত, সব উঠেছে তো গাড়িতে?

তারপর খেয়াল হবে একবার। বলবেন—সীতাপতি? সীতাপতিকে দেখছি না যে—

—আজ্ঞে, সীতাপতিবাবুর আজ শরীর ভাল নেই।

BanglaBook.org

—কেন?

সংসারবাবু বলবে—আজ্ঞে, সীতাপতি আজকাল ওই রকম বেরসিক হয়ে যাচ্ছে দিন দিন—

মাধব দত্ত বলবেন—তা, সীতাপতিকে একবার ডাকো তো?

সীতাপতি সামনে আসবে। বলবে—আমি আজ যেতে পারবো না কর্তাবাবু, বড় জড়িয়ে পড়েছি—

—আবার তোমার ফোটোগ্রাফি নাকি?

সীতাপতিবাবু বলবে—আজ্ঞে, ফোটোগ্রাফির কাজ কি আর রোজ-রোজ পাই? তাহলে তো বেঁচে যেতুম। আমার দোকানই উঠে গেছে, মামলা করে খুড়োরা একেবারে পথে বসিয়ে দিয়েছে আমাকে—

—তা, করছ কী এখন? আছ কোথায়?

—আজ্ঞে, রাস্তায়।

তারপর মাধব দত্ত সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিতেন। আজ রুক্মিণী-উদ্ধার, কাল অনাথা বিধবার উপকার, এমনি একটা-না-একটা লেগেই থাকতো। ফড়েপুকুরের পাড়ার লোক দেখতো মাধব দত্তর গাড়িটা সন্ধে নাগাদ বেরিয়ে যায়, আর পরের দিন ভোরবেলা ফেরে। একদিন লক্ষ্য করে দেখে দলের লোকজন সবাই ঠিক তেমনি আছে—একজন শুধু কমে গেছে। মাথায় বাবরি চুল, সৌখীন পাঞ্জাবি-ধুতি পরা সীতাপতিবাবুই নেই শুধু সঙ্গে।

মাধব দত্ত বলেছিলেন—তুমি তাহলে এখানেই থাকো, দক্ষিণের আস্তাবল-বাড়ির নীচের ঘরখানাতেই আস্তানা নাও—

কথা ছিল, যতদিন একটা ব্যবস্থা না হয়, ততদিন সীতাপতি ওখানেই থাকবে। কিন্তু মামলার পর মামলা, ঝঞ্ঝাটের পর ঝঞ্ঝাট এসে যে আর হয়ে উঠলো না। আস্তাবলের নীচের ঘরখানায় সীতাপতিবাবু থাকতে লাগলো সেই থেকে। সে আজ বছর চল্লিশ আগেকার কথা। একাদিক্রমে এত বছর থাকবার পর সীতাপতি-বাবু তখন একেবারে ঘরের লোক হয়ে গেছে। একেবারে ঘরোয়া মানুষ। সীতা-পতিবাবু সকাল বেলা উঠে ভিস্তিখানায় গিয়ে সাবান দিয়ে কাপড়-জামা কাচতে বসে। গামছাটা পরে স্নান করে নেয়। সেই ভিজে ধুতি-পাঞ্জাবি-গেঞ্জী আবার বাগানের তারে গিয়ে রোদে শুকোতে দেয়। মাধব দত্তর তখন মাঝ-রাত্তির। স্নান করে ছোট ঘরখানার মধ্যে বসে থাকে। তারপর সামনে দিয়ে কেউ গেল তো জিজ্ঞেস করে—ও ভূষণ, ভূষণ—

ভূষণ সেরেস্তার লোক। কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে—কী বলছেন?

সীতাপতিবাবু বলে—বারোটা বাজলো, এখনো ভাত দিচ্ছে না কেন, একবার দেখে আসতে পারো হে?

ভূষণ চলে যায়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কেউ আর খবর দিতে আসে না। সীতাপতিবাবু ঘরের বাইরে এসে পায়চারি করে। তখন কোচোয়ান সহিসদের উনুনে ভাত চড়েছে। তারা তখন বাটনা বাটছে। মাছ কুটছে। সীতাপতিবাবু গিয়ে কাছে দাঁড়ায়। ক্ষিধেয় তখন পেট চোঁ চোঁ করছে সীতাপতিবাবুর। সীতাপতিবাবু ডাকে—ও কাশেম, কাশেম—

কাশেম বলে—কী বাবুজী?

সীতাপতিবাবু বলে—তোমরা তো বেশ আরাম করে ভাত খাবে, আর আমাকে যে এখনও খেতে ডাকছে না হে—

কাশেম আর কী করবে! কাশেমের করার কিছু নেই। রান্না-বাড়ি ভেতরে।

BanglaBook.org

সেখানে মুসলমান যাবার নিয়ম নেই। বার-বাড়ির লোক সেখানে ঢুকতে পারবে না। রান্না-বাড়ির সামনে বারান্দায় বসে খেতে হবে। ঠাকুর আল্‌গোছে ভাতের থালা দিয়ে যাবে সকলকে।

কাশেম বলে—তা, আজকে আপনার এত সকাল-সকাল ক্ষিধে পেল যে বাবুজী!

—কোথায় সকাল? সকাল কি আছে? সকাল হবে সেই আবার কালকে। ক'টা বেজেছে খেয়াল আছে?

সীতাপতিবাবু পায়চারি করতে করতে আবার কাছে আসে। বলে—একটা কাজ করতে পারবে কাশেম? মেহেরবাণী করে একটা কাজ করতে পারবে?

—কী কাজ বাবুজী?

সীতাপতিবাবু বলে—একবার আদালতকে ডেকে দিতে পারবে?

আদালতের সর্বত্র গতি। আদালত আলীর খাতির সর্বত্র। মাধব দত্তর খাস খানসামা। সে বললে কারো 'না' বলবার জো নেই। তাকে পেলেও কাজ হতো।

কাশেম বললে—সে তো ঘুমুচ্ছে বাবু, তাকে এখন কোথায় পাবেন। সে তো কর্তাবাবুর সঙ্গে সারারাত হাটখোলায় ছিল—

মাধব দত্তর খাস খানসামা আদালত। বাবু ঘুমুচ্ছে, সুতরাং সে-ও এ সময়টা ঘুমিয়ে নেবে। তারও এ-সময় কোনও কাজ নেই।

সীতাপতিবাবু রান্নাবাড়ির দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। কেউ তো ডাকতে আসছে না। অন্যদিন বনমালীই ডাকতে আসে। পায়ে পায়ে রান্না-বাড়ির দিকে এগিয়ে যায় সীতাপতিবাবু। আস্তাবল বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভিস্তিখানা। তারপর একটা সরু খিড়কি। খিড়কির দরজার সামনে গিয়ে সীতাপতিবাবু ডাকে—ও বনমালী, বনমালী—

বনমালী অনেকক্ষণ পরে হাজির হয়। বলে—কী?

সীতাপতিবাবু বলে—এই যে বাবা বনমালী, আজকে খাবার দিতে এত দেরি যে?

বনমালী বলে—এখনও রান্না হয়নি, হলেই ডাকবো—

সীতাপতিবাবু বলে—সে কি রে বাবা, এখনও রান্না হয়নি? আমার যে ক্ষিধে পেয়ে গেছে রে! এই দ্যাখ, আমার পেটটা দ্যাখ—বলে সীতাপতিবাবু পেটটা হাত দিয়ে দেখায়।

বলে—এই দ্যাখ, একেবারে বেয়ালার মত হয়ে গেছে, দেখছিস—কী ক্ষিদে পেয়েছে!

বনমালী দেখে। কিন্তু তেমন গা করে না। বলে—তা কী করবো বাবু, রান্না না হলে কী করে খেতে দেব?

তা ভাতও হয়নি? শুধু ভাত আর ডাল হলেই তো হয়। শুধু ডাল-ভাতই দে না, আর যে পারি না।

বনমালী রেগে যায়। বলে—আর পারি না বাবু আপনার সঙ্গে বাজে কথা বলতে।

সত্যিই বনমালীর অনেক কাজ। সীতাপতিবাবুর সঙ্গে বক্‌-বক্‌ করলে তার চলে না। সে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিজের কাজে চলে যায়।

সীতাপতিবাবু ব্যাকুল হয়ে ডাকেন—ওরে বনমালী, যাস নে বাবা, শোন, কথা শোন, বড় ক্ষিধে পেয়েছে, জানলি—

কিন্তু তখন কোথায় বনমালী, কোথায় কে! এমন ব্যাকুল সুরে শ্রীমধুসূদন-বনমালীকে ডাকলেও তিনি ভক্তের ডাকে হয়তো সাড়া দিতেন, কিন্তু দত্ত-বাড়ির

BanglaBook.org

বনমালীর হৃদয় বড় কঠোর। তার কাছে মন পাওয়া বড় শক্ত। সে অত সহজে খুশী হয় না। সীতাপতিবাবু আবার নিজের ঘরে গিয়ে মাদুরের ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে। তারপর উপুড় হয়। উপুড় হয়ে পেটটা মাটিতে চেপে ধরে। তারপর ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে।

চল্লিশ বছর আগে প্রথম প্রথম কিন্তু এমন ছিল না। সেই চল্লিশ বছর আগে যখন সীতাপতিবাবু প্রথম এ-বাড়িতে এসেছিল। তখন সীতাপতিবাবুর আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। কাকা-জ্যাঠারা মামলা করে বাড়ি আলাদা করে নিয়েছে। পৈতৃক বাড়িও ছাড়তে হয়েছে একটা ফোটো তোলার দোকান ছিল। ভালো ফোটো-গ্রাফার হিসাবে নামও ছিল সীতাপতিবাবুর। সেই সময়েই মাধব দত্তবাবুর বাগান-বাড়িতে ফোটো তুলতে যেতে হতো। আর সেই সময় থেকেই কেমন করে যেন দলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল সীতাপতিবাবু। সেই সংসারবাবু, গৌরীহরবাবু, নিতাইবাবু আর প্রাণকেষ্টবাবুদের দলে। সেই সময় থেকেই নিয়ম করে বিকেল বেলা মাধব দত্তর আসরে সেজেগুজে এসে বসতে হতো, মাধব দত্তর কথায় সায় দিতে হতো, হাসলে হাসতে হতো, হাই তুললে হাই তুলতে হতো, মাধব দত্ত কাশলে কাশতে হতো। তারপর আনুষঙ্গিক যা-কিছু সবই পালন করতে হতো আর সকলের মত। আর সকলের মতই কুঁচিয়ে ধুতি পরে, গিলে করা পাঞ্জাবি গায়ে দিতে হতো। উড়ুনি পাকিয়ে গলায় জড়াতে হতো, বাবরি চুলে ঢেউ খেলাতে হতো। চেহারাটা সুপুরুষের মত ছিল। ফরসা পাকা-আমের মত চেহারা। সরু কাঁকড়া বিছের মত গোঁফ। মাধব দত্তের পাশে মানাতোও চমৎকার। কিন্তু কপাল ভাল নয়। তাই একদিন মামলা-মকর্দমায় জেরবার হয়ে গেল। বাড়ি গেল, ভিটে গেল, কারবার গেল। শেষকালে মাধব দত্তর আস্তাবল-বাড়ির নীচেয় এসে আশ্রয় নিতে হলো।

খেতে বসে সীতাপতিবাবু বলে—ও বনমালী, আর দুটো ভাত দিতে বল তো বাবা—

ঠাকুর এসে আবার ভাত দিয়ে যায়।

সীতাপতিবাবু বলে—আর একটু ডাল দিতে হবে যে ঠাকুর—

আবার ভাত আসে, আবার ডাল। ভাত বেশি হয়ে যায় তো ডাল কম পড়ে। ভাত কম পড়ে তো তরকারি বেশি হয়ে যায়। সেই তরকারি ওঠাতে আরো ভাত দরকার হয়। এমনি করে ভাত ডাল তরকারি নিয়ে যখন খাওয়া হয়ে যায়, তখন খানিকক্ষণ বসে থাকে সীতাপতিবাবু।

বলে—একটু বসি এখানে বনমালী, বুঝলি এখানে একটু বসে থাকি—

বনমালী রেগে যায়। বলে—আপনি উঠলে তবে তো জায়গা খালি হবে, আপনি উঠুন।

সীতাপতিবাবু বলে—দাঁড়া বাবা, একেবারে যে মারমুখো হয়ে আছিস সারা-ক্ষণ, দেখছিস খাওয়াটা বেশি হয়ে গিয়েছে—নড়তে পারছি নে—

—তা অত বেশি খান কেন? তখন তো কেবল—আর একটু ভাত দাও ঠাকুর, আর একটু ডাল দাও ঠাকুর, করেছেন—

—তা, ক্ষিদে পেলে খাবো না? পেট খালি রেখে মানুষে উঠতে পারে? তুই যে কী বলিস তার ঠিক নেই, তুই দেখছি মানুষ খুন করতে পারিস,—তুই আমাকে কোনদিন না-খেতে দিয়ে মেরে ফেলবি দেখছি।

তা এই বনমালীই তখন এ-রকম ছিল না সেই চল্লিশ বছর আগে। এই বন-মালীই তখন খাতির রেখে কথা বলতো সীতাপতিবাবুর সঙ্গে। সময়মত খেতে

BanglaBook.org

ডাকতে আসতো। বারোটা না-বাজতেই বনমালী এসে ডাকতো—ও সীতাপতিবাবু, সীতাপতিবাবু—

সীতাপতিবাবুর তখন স্নানই সারা হয়নি। বসে বসে নিজের ঘরখানার ভেতরে তামাকই খাচ্ছে।

—এ কি, ভাত খাবেন না আজ?

—এত সকাল-সকাল ভাত? তামাক খাচ্ছি যে বাবা!

—ও তামাক পরে খাবেন'খন্, ভাত খেয়ে নিন, বেলা করে খেলে পিত্তি পড়বে।

কত খাতির তখন বনমালীর। ভাত খেতে বসেও তাগাদা। বনমালী বলতো—আর দুটো ভাত নিন বাবু, এই ক'টি ভাত খেয়ে কী করে থাকবেন।

জোর করে করে খাওয়াত তখন বনমালী। আবার বাড়ির ভেতর থেকে পান আসতো। মশলা আসতো। মাধব দত্তর পেয়ারের বাবু। ছবি তুলে দিত। চাকর-ঠাকুরদের। নিজের খরচেই ছবি তুলে সকলকেই বিলোত সীতাপতিবাবু। তাতে চাকর-বাকররাও তুষ্ট থাকতো। ঠাকুর বেশি করে মাছ দিত, ডাল দিত। মাঝে মাঝে আবার দইটা, মিষ্টিটাও দিত। আর তাছাড়া তখন দত্ত-বাড়ির অবস্থাও ভাল ছিল। মাধব দত্তর তখন দু হাতে পয়সা আসছে। আর সে-সব দিনকালও ভাল ছিল। মাছ আসতো, ঘি আসতো বাড়িতে মণ মণ। পুজোয়, দোলে, দুর্গোৎসবে সকলকে কাপড়-উড়ুনি দেওয়া হতো। সে-সব এলাহি কাণ্ড ছিল তখন। মাধব দত্ত তো তখন বাড়িতেই থাকতেন না। আজ হাটখোলা, কাল বরানগর, পরশু শ্রীরামপুর—এমনি চলতো তাঁর ফুর্তির বহর। সংসারবাবুদের দল শ্রীরামপুরের রথের মেলা থেকে ফুর্তি করে বেরিয়ে একেবারে গঙ্গা পেরিয়ে খড়দয় চলে যেতেন। সেখানেই রাত কাটিয়ে ফিরতেন ভোরবেলা। তার পরদিন হয়ত যেতেন বদ্যিবাটি, আবার তার পরদিন ফরাসডাঙা। যেদিন দূরে যেতেন, সেদিন আর ঘোড়ার গাড়ি যেত না। ঘোড়ার গাড়ি যেত বাবুঘাট পর্যন্ত। বাবুঘাট থেকে নৌকো ছাড়তো হৈ হৈ করে। হ্যাজাক বাতি জ্বালিয়ে মাধব দত্তর নৌকো এপার থেকে ওপারে যেত। আর ওপারের লোক দেখতো—জলের ওপর আলোয় আলো হয়ে গেছে গঙ্গার বুকটা। সংসারবাবু, গৌরীহরবাবু, নিতাইবাবু, প্রাণ-কেষ্টবাবু—সবাই মাধব দত্তকে ঘিরে রয়েছে। আদালত আলী তামাক সাজাচ্ছে, গেলাস সাজাচ্ছে। এক চুমুক গেলাসে ঠোঁট ঠেকিয়েই তামাক টানতে টানতে বলেন—তারপর কী হলো হে চাটুয্যে?

সংসারবাবু বললে—তারপর পুঁটি বললে, তার নাকি একাদশী—

মাধব দত্ত ভারি রস পেলেন কথাটায়। বললেন—পুঁটি হাসালে তো! পুঁটিরও একাদশী? তা একাদশীতে না-হয় মাছ-মাংস খেতে নেই, না-হয় ভাত-তরকারি খেতে নেই—তা বলে মাল খেতে দোষ কী?

—আজ্ঞে, ওই বলে কে? তখন আমি বললাম, মাল না-খেলে কি ফুর্তি হয় বাবা? আমরা মাল খাবো আর তুমি নিরম্বু উপোস করে থাকবে, তাতে মাইফেল জমবে কেন শুনি?

গৌরীহরবাবু বললে—তাছাড়া পয়সা খরচা করে ফুর্তি করবো, তাতে আবার মেয়েমানুষের মেজাজ মানবো কেন স্যার?

প্রাণকেষ্টবাবু বললে—আজ্ঞে, ছোটলোকের মেয়েমানুষ তো, ফুর্তির কায়দাই এখনো শেখেনি, অথচ এই লাইনে এসেছে—

মাধব দত্ত নল থেকে মুখ তুলে হঠাৎ বললেন—আরে, এ সেই পাঁজি দেখে ফুর্তি করার মতন আর কি!

BanglaBook.org

সবাই হাসলো মাধব দত্তর কথায়। হেসে গড়িয়ে পড়লো।

মাধব দত্ত হঠাৎ বললেন—একটা বুদ্ধি এসেছে হে মাথায়—

—কী বুদ্ধি স্যার? সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো।

মাধব দত্ত বললেন—আমি বলি কি, খড়দয় আর গিয়ে কাজ নেই আজ—তার চেয়ে...

—তার চেয়ে?

মাধব দত্ত বললেন—তার চেয়ে ওই পুঁটির বাড়িতে গিয়েই আজ একাদশীর নিশিপালন করা যাক—কী বলো?

সবাই আবার হৈ-হৈ করে উঠলো। সে-হাসির আওয়াজে এপার-ওপারের লোক পর্যন্ত চমকে চেয়ে দেখলে। তখন নৌকোর মুখ ফিরেছে। আর নৈহাটি যাওয়া হলো না। ফরাসডাঙার পুঁটির বাড়িতে যাওয়াই সাব্যস্ত হলো। ফরাসডাঙার পুঁটির বাড়িতেই একাদশীর নিশিপালন হবে ঠিক হলো।

ওদিকে তখন সীতাপতিবাবু নিজের ঘরে চুপ করে শুয়েছিল। ফড়েপুকুরে মাধব দত্তের বাড়িতে তখন মাঝ-রাত; কামিনী ফুলের একটা ঝাড় বাগানের মধ্যে ভারি গন্ধ ছড়াচ্ছে। বনমালী নিজে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছে। সেদিন রান্নাটা খেয়ে বেশ যুৎ হয়েছে। পেট ভরেছে। বনমালী আবার দই দিয়ে গেছে পাতের শেষে।

সীতাপতিবাবু নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিল।

—এ কী রে বাবা, আবার দই কেন রে বনমালী?

বনমালী বলেছিল—আজ্ঞে, আমরা তো হুকুমের চাকর, দই দেবার হুকুম হয়েছে—

একবার কৌতূহল হলো সীতাপতিবাবুর। কার আবার হুকুম হলো দই দিতে! বাড়ির আদর ভুলেই গেছে সীতাপতিবাবু। সেই কতদিন আগে ছোটবেলায় বাপ-মা বেঁচে থাকবার সময় সীতাপতিবাবু স্কুলে পড়তে যেত। শ্যামবাজারের মোড়ের মাথায় গাড়িতে করে পৌঁছে দিত গাড়োয়ান। এই মাধব দত্তের মতন না হোক, সীতাপতিবাবুদেরও অবস্থা ভাল ছিল। গাড়ি ছিল ঘরের, বাড়ি ছিল দু'মহলা। কাজে-কম্মে কলকাতার সব পরিবারই আসা-যাওয়া করতো তাদের বাড়িতে। এক ডাকে সবাই চিনতো তাদের। তারপর বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব রং ফিকে হয়ে আসতে লাগলো। গাড়ি-ঘোড়া গেল। বাড়িটা ছিল। আর ছিল দোকানটা। ছবি তোলার দোকান। ছবি তোলায় নাম ছিল সীতাপতিবাবুর। বড় বড় লোকের বাড়ির লোক ছবি তুলেছে সীতাপতিবাবুর কাছে। পর্দানশীন বাড়ির মেয়েরাও সীতাপতিবাবুকে ডেকে অন্দরমহলে নিয়ে গিয়ে ছবি তুলিয়েছে। এই যে সব দুধারের বাড়ি, এই পাকা দুতলা তিনতলা বাড়ির ভেতরেও একদিন যেত সীতাপতিবাবু। চেহারাখানা ছিল ভাল। ফরসা রং, কোঁকড়ানো বাবরি চুল মাথায়, পাতলা গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি। সেই ছবি তুলতেই এসে একদিন মাধব দত্তর ফড়িয়াপুকুরের বাড়িতে দলে ভিড়ে গিয়েছিল সীতাপতিবাবু।

মাধব দত্ত বলেছিলেন—বাঃ, বেড়ে ছবি তুলেছ তো হে!

সেদিন সবাই তারিফ করেছিল সীতাপতিবাবুর ছবি তোলার।

মাধব দত্ত বলেছিলেন—তা নৈহাটিতে আজ যেতে পারবে আমাদের সঙ্গে?

—নৈহাটিতে?

—তোমার কোনও অসুবিধা হবে না সেখানে। এই আমরা সবাই মিলেই যাবো, এই সংসারবাবু, গৌরীহরবাবু, নিতাইবাবু, প্রাণকেষ্টবাবু সবাই যাবো

BanglaBook.org

আমরা। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত থাকবে, যা খেতে চাও তাই খাবে, আর যদি মাল খেতে আপত্তি না থাকে তো...

নৈহাটিতে তখন মাধব দত্তর অষ্টম পক্ষের মেয়েমানুষ সবে সংসার পেতেছে। তারই ছবি তুলতে হবে সদলবলে। সীতাপতিবাবু এ-দলের সঙ্গে সেই প্রথম নিশি-পালন। এই নৈহাটির পর খড়দা, খড়দার পর বরানগর, বরানগরের পর শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুরের পর বৈদ্যবাটি। বৈদ্যবাটির পর ফরাসডাঙা। তখন আর তার কারবার কে দেখে। দোকান দেখবার সময়ই হয় না সীতাপতিবাবুর। বাড়িতে সময়মত খেতে যাবারও ফুরসুৎ হয় না। হৈ হৈ করতে করতে গাড়ি ছোটে, পানসী চলে, আর মাইফেল হয়। তারপরই হঠাৎ বজ্রাঘাতের মত মামলা শুরু হলো কাকা-খুড়োদের সঙ্গে। সম্পত্তি নিয়ে ভাগাভাগির মামলা। একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে পড়লো সীতাপতিবাবু। সেই থেকেই সীতাপতিবাবু পৈতৃক বাস উঠিয়ে এইখানে চলে এল। এই ফড়েপুকুরের মাধব দত্তর বাড়ির আস্তাবল বাড়ির নীচের ঘরে।

মাধব দত্ত প্রথম প্রথম বলতেন—তুমি এই বয়সেই বেরসিক হয়ে পড়লে সীতাপতিবাবু?

সীতাপতিবাবু বলতো—আমি মানুষের সমাজের বার হয়ে গেছি স্যার—

—তা তুমি কি একেবারে শুক্রাচার্য বনে গেলে নাকি এবার?

—আজ্ঞে, সে হলে তো বেঁচে যেতাম স্যার!

তারপর যখন সবাই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যেতেন, তখন সীতাপতিবাবু একলা নিজের ঘরটিতে গিয়ে বসতো। কিংবা চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়তো নিজের তক্ত-পোশে। সেই যতক্ষণ না বনমালী এসে খেতে ডাকে, ততক্ষণ। মাথার মধ্যে এলো-পাতাড়ি ভাবনাগুলো নিয়ে জট পাকাতো আর জট ছাড়াতো। তারপর খাওয়া-দাওয়ার পর আবার সেই রকম। সমস্ত বাড়ি তখন নিষুতি হয়ে গেছে। বনমালী খাইয়েছে ভাল, পাতে দই দিয়েছে। ঘুমে চোখদুটো জুড়ে আসছে।

হঠাৎ একদিন এক কাণ্ড হলো। বাইরে থেকে কে যেন দরজায় টোকা মারলে।

সীতাপতিবাবু শুয়ে শুয়ে বললে—কে?

খানিক চুপ করে থেকে আবার বললে—কে?

কেউই না। কেউই সাড়া দিলে না। সীতাপতিবাবু স্পষ্ট শুনেছিল কে যেন দরজায় টোকা দিলে। আস্তে আস্তে উঠলে সীতাপতিবাবু। উঠে দরজার খিল খুললে। কেউ কোথাও নেই। কাশেম মাধব দত্তর সঙ্গে গাড়ি চালিয়ে বাইরে গেছে। শুধু ঘোড়াগুলোর মুখে দড়ি বাঁধা। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে। বাগানের কামিনী গাছের ঝাড়টা ভূতের মতন চুপ করে মধ্যিখানে জিরোচ্ছে। এ-পাশে মাধব দত্তের বৈঠকখানা, রান্নাবাড়ি, তার ওপাশে অন্দর-মহল—সমস্ত অন্ধকার। বন-মালী-টনমালী সব ঘুমোচ্ছে। শুধু বার-মহলের গেটের মাথায় একটা বাতি জ্বলছে। ওটা সমস্ত রাত অমনি করে ঠায় জ্বলবে।

সীতাপতিবাবু আবার ঘরে ঢুকলো। ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে তক্তপোশের ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লো। তখন মাধব বোধ হয় বরানগরে, কি খড়দয়, কি শ্রীরামপুরে, কি হাটখোলার বস্তিতে কিংবা পুঁটির বাড়িতে একাদশীর নিশি-পালন করছেন। সঙ্গে আছে সংসারবাবু, গৌরীহরবাবু, নিতাইবাবু আর প্রাণ-কেষ্টবাবু। মদের আর মাংসের আর তবলার আর হারমোনিয়ামের সঙ্গে ঘুঙুরের মিঠে বোলে ফুর্তির হাওয়ায় ঘূর্ণি লাগিয়ে দিয়েছে হয়ত।

পরের দিন সকালে উঠে চান করতে গিয়ে সরলার সঙ্গে দেখা।

—হ্যাঁ গো, ও সরলা!

BanglaBook.org

সরলা ঘোমটা টেনে পাশ করে সরে দাঁড়াল।

সীতাপতিবাবু তখন গামছা পরেছে। তেল মেখেছে। বললে—কাল রাত্তিরে তুমি ডাকছিলে নাকি গো?

—আমি? আমি তো কই ডাকিনি বাবু!

সরলা ঘোমটাটা আর একটু টেনে নামালে মুখের ওপর। বেশ জোয়ান চেহারার মেয়েমানুষ সরলা। পান খায়, নাকে রসকলি আঁকে, চুলে তেল মেখে সিঁথি কাটে। দত্ত-বাড়ির অনেককালের ঝি। অন্দর-মহলের খাস ঝি।

সীতাপতিবাবু বললে—এই তখন মাত্র খেয়ে এসে চিৎপাত হয়ে শুয়েছি তক্ত-পোশের ওপর, এমন সময় মনে হলো কে যেন ডাকলে—

সরলা জিভ কাটলে। বললে—সে কি বাবু, আমি কেন ভদ্দরলোককে ডাকতে যাবো রাত্তির বেলা, আমার অমন স্বভাব-চরিত্তির নয় বাবু—

সীতাপতিবাবু বললে—না, আমিও তো তাই ভাবছিলাম, সরলার তো স্বভাব-চরিত্র জানি, সে কেন ডাকতে যাবে অমন করে? তা হবে। আমারই মনের ভুল হয়তো!

সরলা বললে—আর কারো গলা শুনেছেন হয়ত—হয়ত সৈরভী-মাগীর কাজ--

—সৈরভী? সৈরভী কে?

—আজ্ঞে, সৈরভীকে চেনেন না? ওই যে কাঁচপোকা রং-এর শাড়ি পরে পাছা দুলিয়ে বেড়ায়, নাকে নথ পরে, ও মাগী দেখতে ওই রকম, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ছেনাল—

সীতাপতিবাবু আর ঘাঁটালে না। দত্ত-বাড়ির ঝি-রাও এক-একজন রায়বাঘিনী। যখন রান্না-বাড়িতে ঝগড়া শুরু করে গলা ছেড়ে, তখন কাক-চিল পর্যন্ত তিষ্ঠোতে পারে না সেখানে। সীতাপতিবাবু যখন খেতে বসে, তখনই এক-একদিন শুরু হয়ে যায়। তখন আর গোলমালে কান পাতা যায় না। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে উঠে পালিয়ে আসে। জোয়ান-জোয়ান মেয়েমানুষ হাত-পা তুলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে। মাধব দত্ত সকাল থেকে ঘুমোয় বার-বাড়িতে। সেখানে তাদের গলার আওয়াজ পৌঁছয় না। কিন্তু টের পায় ভেতর-বাড়ির লোক। একশোটা ঝি আর একশোটা চাকর তখন উঠোনে এসে জড়ো হয়। এক-এক দল এক-এক দিকে। প্রায় হাতাহাতি চুলোচুলি হবার যোগাড়। জোয়ান মেয়েমানুষেরা ক্ষেপে গেলে যে কিরকম চেহারা হয়, তা আগে কখনও দেখেনি সীতাপতিবাবু। কী সব চেহারা! হাতির মতন ঊরু, হাতির মতন ছাতি। সেই ছাতি দুলিয়ে, সেই ঊরু নাচিয়ে তেড়ে আসে একজন আর একজনের দিকে। তখন একজন আর একজনের চুলের মুঠি ধরে টানতে থাকে। সে-দৃশ্য চোখে না দেখলে ঠিক বর্ণনা করা যায় না। এক-একসময় উঠোনের ওপর গড়াগড়ি খায় দুজনে। দুজন ঝিতে তখন জড়াজড়ি লেগে গেছে। তখন আর কারো খোঁপার ঠিক থাকে না, গায়ের কাপড়ের ঠিক থাকে না। তখন বনমালী এগিয়ে আসে লাঠি নিয়ে। লাঠি উঁচিয়ে বলে—বেরো হারাম-জাদীরা, বেরো এখান থেকে—বেরো—

তখন শান্ত হয় সব। তখন আবার উঠে যে যার কাজে চলে যায়। তখন আবার সব থেমে যায়।

সীতাপতিবাবু বলে—হ্যাঁ গো বনমালী, তোমাদের বউরাণী কিছু বলে না—এই হৈচৈ গোলমাল...

সত্যিই তো! অন্দর-মহলে এতগুলো ঝিকে শাসন করাও তো এক দুরূহ কাজ!

BanglaBook.org

বনমালী বলে—আজ্ঞে, বউরাণীর আস্কারা পেয়েই তো হয়েছে সব এই রকম-- এদের আগা-পাস্তলা বেত মারলে এরা শায়েস্তা হয়!

তা বেত আর কে মারবে। বেত যে মারতে পারতো তার মাঝরাত্তির তখন। একবার বেলা বারোটার সময় আড়ামোড়া ভেঙে পাশ ফিরেছিলেন, তখন হয়ত এক কাপ চা গলায় ঢেলে দিয়েছে আদালত আলী। তারপর আবার সেই বিকেল চারটে পর্যন্ত। বিকেল চারটের পর তখন উঠবেন তিনি। উঠে যথারীতি পুজোর ঘরে ঢুকে একমনে পুজো করবেন। ততক্ষণে বৈঠকখানা ঘরে লোকজন গিসগিস করছে। অ্যাটর্নী হরিহরবাবু আসবেন প্রোবেটের কেস নিয়ে, উকিল হেমকান্তবাবু আসবেন এক লটে চল্লিশটা ভাড়াটে বাড়ির ট্রানস্ফার-ডীড নিয়ে। তখন একে একে এসে হাজির হবে সংসারবাবু, গৌরীহরবাবু, নিতাইবাবু আর প্রাণকেষ্টবাবু। আর তখন সীতাপতিবাবুও সেজে-গুজে আস্তে আস্তে এসে সকলের পেছনে বসবে।

চল্লিশ বছর আগের এই-ই ছিল রুটিন। এই রুটিনে চলতো ফড়েপুকুরের দত্তবাড়ির দৈনন্দিন কাজ-কর্ম। কিন্তু সীতাপতিবাবু তো জানতো না এই রুটিন-বাঁধা জীবনেও একদিন ছেদ পড়বে। একদিন এই রুটিনের বাইরে বরানগরের বলরামবাবুর বাড়িতে গিয়ে তাকে রুটিনের পূর্ণচ্ছেদ টানতে হবে।

সেদিন সৌরভী সোজা একেবারে ঘরে চলে এসেছে। একেবারে ঘরের ভেতর।

মাধব দত্তবাবু তখন সদলবলে বাইরে গেছেন যথা নিয়মে। কাশেমরাও নেই। বেশ নিরিবিলি ঘর। তামাকের নেশাটায় বেশ ঝিম ধরেছে তখন মগজে! হঠাৎ সৌরভী এসে ঘরে ঢুকলো।

সীতাপতিবাবুর নেশা কেটে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললে—কে গো?

—আমি সৌরভী, বলি, আমি তোমার কী এমন লোকসান করেছি বাবু, কী তোমার এমন পাকা-ধানে মই দিয়েছি, শুনি?

সীতাপতিবাবু বললে— ছি ছি, তুমি আমার লোকসান করতে যাবে কেন, তুমি আমার পাকাধানে মই দিতে যাবে কেন মিছিমিছি? এ কী কথা?

সৌরভী তবু গলা নামালে না। বললে—আমি নাকি তোমার বুকে সুড়সুড়ি দিয়েছি?

সীতাপতিবাবু বললে—কী ঘেন্নার কথা! তাই কখনও কেউ দেয়? তুমি আমার বুকে সুড়সুড়ি দিয়েছ?

সৌরভী বলতে লাগলো—হ্যাঁ বাবু, তুমি যখন ঘরে এসে ঘুমোচ্ছিলে, আমি নাকি তখন চুপিসাড়ে তোমার বুকে সুড়সুড়ি দিয়ে তোমাকে জাগিয়ে তুলেছি—

—ছি ছি ছি!

সীতাপতিবাবু সঙ্কোচে জড়-সড় হয়ে গেল একেবারে।

সৌরভী সমানে বলে চললো—সব্বনেশে মাগী, আমার নামে বদনাম দেওয়া! আমি পোতখালির নস্করবাড়ির মেয়ে, পেটের দায়ে পরের ঘরে চাকরি করতে এসেছি, আমাকে বলে কিনা পরপুরুষের সঙ্গে ঢলানি করি?

তারপর হঠাৎ সীতাপতিবাবুর হাতটা ধরে টানে। বলে—চলো তো বাবু, একবার চলো তো আমার সঙ্গে, মাগীর সঙ্গে মোকাবিলে করি, মাগীর মুখে খ্যাংরা ঘষে দিই--

বলে সীতাপতিবাবুর হাত টানতে লাগলো সৌরভী।

সীতাপতিবাবু তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় ঠিক করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—কোথায় যাবো? কোথায় যেতে হবে আমাকে—

BanglaBook.org

—চলো না, মাগীর দেমাক আমি ভাঙবো, তবে আমার নাম সৌরভী দাসী—আমাকে বলে কিনা ছেনাল—

সত্যি সত্যিই সৌরভী সীতাপতিবাবুর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল বাইরে।

সীতাপতিবাবু যত আপত্তি করে, সৌরভী তত হাত ধরে টানে। টানতে টানতে একেবারে ভেতরে নিয়ে গেল। রান্নাবাড়ির খিড়কি দিয়ে একেবারে উঠোনের মাঝখানে। জোয়ান চেহারা সৌরভীর। গায়ে অসীম ক্ষমতা।

সীতাপতিবাবু বলে—এই দ্যাখ, কী কাণ্ড বল দিকিনি, কোথায় টেনে নিয়ে চললে আমাকে—

তারপর যে কোথা দিয়ে, কোন্ সিঁড়ি দিয়ে ঢুকে কোন্ মহলের কোন্ ঘরে নিয়ে গেল তা আর চিনতে পারলে না সীতাপতিবাবু।

সৌরভী তখন গজরাচ্ছে— অ লো অ হারামজাদী শতেকখোয়ারী, আয় ইদিকে, তোর সরলা নাম ঘুচিয়ে দেব আমি, আমি পোতখালির নস্করবাড়ির মেয়ে, আমাকে বলে ছেনাল—

সীতাপতিবাবুর বুকটা তখন দুরদুর করছে। টানতে টানতে নিয়ে এসেছে একেবারে অন্দর-মহলের ভিতরে। উঠোনেই লোক জমা হয়ে গিয়েছিল সৌরভীর কাণ্ড দেখে। কিন্তু সৌরভীর মুখের ওপর কথা বলে এমন সাধ্য কারো নেই। সৌরভীর গলার ঝাঁজ শুনে যে যেখানে পেরেছে গা-ঢাকা দিয়েছে তখন। কার ঘাড়ে কটা মাথা যে সৌরভীর মুখের সামনে দাঁড়াবে।

সৌরভী তখনও চিৎকার করছে—অ হারামজাদী অ শতেকখোয়ারী—

সীতাপতিবাবু তখন চুপি চুপি বলছে—ছাড়, হাত ছাড় সৌরভী, ছাড় আমাকে—লাগছে—

—কী হলো রে সৌরভী?

হঠাৎ যেন এক অঘটন ঘটে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সৌরভী সঙ্গে সঙ্গে হাত ছেড়ে দিয়েছে। সীতাপতিবাবু দেখলে পাশের ঘর থেকে কে একজন এসে ঢুকলো সেই ঘরে, আর সীতাপতিবাবুকে দেখেই একেবারে চট্ করে মাথায় ঘোমটা দিয়েই আবার পাশের ঘরে দৌড়ে সরে গেল। এক মুহূর্তের ব্যাপার। কিন্তু সীতাপতি-বাবু পুরোপুরি চেহারাটা দেখে ফেলেছে এক মুহূর্তের মধ্যেই। অপরূপ রূপ, মাথায় চওড়া করে খোঁপা বাঁধা, গলায় বিছে হার, সিঁথিতে মোটা করে সিঁদুর লাগানো। সীতাপতিবাবুর চোখ যেন জুড়িয়ে গেল দেখে। এমন রূপও মানুষের হয়! এত সৌন্দর্যও থাকে মানুষের শরীরে! ভগবান এমন করে সব ক্ষমতা উজাড় করে দেয় একজনকে!

সীতাপতিবাবু পালিয়েই চলে আসছিল।

কিন্তু গোলকধাঁধার মধ্যে যেন পথ হারিয়ে ফেললে। কোন্ দিক্ দিয়ে, কোথা দিয়ে যে ফিরতে হবে তার আর হদিস পাওয়া গেল না। ঘরের পর ঘর, তারপর সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি পেরিয়ে আবার ঘর, আবার সিঁড়ি। তারপর উঠোন। উঠোন পেরিয়ে রান্নাবাড়ি। তারপর খিড়কি। খিড়কি পেরিয়ে আস্তাবল-বাড়ি। আস্তাবল-বাড়ির নীচের ঘরে এসে তবে যেন দম ফেললে সীতাপতিবাবু।

সমস্ত বাড়িটা যেন তখন চোখের সামনে বনবন করে ঘুরছে। কে উনি? কে হঠাৎ ঘরে ঢুকেছিল? কার গলা অত মিষ্টি? ভগবান কাকে অত রূপসী করেছে? এমন রূপও কি মানুষের হতে হয়?

BanglaBook.org

সেদিনও খেতে ডাকলে বনমালী। সীতাপতিবাবু খিড়কি পেরিয়ে রান্নাবাড়ির দালানে খেতে বসলো। কী খেলে সীতাপতিবাবু তা সীতাপতিবাবুই জানে। বনমালী কী বললে তাও কানে গেল না। কী খাচ্ছে তাও যেন মনে করতে পারলে না। যখন খাওয়া সেরে তক্তপোশের ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে এমন সময় সৌরভী আবার এল।

সীতাপতি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসেছে।

বললে—কী রে সৌরভী? কি রে?

সৌরভী ভাল করে গায়ের কাপড়টা টেনে দিলে। ঘোমটাটা নামিয়ে দিলে।

সীতাপতিবাবু বললেন—কী সর্বনাশ করেছিলি বল্ দিকিনি তুই? এখন যদি কর্তাবাবুর কাছে রিপোর্ট হয়ে যায় তখন? তখন কী হবে বল্ তো?

সৌরভী হাসলো শুধু। কিছু বললে না।

তারপর হাতটা বাড়িয়ে বললে—এই নাও বাবু, পান নাও—

পান! সীতাপতিবাবু অবাক হয়ে গেল। পান তো জোটে না কখনও তার কপালে!

বললে—পান কী রে? পান কী হবে?

তুমি খাবে বাবু, তোমার জন্যে এনেছি—

সীতাপতিবাবু পানটা নিয়ে বললে—কে দিলে পান?

—আমি!

সীতাপতিবাবু পানটা মুখে পুরে দিয়ে হাসলো সৌরভীর মুখের দিকে চেয়ে। কিন্তু সৌরভী আর দাঁড়াল না। সোজা বাইরে চলে গেল।

সীতাপতিবাবু ভেবেছিল পান দিয়ে সৌরভী খানিক দাঁড়াবে, দুটো কথা বলবে, আবার একটু হাসবে। কিন্তু কিছুই করলো না দেখে একটু অবাক হয়ে গেল। হঠাৎ ডাকলে—ও সৌরভী, সৌরভী—

সৌরভী যেতে গিয়েও থেমে গেল। বললে—কী বাবু?

সীতাপতিবাবু উঠে কাছে গেল। তখন বয়েস কম ছিল সীতাপতিবাবুর। নতুন যৌবন বলা যায়। সৌরভী একবার চাইলে সীতাপতিবাবুর দিকে। বললে—কিছু বললে আমাকে?

সীতাপতিবাবু ফিস্‌ফিস্ করে বললে—ও কে রে সৌরভী?

—কার কথা বলছ?

—ওই যে তখন ঘরে ঢুকে আমাকে দেখেই দৌড়ে পালালো? ও কে?

সৌরভী বলল—ও, তাই বলো—ওই তো বউরাণী—

—বউরাণী? কর্তাবাবুর বউ?

চল্লিশ বছর আগে সেই ঘটনাটা সীতাপতিবাবুর জীবনের সঙ্গে এমন করে জড়িয়ে গেল যে ফড়েপুকুরের এই দত্তবাড়ির ইতিহাসও অভিশপ্ত হয়ে উঠলো সেই সঙ্গে। চল্লিশ বছর ধরে সীতাপতিবাবু এই বাড়িতেই খেয়েছেন, এই বাড়িরই পরেছেন, এই বাড়িতেই হয়ত মারাও যেতেন। কিন্তু চল্লিশ বছর পরে হঠাৎ অঘটন ঘটলো। হঠাৎ ছন্দপতন ঘটলো।

তা সেই পান দেবার পর থেকেই শুরু হলো।

যখন কেউ থাকতো না কাছে, যখন রান্নাবাড়ির আলো নিভে যেত, যখন আস্তাবল-বাড়ির কাশেমরাও গাড়ি নিয়ে বাবুর সঙ্গে চলে যেত, বাগানের কামিনী গাছটা অন্ধকারে ভূতের মতন থম্‌থম্ করতো, তখন আসতো সৌরভী। তখন

BanglaBook.org

আর দরজায় টোকা দিতে হতো না। তখন আর আগে থেকে নোটিসও দিতে হতো না। সীতাপতিবাবু রান্নাবাড়ির দালানে বসে খেয়ে নিয়ে ঘরে এসে বসতো। একটু তামাক খেত। তারপর ফরসা জামা-পাকড় পরতো, গোঁফে একটু আতর মাখতো। দাড়িটা তখন সকালবেলাই নিয়ম করে কামাতে হতো। সেই দাড়ির ওপর গালে মুখে গলায় ঘাড়ে আবার সাবানও মাখতো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে রেডি হয়ে বসে থাকতো। তারপর এক সময়ে সৌরভী আসতো পান নিয়ে।

সীতাপতিবাবু উঠে দাঁড়াতো সৌরভীকে দেখেই।

বলতো—কী রে সৌরভী, তৈরী?

সৌরভী ফিস্‌ফিস্‌ করে বলতো—হ্যাঁ, চলো বাবু—

তখন সীতাপতিবাবু পানটা মুখে পুরে দিয়ে চিবোতে চিবোতে হয়ত এক-একদিন বলতো—আজকে পানটা কে সেজেছে রে? খুব খোসবাই বেরোচ্ছে তো!

সৌরভী উত্তর দিত না কিছু। শুধু বলতো চুপ করো বাবু, কে শুনতে পাবে আবার—

তারপর সেই অন্ধকার খিড়কি পেরিয়ে, রান্নাবাড়ি পেরিয়ে, বারমহল ভেতর-মহল ছাড়িয়ে একেবারে নির্দিষ্ট জায়গাটাতে পৌঁছতে অনেক রাস্তা মাড়াতে হতো সীতাপতিবাবুকে। কলকাতা শহরের বুকের মধ্যে ও ফড়েপুকুরের শান-বাঁধানো সভ্যতার মধ্যেও বড় দুর্গম সে-রাস্তা। লর্ড ক্লাইভ, লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস যে-রাস্তা মাড়িয়ে ইণ্ডিয়ায় এসেছিলেন, তার চেয়েও দুর্গম। মাধব দত্তর পূর্বপুরুষ যে রাস্তা মাড়িয়ে ফড়েপুকুরের বাস্তুবাড়ি আর অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন—তার চেয়েও দুর্গম। রাত্রির অন্ধকারে ফটোগ্রাফার সীতা-পতিবাবু ফড়েপুকুরের দত্তবাড়ির সৌধশিখরে উঠে রাত্রির সম্রাট হয়ে বসতো আর মালিক মাধব দত্ত হয়তো তখন খড়দ'র পুঁটির বাড়িতে একাদশীর নিশিপালন করতো তবলা হারমোনিয়াম মাংস আর গজল গানের হট্টগোলের মধ্যে।

বিকেলবেলা যথারীতি সীতাপতিবাবুকে দেখে মাধব দত্ত বলতেন—কী হে, কেমন আছ আজকাল?

সীতাপতিবাবু সবিনয়ে বলতো আজ্ঞে, আপনার দয়ায় ভালই আছি।

দয়াই বটে! আগের রাত্রে খড়দ'র পুঁটির বাড়ির মাইফেলের কথা স্মরণ করে সকলের দয়াই তো সীতাপতিবাবুর ওপর। সীতাপতিবাবু তো সংগে যায় না। সুতরাং মজাটা বুঝতে পারে না। আহা, মায়া হয় ওর জন্যে।

মাধব দত্ত বলতেন—পুঁটিকে চিনতে তো সীতাপতি?

সীতাপতিবাবু বলতো—আজ্ঞে, চিনতাম বৈ কি! এখনও চিনি। কত পোজের ছবি তুলেছি তার—

মাধব দত্ত বলতেন—সেই পুঁটির গরম ভেঙেচি কাল—জানো?

—কী রকম?

সীতাপতিবাবু আগ্রহের ভান করতো।

মাধব দত্ত গড়গড়ার নলে মুখ দেবার আগে বলতেন—বড় গরম ছিল মাগীর, সব গরম একেবারে মুচড়ে ভেঙে দিয়েছি—

—কি রকম শুনি স্যার?

মাধব দত্ত আঙুল দিয়ে সংসারবাবুদের দিকে দেখিয়ে দিতেন। বলতেন—ওই ওদের জিজ্ঞেস করো—

গতকালের ঘটনা আবার বর্তমানের ঘটনা হয়ে উঠতো। সে ঘটনার বিশদ বর্ণনা শুনতে শুনতে আবার সবাই যেন সশরীরে সেই খড়দ'য় চলে যেত। আবার তামাক

BanglaBook.org

আসতো, আবার আদালত আলী গড়গড়ার নলটা সামনে এসে তুলে দিত।

সংসারবাবু বলতো—আপনি কি যৌবনেই যোগী হয়ে গেলেন নাকি সীতাপতিবাবু?

প্রাণকেষ্টবাবু বলতো—আসল জিনিসটাই ভোগ করলেন না, জীবনে আর কী করলেন আপনি?

নিতাইবাবু বলতো—এবার গেরুয়া নিন সীতাপতিবাবু।

গৌরীহরবাবু বলতো—তার চেয়ে একটা গুরু-ফুরু পাকড়ে দীক্ষা নিয়ে ফেলুন, কাজ হবে।

সীতাপতিবাবু সকলের কথাতেই হাসতো, বলতো—শেষ পর্যন্ত তাই-ই করতে হবে ভাই—

সেদিন সৌরভীর বদলে সরলা এল। সীতাপতিবাবু অবাক হয়ে গেল দেখে। বলেন—কী গো, সরলাবালা, আজকে কোন্ দিকে সূর্যি উঠলো গো?

সরলা বললে—অমন কথা বলবেন না বাবু, আপনি অমন কথা বললে আমার চাকরি চলে যাবে।

সীতাপতিবাবু হাসলো। বললো—তোমার চাকরি চলে যাবে মানে? তুমি হলে বউরাণীর খাস-বাঁদী—

—না গো বাবুমশাই, আমরা তো আর তাম্বুল-বিহার পান খাইয়ে মানুষ বশ করতে পারি না। আমার পান যে ঝাল—

সীতাপতিবাবু বললে—ঝাল কিনা খাইয়েই একবার দেখ না তুমি—

সরলা বললে—না বাবু, দরকার নেই, শেষকালে পান খাইয়ে কি চাকরি খোয়াব?

সীতাপতিবাবু বললে—বালাই ষাট, তোমার চাকরি যে খাবে সে এখনও জন্মায়নি দত্তবাড়িতে—সৌরভী তো কোন্ ছার!

সরলা যেন হঠাৎ বড় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো। গলা নীচু করে বললে—তবে একটা কথা বলি বাবুমশাই, শুনুন—

—বলো।

সরলা বললে—কাউকে যেন বলবেন না, কাউকে না, এই আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করুন—

সীতাপতিবাবু সরলার গা ছুঁলে। বললে—এই দিব্যি করলুম, এবার বলো।

সরলা বললে—হাতীবাগানের কবিরাজী দোকান থেকে একছটাক আমলকী-ভস্ম আর আধপোয়া ফট্‌কিরি এনে দিতে হবে—

—কেন? কী হবে? কার জন্যে?

—তা বলবো না, এনে দিতে পারবেন কি না বলুন।

সীতাপতিবাবু বললে—তা বলছ যখন, তখন দেব এনে—

সরলা আঁচলের গেরো খুলে পয়সা বার করছিল।

সীতাপতিবাবু বললে—পয়সা থাক, আমার কাছে পয়সা আছে।

সরলা চলে যেতেই সীতাপতিবাবু চটিটা পায়ে দিয়ে বেরোল। জিনিসটা তাড়াতাড়ি চাই সরলার। সরলা যাবার সময় বলে গিয়েছিল—কাউকে যেন বলবেন না বাবুমশাই, গা ছুঁয়ে দিব্যি গেলেছেন, মনে থাকে যেন।

হাতীবাগান কাছেই। দোকানের কবিরাজ মশাই জিনিসের নাম শুনেই সীতাপতিবাবুর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে চাইলেন। বললেন—জিনিসটা কী হবে বলতে পারেন?

BanglaBook.org

সীতাপতিবাবু বললে—তা জানি না মশাই, আমাকে কিনতে বলেছে আমি কিনছি।

—কে কিনতে বলেছে?

সীতাপতিবাবু বললে—আমি মশাই ফড়েপুকুরের মাধব দত্তর বাড়িতে থাকি, সেই বাড়ির একজন ঝি কিনতে দিয়েছে—

কবিরাজ নামটা শুনেই আর কিছু বললেন না। নিক্তি দিয়ে ওজন মেপে মেপে জিনিসটা কাগজে মুড়ে দিলেন। সীতাপতিবাবু আবার চটি পায়ে ফটাস্ ফটাস্ করতে করতে বাড়িতে এলেন।

কিন্তু পরের দিনই বাড়ির সামনে কাক-চিলের ভিড় লেগে গেল। মাধব দত্তর বাড়ির সামনে ডাস্টবিনের ভেতর টাটকা রক্তমাখা কাপড়ের পুঁটলি। অফিস যাবার পথে ভিড় লেগে গেল লোকের। যে আসে সামনে সে আর নড়ে না। মাথার ওপর কাকের ভিড়। কে ফেলেছে গো? কোন্ মাগীর কাণ্ড?

একজন বললে—দত্ত-বাড়ির কাণ্ড, বুঝলেন দাদা,—এ দত্তবাড়ি না হয়ে যায় না।

আর একজন বললে—এইসব পাপ জমা হচ্ছে এখন, একদিন পারা হয়ে ফুটে বেরোবে, তখন বুঝবে—

কিন্তু দত্তবাড়ির মাধব দত্ত এ-সব কিছু টের পান না। তাঁর তখন মাঝ রাত। তখন আদালত আলীও ঘুমোচ্ছে। কাশেমরাও সারারাত জেগে এসে তখন ঘুমে অসাড়। পুলিস এল, জমাদার এল—সাফ-সুতরো হলো। আশে-পাশের হাজারো-খানা বাড়ি, কাকে ধরবে ধরো। কাকে সন্দেহ করবে করো। এ-রকম আগেও হয়েছে, পরেও হবে। সেই দত্তবাড়ির পূর্বপুরুষদের আমল থেকেই হয়ে আসছে। তখন হৈ-চৈ হতো না, হাসাহাসি হতো না, পুলিস-বরকন্দাজ আসতো না, কাকে-চিলে-শকুনিতে ছোঁ মেরে নিয়ে যেত—এই যা তফাৎ, তারপর দিনকাল বদলে গেল। লুকোছাপা চললো। বাইরে থেকে পালিশ বাড়লো। ফরসা ধোপ-দোরস্ত চকচকে চেহারা হলো। সায়া-ব্লাউজ কোট-প্যান্টুলুনের বাহার বাড়লো, ঘোড়ার গাড়ি ছেড়ে মোটরগাড়ি হলো। ইংরেজী লেখাপড়া বাড়লো। কলেজ-কাছারি বাড়লো। উকিল, মুহুরি, ব্যারিস্টার, আইন সব বাড়লো। দফায় দফায় আইন পাস হলো। বিধবা-বিয়ে প্রচলিত হলো। কিন্তু কলকাতা শহরের মানুষ এক ইঞ্চি এগোল না। বরং মিথ্যে কথা, জোচ্চুরি, খুন, রাহাজানি বেড়েই চললো। এগোন দূরের কথা, মানুষ আবার পেছিয়ে গেল অনেকদূর।

তা সেই ফড়েপুকুর আজও আছে।

সেই ফড়েপুকুরও আছে, সেই কলকাতা শহরটাও আছে, সেই মাধব দত্তও আছে, সংসারবাবু, গৌরীহরবাবু, নিতাইবাবু, প্রাণকেষ্টবাবুরাও আছে। বদলেছে শুধু তাদের চেহারা আর বদলেছে তাদের বাইরের পালিশ। বলতে গেলে এখন সারা কলকাতা শহরটাই মাধব দত্তর বাড়ি হয়ে গেছে। এই শহরেও ঠিক সেইরকম করে রুক্মিণীহরণ হয়, বিধবা-উদ্ধার হয়, পুঁটির বাড়িতে একাদশীর নিশিপালন হয়। আর সীতাপতিবাবুরা সেই আশ্রয়ে থেকে মোসাহেবী করে, গঞ্জনা খায়। যত গঞ্জনা খায়, তত মোসাহেবী করে। গঞ্জনা তো গায়ে লেখা থাকে না, কিন্তু বড়-লোকের আশ্রয়ে থাকলে ভালো চাকরি পাওয়া যায়, দুটো পয়সা ছিটকে হাতে আসে। সেটাই কি কম লাভ? কিন্তু তবু এ-যুগের সীতাপতিবাবুরা সেকালের সীতাপতিবাবুর মত অমন করে প্রতিশোধ নিতেও পারে না।

মাধব দত্তর আসরে আবার বিকেলবেলা আসর বসে। তামাকের নলটা মুখ

থেকে নামিয়ে মাধব দত্ত বলে—সারাটা রাত কী করে কাটাও হে সীতাপতি?

সীতাপতিবাবু বলে—আজ্ঞে, ঘুমিয়ে।

—হাসালে তুমি—বলে মাধব দত্ত হেসেই আকুল।

বলেন—রাতটা যদি ঘুমিয়েই কাটাবে তো বেঁচে থেকে লাভ কী!—কি বল হে চাটুজ্যে?

সবাই হাসে কথা শুনে। বলে—রাতটা ভগবান সৃষ্টি করেছে ফুর্তি করবার জন্যে। এটা তো সত্যি? তাহলে?

সীতাপতিবাবু কিছু বলে না। শুধু হাসিতে যোগ দেয়।

মাধব দত্ত বলেন—বয়স তো বাড়ছে, আর কবে ফুর্তি করবে হে?

সীতাপতিবাবু বলে—এইবার করবো স্যার, ঘা-টা সামলে নিই—

সবাই হেসে ওঠে। বলে—ঘা সামলাতে সামলাতে ততদিনে রসকষ সব শুকিয়ে ঝুনো নারকোলটি হয়ে যাবে—

একদিন রাত্রে ধরা পড়ে গিয়েছিল সীতাপতিবাবু।

সেদিন ঝম্-ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। উপর্ঝরণ বৃষ্টি। রাত এগারোটার পর থেকেই বৃষ্টি নামলো। ওইরকম বৃষ্টিতেই বুঝি দত্তবাড়ির অন্দরমহলে রাত কাটাতে আরাম। সমস্ত বাড়িটা যেন মাথা নীচু করে বৃষ্টি উপভোগ করছে। মাধব দত্ত নেই, আদালত আলী নেই, কাশেমরা নেই, সন্ধ্যাবেলার সংসারবাবু, প্রাণ-কেষ্টবাবুদের দল যথারীতি বেরিয়ে গেছে। ঝম্-ঝম্ আওয়াজ আসছে কানে। রান্নাবাড়ির ঝগড়া আর ঝিউড়িদের বাসন-মাজার শব্দও থেমে গেছে। ভাঁড়ার ঘরের দরজায় তালা-চাবি পড়ে গেছে। শুধু সিঁড়ির আলোটা টিম্-টিম্ করে জ্বলছে মাথার ওপর। বেড়ালের আনাগোনা তখন সবে শুরু হয়েছে এ-পাঁচিল থেকে ও-পাঁচিলে। কার্নিসের নীচের পায়রাগুলোও থেমে গেছে। বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর সব থম্‌থম্ করছে।

হঠাৎ ঠক্ ঠক্ করে দরজায় শব্দ হলো।

—কে?

গয়নার ঠুং-ঠাং শব্দ হলো। চাপা-গলার ফিসফিসানি কানে এল।

—কে?

বাইরে থেকে চাপা-গলার আওয়াজ এল। সৌরভীর গলা।

—কী রে সৌরভী?

—বাবুমশাই বেরিয়ে এস, কর্তাবাবু এসে গেছে।

কর্তাবাবু! মাধব দত্ত! সাপের মত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো সীতাপতিবাবু। আর সময় নেই। তখন আর কোনদিকে ভাববারও সময় থাকে না। কোনদিকে না তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খাট থেকে লাফিয়ে উঠেছে। কোথায় ফতুয়া, কোথায় চাদর, সে-সব দেখবার সময় নেই। চুলটা আলুথালু হয়ে গেছে। আঁচড়াবারও সময় নেই। আলো জ্বালবারও সাহস হবার কথা নয় তখন। তখনও কিন্তু ঘরময় সুবাসিত তেলের সুগন্ধ ভুরভুর করছিল। মাঝ-রাত। কিন্তু তবু মনে হচ্ছিল যেন এই এখুনি সন্ধ্যে হলো, এই এখুনি রাত শুরু হলো। এইসব রাতগুলোই যেন বড় ছোট মনে হতো সীতাপতিবাবুর কাছে। এইসব রাতগুলোই বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যেত। এইসব রাতগুলোই বড় সংক্ষিপ্ত মনে হতো। এইসব রাতগুলোর কথাই সীতাপতিবাবুর শেষ জীবনের একমাত্র সম্বল ছিল।

সৌরভীর কথায় সীতাপতিবাবু তাড়াতাড়ি দরজার হুড়কো খুলে বাইরে

এসেছে।

—কী রে সৌরভী?

—আজ্ঞে, কর্তাবাবু ফিরে এসেছে।

সৌরভী তখনও হাঁফাচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে আসতে আসতে তার দম আটকে আসছে যেন।

—এমন তো হয় না। হঠাৎ কর্তাবাবু ফিরে এল কেন?

সৌরভী বললে—তা জানি নে বাবুমশাই। আদালত তামাকের বন্দোবস্ত করছে, বাবুর মেজাজ বিগড়ে গেছে।

তখন আর অত কথা বলবার ফুরসৎই নেই। সেই অন্ধকারের মধ্যে রাস্তা হাতড়ে আসাও মুশকিল। আলো জ্বালা যাবে না, শব্দ করা চলবে না। লুকিয়ে লুকিয়ে পা টিপে টিপে এসে রান্নাবাড়ির খিড়কী পেরিয়ে আস্তাবলবাড়ির নীচের ঘরে এসে ফাঁকা শক্ত তক্তপোশটার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। সে ঘরে আর সুগন্ধ নেই। মাঝে মাঝে ঘোড়ার পায়ের ক্ষুরের আওয়াজ শুধু। ঘোড়ার গোবরের দুর্গন্ধ। মাঝে মাঝে ঘোড়াগুলো আবার চাট্ মারে, নাক দিয়ে শব্দ করে। শক্ত তক্তপোশের ওপর শুয়ে শুয়ে শিরদাঁড়ায় ব্যথা করে।

এমন সাধারণতঃ হয় না। মাধব দত্ত বাড়ি থেকে সদলবলে বেরিয়ে যাবার পরই সমস্ত নিরাপদ হয়ে যায়। তখন আর কারো পরোয়া করবার দরকার হয় না। মাধব দত্ত বেরিয়ে গেলে তখন ঢিলে হয়ে যায় সমস্ত বাড়িটা। তখন ঝগড়া শুরু হয়ে যায় রান্নাবাড়িতে, তখন ঝিদের গলা উঁচু হয়, রখন বনমালী একচ্ছত্র। তখন সীতাপতিবাবুর আরম্ভ হয় নৈশ-বিহার। তখন গোঁফে আতর দেয় সীতাপতিবাবু। তখন মুখে-ঘাড়ে সাবান মাখে, তখন খেউরী করে ধুতি-ফতুয়া পরে তৈরি হয়ে থাকে। তখনই পান নিয়ে এসে দরজায় টোকা দেয় সৌরভী।

সীতাপতিবাবু তামাকের নলটা মুখ থেকে রেখে দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে।

বলে—কী রে সৌরভী, সব তৈরি?

সীতাপতিবাবু সাবধান হবার জন্যে তবু জিজ্ঞেস করে—কর্তাবাবু তো বেরিয়ে গেছে, না রে?

—হ্যাঁ বাবুমশাই হ্যাঁ, ভালো করে না দেখে কি আর তোমায় ডাকতে এইচি?

—আদালত? আদালত বেটা বড় শয়তান, আদালতও গেছে তো?

শুধু আদালত আলী নয়। কাশেমদের ঘরটাও একেবারে উঁকি মেরে দেখে নেয় সীতাপতিবাবু। কেউ নেই। ফাঁকা, ধুধু করছে। মাধব দত্তর পেয়ারের সাদা ঘোড়া-জোড়াও গাড়ি টেনে নিয়ে গেছে।

—আর বনমালী?

—আজ্ঞে, বনমালী তো বউরাণীর দলে। ও-বেটা কিছু বললে ওর মাথা ভেঙে দেব না। নোড়া দিয়ে ওর মাথা ভেঙে ফেলবো না তাহলে?

তা বটে। বনমালীকে, সরলাকে, ঠাকুরকে, অন্দর-মহলের চাকর-ঝি-ঝিউড়ি-দের কাউকে ভয় করবার দরকার নেই।

সবদিকে নিশ্চিন্ত হয়ে সীতাপতিবাবু চটিটা পায়ে গলিয়ে নেয়। আর্শিতে একবার মুখখানা দেখেও নেয় তাড়াতাড়ি, গোঁফজোড়া একবার পাকিয়েও নেয় বাঁ হাতের দুটো আঙুল দিয়ে।

বলে—চল্—এবার চল্ তুই আগে আগে—

রোজকার জানাশোনা পথ। না-চেনবার কথা নয় সীতাপতিবাবুর। তখন প্রতি রাত্রে গিয়ে গিয়ে চেনা হয়ে গিয়েছিল রাস্তাটা। প্রথমে রান্নাবাড়ির খিড়কি পার

BanglaBook.org

হতে হবে। তারপর রান্নাবাড়ির শান-বাঁধানো উঠোন। তারপর দরদালান পেরিয়ে সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি পেরিয়ে দোতলার দালান। সেই দালান পেরিয়ে অন্দর-মহলের রাজ্য। সেই রাজ্যে ঢোকবার পরই সীতাপতিবাবুর একটু গা-টা সিরসির করে ওঠে। বহুদিনের নিষিদ্ধ অঞ্চল। কবেকার কোন্ পূর্বপুরুষের পূর্বজন্মার্জিত পুণ্য-ফলে ফড়েপুকুরে এই দত্ত-বাড়ির প্রথম পত্তন হয়। সে-আদিকাল থেকে সে রাজ্যে সূর্যের আলোও ঢুকতে ভয় পেয়ে আসছে। যারা এ-অঞ্চলের বাসিন্দা, তারা একদিন এখানে এসে সেই যে ঢুকেছে বেনারসীর ঘোমটায় মুখ ঢেকে, আর তাদের মুখ কেউ দেখতে পায়নি। ঝিল্‌মিলি আর খড়খড়ির ভেতর দিয়ে বাইরের পৃথিবীকে যারা দেখবার চেষ্টা করেছে, তারা কতটুকু দেখেছে তা তারাই জানে। রাজমিস্ত্রীরা সে পথ ভালো করে এঁটে দিয়েছিল বাড়ি তৈরি হবার সময়। যেটুকু আলো আসতো ভেতরে তা রাজমিস্ত্রীদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে, যেটুকু হাওয়া আসতো তা-ও বস্তু-বিশেষজ্ঞদের বুদ্ধি-বিবেচনা অতিক্রম করে তবে আসতো। তাদের সঙ্গে দিতে উপাদানে অন্ত ছিল না। মেদিনীপুর ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চল থেকে ঝি আসতো। বেছে বেছে পরখ করে তাদের কাছে ভর্তি করানো হতো। পরীক্ষায় তাদের পাস করতে হতো আবার। জোয়ান ঝি রাখার নিয়ম ছিল না সে-কালের দত্তবাড়িতে। গতর ঢিলে হয়ে গেলেই সুবিধে। তারা বউদের পা ঘষে দেবে সাবান দিয়ে, পায়ে আলতা পরাবে। কোমরে ব্যথা হলে কোমর টিপে দেবে। তারা চুল আঁচড়ে খোঁপা বেঁধে দেবে মাথায়। কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে দেবে। রান্নাবাড়ি থেকে ভাতের থালা এনে দেবে। পানের খিলি এনে দেবে ভাঁড়ার ঘর থেকে। ঘুম না এলে পায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। সুখের সপ্তম স্বর্গ বানিয়ে গিয়েছিলেন দত্তবাড়ির পূর্বপুরুষরা। নিয়ম-কানুন বেঁধে দিয়ে গিয়ে-ছিলেন। ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের কোনও ত্রুটি রাখেননি তাঁরা। টাকাও যেমন উপায় করেছিলেন দুহাতে, তেমনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ঢালাও ব্যবস্থা করতেও ভোলেননি। প্রত্যেকটি বউয়ের আলাদা আলাদা শোবার ঘর, আলাদা আলাদা বসবার ঘর, আলাদা আলাদা সাজঘর! বাগান ছিল ফুলের জন্যে। কামিনী টগর আর বেল-ফুলের ঝাড়ে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন বাগান। সেই বাগানের মালীর ব্যবস্থাও ছিল। সেই ফুলের মালা তৈরি হবে বিকেল থেকে। সেই মালা আবার বৌরা বিকেলবেলা গা ধুয়ে খোঁপায় পরবে। মেদিনীপুর আর ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলের বুড়ি ঝিয়েরা সোনা-বাঁধানো চিরুনিতে খোঁপায় মালা এঁটে দিয়ে পার্বণী নিতো মাঝে মাঝে। শুধু মালা আঁটাই নয়। দুপুরবেলা বউরা যখন ঘুমোবে তখন পিঠের কাপড় তুলে ঝিনুক দিয়ে ঘামাচি মেরে দেবে আস্তে আস্তে। আমরা-আনন্দের যত কিছু ব্যবস্থা সম্ভব সবই করেছিলেন তাঁরা। তারপর জ্ঞাতিরা একদিন এ বাড়ি ছেড়ে এপাড়ায় ওপাড়ায় বাড়ি করেছে, ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। এ বাড়িতে লোকজনই কমে গেছে, চাকর-বাকর ঝি-ঝিউড়ি কিন্তু কমেনি। একজন বউ, তার জন্যে আরাম আনন্দের খোরাক যথারীতি যুগিয়ে আসছেন মাধব দত্ত। যে নিয়ম-কানুন পুরুষানুক্রমে চলে আসছে এ বাড়িতে, সেই নিয়ম-কানুনই বহাল আছে। সেই বিকেলবেলা গা-ধোবার পর পায়ে আলতা পরানো, কপালে টিপ দিয়ে দেওয়া, চুল বেঁধে খোঁপায় ফুলের মালা আঁটা, সবই ঠিক সেকালের মত আছে। দুপুর-বেলা ঘুমোবার আগে পিঠ খুলে দিয়ে ঝিনুক নিয়ে ঘামাচি মারাও আছে। আর আছে ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাম্বুল-বিহার দিয়ে পান খাওয়ানো। এসব নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি কোনোদিন। যুগ বদলে গেছে, দিনকাল পালটে গেছে, তবু দত্তবাড়ির অন্দর-মহলে একটি বউ-এর জন্যে সেই সব নিয়ম-কানুন চলে আসছে। মাধব দত্ত নিজেও

BanglaBook.org

যেমন সেকালের সব বংশানুক্রমিক নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করে আসছেন, সেই সদলবলে সংসারবাবুদের নিয়ে নৈশ-বিহার করে বেড়াচ্ছেন, বাড়ির ভেতরেও সেই আলতা পরা, টিপ পরা, খোঁপায় ফুল আঁটা, ঘামাচি মারা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়ে আসছে।

কিন্তু বর্তমান পুরুষের শেষ ধাপে এসেই সেই নিয়ম-কানুনে ছেদ পড়লো হঠাৎ। সত্যিই বড় হঠাৎ। মাধব দত্তও এমন কল্পনা করতে পারেননি। মাধব দত্তর ছেলে বৃন্দাবন দত্তও এতটা কল্পনা করতে পারেননি।

যে-যুগের কথা বলছি তখন বৃন্দাবন দত্ত জন্মায়নি। মাধব দত্তর একমাত্র ছেলে বৃন্দাবন দত্ত। রাজপুত্রের মত সুন্দর টুকটুকে চেহারা। সেই ছেলেই যে শেষকালে এমন করবে কে জানতো! মধুসূদন স্যাকরা বউরাণীর হারছড়া যেদিন প্রথম নিয়ে এল মাধব দত্তর সামনে, সেইদিনই প্রথম সবাই জানতে পারলো। বরানগরের বলরামবাবুও জানলো—বৃন্দাবন দত্তও জানলো কিন্তু তখন সীতাপতিবাবু মৃত্যু-শয্যায়।

তা যাহোক, সেই ঝম্‌ঝম্‌ উপর্ঝরণ বৃষ্টির মধ্যেই মাধব দত্ত সেদিন ফিরে এলেন। আদালত আলী ফিরে এল। কাশেমরা গাড়ি নিয়ে আস্তাবল বাড়িতে ফিরে এল। সীতাপতিবাবুর তখনও ঘুম আসেনি। নিজের শক্ত তক্তপোশটার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বুজে রইল। কিন্তু সব আওয়াজই কানে এল তার। আস্তাবল-বাড়ির গেট খোলা হলো। ঘোড়া দুটোকে ছোলা দেওয়া হলো। ওদিকে আদালত আলীও চেঁচাচ্ছে। আচমকা কর্তাবাবু বাড়ি এসে পড়েছে। কেউই তৈরি ছিল না তার জন্য। আবার আসরের বাতি জ্বললো। আবার তামাক সাজা হলো। বৃষ্টির মধ্যে কেউই আর কোথাও যেতে পারেনি। রাস্তায় এক-কোমর জল জমে গিয়েছে। ঘোড়া যেতে পারেনি। গাড়ি ডুবে যাবে।

সীতাপতিবাবু নিজের ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে তখনও ভয়ে ভয়ে কাঁপছিল। সীতাপতিবাবু ঘর থেকে বাইরে এল। বললে—কাশেম—

—জী হুজুর?

সীতাপতিবাবু বললে—কী হলো, ফিরে এলে যে?

—হুজুর, সব রাস্তায় পানি জমে গেছে।

—বাবুর মেজাজ বিগড়ে গেছে বুঝি?

বরানগরে যাবার কথা ছিল সেদিন। শ্যামবাজারের মোড়ে গিয়ে আর গাড়ি চললো না। প্রথমে মাধব দত্ত বলেছিলেন—চালাও পানসি বেলঘরিয়া—

কাশেম বলেছিল—ঘোড়া নড়ছে না হুজুর।

—ঘোড়া না নড়ে তো চাবুক মারো। ফুর্তি তা বলে তো নষ্ট করা যায় না। অনেক মাল-পত্র আছে সঙ্গে। সংসারবাবু, নিতাইবাবু, গৌরীহরবাবু, প্রাণকেষ্ট-বাবু, সবাই আছে।

সংসারবাবু বললে—বাতাসী বসে থাকবে স্যার হা-পিত্যেস করে।

গৌরীহরবাবু বললে—আহা, কর্তাবাবুর শোকে বেচারী কেঁদে ভাসাবে।

প্রাণকেষ্টবাবু বললে—এই এত মালও কোনও কাজে লাগবে না—সব পয়মাল হবে হুজুর!

মাধব দত্ত আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন আদালত কোথায় গেল?

আদালতও গাড়ির ছাদে ভিজছিল বসে বসে। নেমে এসে হাতজোড় করে বললে—হুজুর, ডাকছিলেন আমাকে?

BanglaBook.org

মাধব দত্ত বললেন—কাশেমকে বল, ঘোড়া যদি নিয়ে যেতে না পারে তো কাশেমকে চাবুক মেরে আমি ন্যাংটো করে ছাড়বো—

কাশেম অপারগ হয়ে শেষ পর্যন্ত জলের মধ্যেই গাড়ি চালালো। যেন পুকুর। পুকুরের মধ্যেই নাকানি-চোবানি খেয়ে ঘোড়া বিগড়ে যাবার কথা। কিন্তু কাশেমের চাবুকের চোটে তারাও প্রাণ দিয়ে টানতে লাগলো। খাস বিলিতি ঘোড়া। অস্ট্রেলিয়ার বংশোদ্ভব। জন্ম সেদেশে, কর্ম ইণ্ডিয়ায়। কপালে তার অনেক দুঃখ আছে নিশ্চয়ই। নইলে এত দেশ থাকতে ইণ্ডিয়ায় মাধব দত্তর আস্তাবলে এসে জাত খোয়াতে হবে কেন? আর এমন রোজ রোজ নাইট-ডিউটিই বা করতে হবে কেন?

সংসারবাবু বললে—এও আমাদের একরকম নৌকাবিহার হচ্ছে স্যার—

মাধব দত্ত বললেন—তুমিও বড় বেরসিক হচ্ছ চাটুজ্যে, সীতাপতির মত বেরসিক হয়ে যাচ্ছ দিন-দিন—

—কেন হুজুর? আমি কী করলাম? আমি তো রোজ আপনার সঙ্গে নাইট-ডিউটি দিচ্ছি!

—আরে, নৌকাবিহার অমনি হলেই হলো? ষোড়শ গোপিনী কোথায়? শ্রীরাধে কোথায় হে?

তা বটে! মাধব দত্তর কথায় সবাই সায় দিলে। কর্তাবাবুর বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। কথাটা কারোর মনেই উদয় হয়নি।

কিন্তু জল ক্রমেই বাড়ছে। জল এসে ঢুকলো একেবারে গাড়ির ভেতরে। দরজার ফুটো দিয়ে জল ঢুকতে লাগলো।

মাধব দত্ত চিৎকার করে উঠলেন—থামা, থামা বেটা—কাশেমের যদি একটু বুদ্ধি থাকে—বেটা বুদ্ধির বেস্পতি—

শেষকালে সেই কাশেমেরই হেনস্থা। গাল-মন্দ খাবার যা খেলে। মাথা পেতে সহ্য করলে সব। বললে—হুজুর, গোস্তাকি মাফ করুন—

—বেটা, তোকে চাবুক মারলে তবে গায়ের ঝাল মেটে আমার!

তারপর আপসোস করে বলতে লাগলেন—এমন রাতটা মাটি করে দিলে বেটা!

সত্যিই রাতটা মাটি হয়ে গেল মাধব দত্তর। সংসারবাবু, নিতাইবাবু, গৌরী-হরবাবু, প্রাণকেষ্টবাবু সবাই আবার বাড়ি ফিরে এল। আবার আসরে গোল হয়ে বসলো সবাই। আবার আদালত আলী তামাক দিয়ে গেল।

মাধব দত্ত ক্ষেপে গেলেন। বললেন—আবার তামাক দিচ্ছিস্ কেন বেটা—

আদালত আলী থতমত খেয়ে গেল।

মাধব দত্ত বললেন—দেখছ হে চাটুজ্যে, বেটার বুদ্ধি দেখেছ, বেটা গোড়া কেটে আগায় জল দিচ্ছে—বলি বিছানা কর—

আদালত আলী আসরের মধ্যেই মাধব দত্তর বিছানা করেছিল। মাধব দত্ত রাগের মাথায় এক থাপ্পড় মারলেন। বললেন—এখানে শোব আমি! এখানে কখনও শুয়েছি বেটা যে, এখানে বিছানা করছিস তুই?

শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো।

ভেতরে খবর পেল। কর্তাবাবু ভেতরে শোবেন। এমন ঘটনা কেউ কখনও শোনেনি। সবাই তাজ্জব হয়ে গেল কর্তাবাবুর বিপরীত কাণ্ড দেখে।

বউরাণীর ঘরেই বিছানা করলে সৌরভী। আবার ফরসা চাদর বেরোল, ফরসা বালিশের ওয়াড়, পাশ-বালিশ, গাল-বালিশ, তাকিয়া তোশক পিকদানী। আর মাল? আদালত আলী মাল-পত্রও নিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে এল সৌরভীর

BanglaBook.org

হাতে। আদালত আলীর অন্দর-মহলে যাবার এক্তিয়ার নেই। হঠাৎ যদি রাত্রে মাধব দত্তর ঘুম ভেঙে যায় তো ওগুলো মুখের কাছে এগিয়ে দিতে হবে। তামাক গড়গড়া তৈরি রাখতে হবে। পিকদানীটা মাথার নীচে খাটের তলায় রাখতে হবে। আরো নানান রকম নিয়ম-কানুন আদালত আলী বুঝিয়ে দিলে সৌরভীকে।

শেষে মাধব দত্ত আসর থেকে গা তুললেন।

পরের দিন যথারীতি আবার আসর বসলো। অ্যাটর্নী নরহরিবাবু আবার কাগজপত্র নিয়ে এলেন। উকিল হেমদাবাবুও এলেন নথি-পত্র নিয়ে। সংসার-বাবু, গৌরীবাবু, নিতাইবাবু, প্রাণকেষ্টবাবুরা কেউ আর নিজের নিজের বাড়ি যেতে পারেনি রাত্রে। তারাও আসর জাঁকিয়ে বসল। যারা প্রার্থী তারাও বসেছিল নিয়মিত হা-পিত্যেশ করে। মাধব দত্ত পুজো সেরে এসে বসলেন। অ্যাটর্নী নর-হরিবাবু এগিয়ে যাচ্ছিলেন, উকিল হেমদাকান্তবাবুও সুযোগের জন্যে দাঁড়িয়ে উঠলেন। কিন্তু মাধব দত্ত কোন দিকেই চাইলেন না। সোজা এসে তাকিয়া হেলান দিয়ে শুয়ে পড়েই বললেন—কই হে, সীতাপতিকে দেখছি না!

—এই যে কর্তাবাবু আমি!

—তুমি এসেছ?

সীতাপতিবাবু বললে—আমি তো অনেকক্ষণ এসেছি কর্তাবাবু—

—তুমি বেঁচে আছ তাহলে?

তার মানে! কথাটার অর্থ কেউ বুঝতে পারলে না।

মাধব দত্ত হাসতে লাগলেন।

বললেন—তোমার নাকে হাত দিয়ে দেখ তো নিঃশ্বাস পড়ছে কি না?

মাধব দত্তর রসিকতায় সবাই হেসে উঠলো।

মাধব দত্ত আবার বললেন—তোমার মুণ্ডুটা ধড়ের ওপর আছে তো ঠিক?

এবারও সবাই হেসে উঠলো। সবাই সীতাপতিবাবুর দিকে চেয়েই হেসে উঠলো।

সংসারবাবু বললে—কেন স্যার, ও-কথা বলছেন কেন?

মাধব দত্ত বললেন—আরে শোন তবে, কী কাণ্ড,—কাল রাত্তিরে তো ভেতর-বাড়িতে শুতে গেছি—গিয়ে দেখি আমার শোবার ঘরে খাটের তলায় সীতাপতির চটিজোড়া—

—সে কী স্যার?

সত্যিই সবার তাজ্জব হবার কথা। কর্তাবাবুর শোবার ঘরের খাটের তলায় সীতাপতিবাবুর চটি!

মাধব দত্ত বললেন—হ্যাঁ, আমি দেখেই চিনতে পারলুম, এ সীতাপতির চটি ছাড়া আর কারোর নয়, চীনে-বাড়ির ডি-সিন মার্কা চটি—

—তারপর?

মাধব দত্ত বললেন—তারপর আর কী! মনে মনে হাসলুম, ভাবলুম লোকটা হয় পাগল, নয়তো মাথা-খারাপ! নইলে বেড়ালে ঘর থেকে চটিজোড়া মুখে করে ভেতর-বাড়িতে নিয়ে গেল, আর এমন মানুষ যে টেরই পেলে না—

বলে মাধব দত্ত যত হাসেন, দলবলও তত হাসে।

সত্যিই হাসবার মত ঘটনাই বটে! বাড়িময় বেড়ালের দল আছে। বেড়াল-বংশ একেবারে। সেই বংশে ডাল-পালায় বেড়ে বেড়ে সারা বাড়ি অধিকার করেছে। রাত্রেই তাদের প্রতিপত্তিটা বাড়ে, তাদেরই ক'জন আস্তাবল বাড়ির নীচের ঘর

BanglaBook.org

থেকে সীতাপতিবাবুর চটিজোড়া মুখে করে একেবারে ভেতর-বাড়িতে নিয়ে গেছে —তা টেরই পেলে না সীতাপতিবাবু, এমন বেহেড্ মানুষ তোমরা কেউ কোথাও দেখেছ?

—তাই পুজো করতে করতেই ভাবছিলাম যে দেখা হলেই জিজ্ঞেস করবো—সীতাপতি, তোমার মুণ্ডুটা ধড়ের ওপরে আছে তো ঠিক?

সীতাপতিবাবু বললে—আজ্ঞে, দরজা খুলেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কি না!

মাধব দত্ত হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন—এত ঘুম এই বয়সে ভাল নয় হে সীতাপতি, কোনদিন তোমাকেই দেখো বেড়ালরা ভাগাড়ে টেনে নিয়ে যাবে।

তা সেই বছরেই বৃন্দাবন দত্তর জন্ম হলো। মাধব দত্তর একমাত্র সন্তান। দত্ত-বাড়ির কুলতিলক।

মনে আছে সীতাপতিবাবু খুব বকেছিল সৌরভীকে।

বলেছিল—আর একটু হলেই যে ধরা পড়ে যেতাম কর্তাবাবুর কাছে—

—তা আমি কী করবো! আমার কি তখন খেয়াল আছে?

—তা তুই তো আমাকে জুতোর কথা মনে করিয়ে দিবি? আমি তখন কর্তা-বাবু এসেছে শুনেই তাড়াতাড়ি চলে আসছি অন্ধকারের মধ্যে!

—তা আমারই কি তখন মাথার ঠিক আছে বাবু?

সীতাপতিবাবু বললে—তুই যদি তখন বুদ্ধি করে চটিজোড়া কোথাও লুকিয়ে ফেলতিস্ রে!

তা যাক, শেষ পর্যন্ত যে বেড়ালের ওপর দিয়ে ফাঁড়াটা কেটে গেল, এইটেই বাঁচোয়া। তার পর থেকে বরাবর সাবধান হয়েছে সৌরভী, সাবধান হয়েছে সীতা-পতিবাবু। মাধব দত্ত আবার সদলবলে বাইরে রাত কাটিয়েছেন। অ্যাটর্নী নর-হরিবাবু কাগজ-পত্র নিয়ে এসেছেন, উকিল হেমদাকান্তবাবুও নথি-পত্র নিয়ে সই করিয়ে নিয়ে গেছেন। কোথাও কোন ব্যতিক্রম হয়নি, বিরোধ হয়নি। ফড়েপুকুরের দত্তবাড়ির জীবনধারা অনাহত-অব্যাহত গতিতে চলেছে।

সেই বৃন্দাবন দত্তর অন্নপ্রাশন হয়েছে, হাতে-খড়ি হয়েছে। সেই বৃন্দাবন দত্ত বড়ও হয়েছে একদিন। সেই মাধব দত্তও একদিন বুড়ো হয়েছেন। সংসারবাবু, গৌরীহরবাবু, নিতাইবাবু, প্রাণকেষ্টবাবুও বুড়ো হয়েছেন। শুধু কি তাই? জোয়ান সৌরভীও বুড়ি হয়েছে, জোয়ান সরলাও বুড়ি হয়েছে একদিন। তখন আর তেমন ঝগড়া হয় না রান্নাবাড়িতে। সৌরভীর কোমরে বাতের ব্যথা হয়েছে। তেল মালিশ করে নিজে নিজেই। বলে—ভগবান নিলেই বাঁচি মা—

সরলা বলে—কালে কালে কত দেখবো মা, দেখে দেখে চোখে ছানি পড়লো—

বনমালী আর আগেকার মতন ডাকতে আসে না। খাতির করে না। আগের মতন বারোটা একটা দুটো বেজে যায়, বেলা পড়ে আসে। সীতাপতিবাবু হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে। বনমালীর আসার পথের দিকে চেয়ে বসে থাকে। ক্ষিধেয় পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে যাবার যোগাড়।

তারপর আর সহ্য করতে পারে না। চটিটা পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে আসে।

বলে—অ কাশেম মিয়া, তোমাদের খাওয়া হলো?

—জী হাঁ, হলো।

—দেখ তো, তোমরা কেমন খেয়ে-দেয়ে জিরোচ্ছ, আর আমার এখনও খাওয়াই হলো না। খেতে ডাকতেই এল না এখনও—

কাশেম এর উত্তরে কিছু বলে না—

সীতাপতিবাবু বলে—কী যে হলো দত্তবাড়ির বুঝতে পারি না, আমারও

BanglaBook.org

যেমন দৈন্য-দশা হয়েছে—

সত্যিই কী হলো দত্তবাড়ির! কেমন করে কী যে সব হলো! যেন ম্যাজিক! ম্যাজিকের মত সব হাওয়ায় উড়ে গেল। সেই বৃন্দাবন দত্ত যেবার জন্মালো সে-রাত্রেই কলকাতায় ঝড় হয়েছিল খুব। দত্তবাড়ির বাগানে এক কোণে একটা শিরীশ গাছ ছিল, সেটাও পড়ে গিয়েছিল। তারপর সেই ছেলেরই বা কী আদর! কী আদিখ্যেতা! ছেলে নয়তো যেন মাধব দত্তর প্রাণ! রোজকার আসরে এসেই মাধব দত্ত বলতেন—খোকাকে আন্ আদালত—

আদালত আলী তামাকও এনে দিত। খোকাকেও এনে দিত।

যেমন ফুটফুটে চেহারা, তেমনি স্বাস্থ্য। দেখলেই কোলে নিতে ইচ্ছে করতো।

মাধব দত্ত বলতেন—এই বয়সেই খুব বুদ্ধি, জানলে চাটুজ্যে—

সংসারবাবু বলতো—আপনারই তো বংশধর, বুদ্ধি হবে না?

মাধব দত্ত বলতেন—এই বয়সেই 'বাবা' বলতে শিখেছে হে—

গৌরীহরবাবু বলতো—বাপকো বেটা সেপাইকা ঘোড়া—এ ছেলে আপনার নাম রাখবে স্যার, দেখে নেবেন—

প্রাণকেষ্টবাবু বলতো—নামটাও চমৎকার রেখেছেন কর্তাবাবু, ত্রেতাযুগে বৃন্দাবনই ছিল শ্রীমাধবের লীলাভূমি—

—কই, তুমি কিছু বলছো না যে সীতাপতিবাবু?

সীতাপতিবাবু বলতো—আজ্ঞে, আমি আর কী বলবো?

সংসারবাবু বলতো—আজ্ঞে, সীতাপতিবাবু আর কীই বা বলবে। সীতাপতি-বাবুর মাগও নেই, বেটাও নেই, বেটার মর্ম সীতাপতিবাবু কী বুঝবে?

মাধব দত্ত বলতেন—তা বটে, চাটুয্যে বলেছে ঠিক, নিজের বেটা না থাকলে পরের বেটার মর্ম বুঝতে পারে না লোকে।

বৃন্দাবন তখন মাধব দত্তর কোলে উঠে গড়গড়ার নল ধরে টানাটানি আরম্ভ করে দিয়েছে। মাধব দত্ত গড়গড়ার নলটা ছেলের মুখে পুরে দিয়ে বললেন—টান বেটা, টান, টেনে দ্যাখ, মজাটা টের পাবি—

ছোট ছেলে। নলের এঁটো মুখটা জিভ দিয়ে চুষতে লাগলো।

মাধব দত্ত ছেলের নল-চোষা দেখে হেসে গড়িয়ে পড়লেন।

বললেন—দেখছ চাটুয্যে, দ্যাখো দ্যাখো, ছেলের তামাক খাওয়ার বহরটা দ্যাখো, বেটা তামাক-খোর হবে হে—

সবাই দেখতে লাগলো। সংসারবাবু, নিতাইবাবু, গৌরীহরবাবু, প্রাণকেষ্টবাবু, সবাই তারিফ করতে লাগলো।

সবাই বললে—বাহাদুর বেটা হয়েছে আপনার স্যার—বাপের সব গুণ পেয়েছে আজ্ঞে—

সীতাপতিবাবু এক কোণে এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। ব্যাপারটা দেখে কেমন যেন মুখটা ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল।

বললে—অমন আদর করবেন না কর্তাবাবু, ওতে ছোটবেলা থেকে ছেলের স্বভাব খারাপ হয়ে যায়।

মাধব দত্ত হঠাৎ সীতাপতিবাবুর দিকে ফিরলেন।

বললেন— তুমি ছাই বোঝ, শোন হে চাটুয্যে, সীতাপতির কথা শোন—বলে তামাক খাওয়ালে ছেলের স্বভাব খারাপ হয়ে যাবে—তাহলে আমি তো ছোটবেলা থেকেই তামাক খাচ্চি, আমিও কবে খারাপ হয়ে যেতুম।

সংসারবাবু হেসে গড়িয়ে পড়লো। নিতাইবাবুও হাসতে লাগলো। গৌরী-

BanglaBook.org

হরবাবু প্রাণকেষ্টবাবু সবাই-ই হাসতে লাগলো প্রাণ খুলে।

সংসারবাবু বললে—আজ্ঞে, সীতাপতিবাবুকে জিজ্ঞেস করুন না স্যার, ওর বউ ক'টা ছেলে বিইয়েছে?

—তা বলছো ভালো, সেই কথায় বলে না—'মাগ নেই বেটা নেই নিধিরামের বাপ', আমাদের সীতাপতির হয়েছে তাই—

বৃন্দাবনের অন্নপ্রাশনের সময় ঘটা করলেন খুব মাধব দত্ত। সানাই বসলো দেউড়ীতে, যাত্রা হলো বাগানে শামিয়ানা খাটিয়ে। সাত পাড়ার লোক বাহবা দিলে ঘটার বহর দেখে। গাড়িতে গাড়িতে ভর্তি হয়ে গেল ফড়েপুকুরের গলিটা। মধুসূদন স্যাকরাই বায়না পেলে গয়নার। গয়নায় গা মুড়ে দেওয়া হলো বৃন্দাবনের। ঝি-চাকর, কাশেম, বনমালী, সৌরভী, সরলা সবাই নতুন নতুন ধুতি-শাড়ি থান পেলে। পুরুতঠাকুর দানে পেলেন ঘড়া-ঘটি-বাটি-বাসন-তৈজস। পেলেন খাট-পালঙ্ গদী তোশক। পরিতুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করে গেলেন বৃন্দাবনকে।

বললেন—তোমার ছেলে তোমারই মতন সচ্চরিত্র, গুণবান, বেদ-ব্রহ্মণে অনুরাগী হোক বাবা—আমি আশীর্বাদ করছি।

দশ ভরির হার হয়েছিল গলার। দশ আঙুলে কুড়িটা আংটি। পায়ে ঝুমকো মল্, কঙ্কন তাগা বালা—কিছুতেই ত্রুটি নেই। গয়নার ভারে মাধব দত্তর ছেলে সেদিন একেবারে নড়তে পারেনি।

আদালত আলী সেদিন ছেলেকে কোলে করে নিয়ে এল একেবারে আসরের মধ্যে।

কে কী দিয়েছে দেখা যাক। কার কী উপহার।

—এই দেখ হে চাটুজ্যে, এটা দিয়েছে বৃন্দাবনের খুড়ো, এটা দিয়েছে বৃন্দাবনের মাসী, আর এটা দিয়েছে বৃন্দাবনের পিসী—আর এটা.....

—ওই বালাজোড়া কে দিয়েছে স্যার?

মাধব দত্ত বললেন—এটা দিয়েছে আমাদের সীতাপতি—

সে কি! সংসারবাবু, নিতাইবাবু, গৌরীহরবাবু, প্রাণকেষ্টবাবুর সকলেরই চক্ষু চড়কগাছ। সীতাপতিবাবু কিনা কর্তাবাবুর ছেলেকে বালা গড়িয়ে দিলে! সকলকে এমন করে টেক্কা দেওয়া! সকলকে এমন করে টেক্কা দিয়ে জিতে যাবে নাকি?

সবাই বললেন—শেষকালে তুমি কিনা বালা দিতে গেলে সীতাপতি? তোমাকে কে দেয় তার ঠিক নেই!

—আজ্ঞে দিলাম, দিলাম!

—আমাদের ওপর টেক্কা দেবার জন্যে দিলে বুঝি?

সীতাপতিবাবু বললে—হাতের সোনার তাবিজটা ছিল, ও আমার কী হবে? তাই সেইটে ভেঙেই বালা দিলাম একটা। কর্তাবাবুর বাড়িতে রয়েছি, কর্তাবাবুর খাচ্ছি, কর্তাবাবুর আশ্রয়ে আশ্রিত—কিছু না দিলে যে খারাপ দেখায়।

তা সেই বৃন্দাবনই আবার বড় হলো। আবার সেই বৃন্দাবনের হাতেখড়ি হলো। মাস্টার এলো লেখা-পড়া শেখাতে। ইস্কুলে ঢুকলো বৃন্দাবন। গাড়ি করে ইস্কুলে যেত বৃন্দাবন। আর ফিরত বিকেলবেলা।

খেতে বসে সীতাপতিবাবু এক-একদিন জিজ্ঞেস করতো—হ্যাঁ গো বনমালী, বৃন্দাবন এত রোগা হয়ে গেছে কেন গো? ভালো করে খেতে দাও না বুঝি?

শেষের দিকে বনমালীর তিরিক্ষী-মেজাজ হয়ে গিয়েছিল। ভালো করে কথার জবাব দিত না। কেমন খিটখিটে স্বভাব হয়েছিল।

BanglaBook.org

কাশেম সকালবেলা গাড়িতে করে ইস্কুলে পৌঁছিয়ে দিত বৃন্দাবনকে।

—ও কাশেম, কাশেম মিয়া? শুনছ ভাই?

—জী হুজুর?

সীতাপতিবাবু বলতো—বেশ সাবধানে গাড়ি চালাবে বাবা, বুঝলে? বেশ সাবধানে দরসা-টরজা এঁটে দিও—ছোট ছেলে তো! বলা তো যায় না, কোন্ দিন হয়ত দরজা খুলে ধপাস করে বাইরে পড়ে গেল।

—না হুজুর, ছোটবাবুকে আমি সামাল করে নিয়ে যাই।

সীতাপতিবাবু বলতো—হ্যাঁ, খুব সাবধান। মানে, ছোট ছেলে বলেই বলছি, একটু ছটফটে স্বভাব কিনা, হয়ত দরজা দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে দেখছে এমন সময় ঝাঁকুনি লাগলো! তখন? কিসে কী হয় কিছু তো বলা যায় না।

—আর দেখ—

তারপর নিজের ঘরে গিয়ে আবার ফিরে আসতো কাশেমের কাছে।

—আর দেখ, বদ ছেলেদের সঙ্গে না মেশে, বুঝলে কাশেম? এই বয়েস থেকে বদ ছেলেদের সঙ্গে মিশলেই একেবারে গোল্লায় যাবে। তুমি একটু নজর রেখো বাবা, বুঝলে? আমরা নিজেরা জানি কি না—

মাধব দত্ত তখনও সেইরকম আসর গুলজার করে বসতেন। তখনও সংসারবাবু আসতো, নিতাইবাবু, গৌরীহরবাবু, প্রাণকেষ্টবাবু আসতো। তখনও আদাজ্বত আলী তামাক নিয়ে আসতো। অ্যাটর্নী নরহরিবাবু কাগজপত্র নিয়ে আসতেন। উকিল হেমদাকান্তবাবু নথি-পত্র নিয়ে আসতেন।

মাধব দত্ত বলতেন—তারপর কী হলো হে চাটুজ্যে?

সংসারবাবু বলতো—আজ্ঞে তারপর কী আর হবে। মেয়েটা বরের ওপর রাগ করে কলাতলার বস্তিতে এসে উঠলো।

—তার মানে?

মাধব দত্ত চমকে উঠলেন ঠিক আগেকার মতন করে। তামাকের নলটা মুখ থেকে নামিয়ে বলতেন—কলাতলার বস্তিতে এসে উঠলো? আর পাড়ার লোক কিছু বললে না?

সংসারবাবু বলতো—আজ্ঞে, কি আর বলবে? মেয়েটা তো ছোট নয়, আঠারো-উনিশ বছরের বাঁজা বউ—

—সর্বনাশ!

মাধব দত্ত লাফিয়ে উঠলেন। আঠারো-উনিশ বছর বয়সের একটা বউ অমনি স্বামী ছেড়ে কলাতলার বস্তিতে গিয়ে উঠবে? আর মাধব দত্ত বেঁচে থাকতে কিনা তাই সহ্য করবেন?

—চলো, চলো, দেখে আসি।

মাধব দত্তর তখন বয়েস হয়েছে। চুল পাকতে শুরু করেছে। অনেক সম্পত্তি হাত-ছাড়া হয়েছে। অনেক মকর্দমায় হেরে গেছেন। তবু সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে দৌড়তেন সন্ধ্যাবেলা আর ফিরতেন রাত কাটিয়ে। ঠিক সেই আগেকার মত। তারপরে আরো কত দুর্যোগ ঘনিয়ে এল ফড়েপুকুরের দত্তবাড়িতে। আরো কত ওলট-পালট হলো। আরো কত বিপর্যয়।

সীতাপতিবাবুও তখন বুড়ো হয়ে গেছেন। বাগানের কামিনী গাছটাও তখন নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। কাশেমেরও বয়স হয়েছে। রাত জাগতে তখন কষ্ট হয়। ঘোড়া দুটোরও তখন আর তেমন তেজ নেই। তেমন করে টগবগ করে জোর-

BanglaBook.org

কদমে চলতে পারে না।

মাধব দত্ত বলেন—চাবুক মার্ না কাশেম, চাবুক মারতে পারিস না? চাবুকের কাছে সব বেটা জব্দ—

কাশেম চাবুক মারতে গিয়েও থেমে যায়। একটু আস্তে মারে। জানোয়ার হলেও জীব তো। তারও তো জান্ আছে। তারও তো খেয়াল-খুশি আছে। তারও তো মান-অভিমান আছে। কথা বলতে পারে না বলে তারা কি কিছু বোঝে না!

আস্তাবল-বাড়িতে ফিরে এসে কাশেম ঘোড়া-দুটোর তরিবৎ করে ভালো করে। পিঠটা মেজে দেয়, পা দুটো ডলে দেয়, মুখের ওপর হাত বুলোয়। যেন সন্ধ্যা-বেলা চাবুক মারার খেসারৎ দেয় দিনের বেলায় আদর করে।

মুখের কাছে মুখ এনে বলে—কেয়া রে? কেয়া হুয়া তেরা?

কাশেম বুঝতে পারে। ঘোড়ার রাগ হলে কাশেম বুঝতে পারে।

সীতাপতিবাবু সব শোনে। নিজের ঘরটায় শুয়ে শুয়ে সব শুনতে পায়। তারপর ওঠে আস্তে আস্তে। বাইরে এসে বলে—কার সঙ্গে কথা বলছিলে কাশেম? ঘোড়ার সঙ্গে?

কাশেম মাথা নীচু করে বলে—জী হাঁ—

—তা ঘোড়ার সঙ্গে কথা বলে লাভ কী কাশেম?

—হুজুর, ও সব বুঝতে পারে, মানুষের বাত্‌ভি বুঝতে পারে, মানুষের মহব্বতভি বুঝতে পারে, শুধু কথাই বলতে পারে না।

সীতাপতিবাবু হাসে। অবলা জীবও বুঝতে পারে। অথচ মাধব দত্ত বুঝতে পারেন না।

কাশেম বলে—ঘোড়াটার একটা তসবীর তুলে দেবেন হুজুর, আপনার তো যন্তর আছে, কবে মরে যাবে তাই বলছি—

সীতাপতিবাবু বললে—আমি কী করে তুলবো কাশেম, যন্তর তো নেই আমার, ক্যামেরা তো আমি বেচে দিয়েছি—

—সে কি হুজুর! বেচলেন কেন?

সীতাপতিবাবু সে-কথার উত্তর দেয় না। এড়িয়ে চলে যায়। বাগানটায় একবার পায়চারি করে। তারপর কর্তাবাবুর আসরের পাশে উঁকি দিয়ে দেখে। বৃন্দাবন পড়ছে—আর মাস্টার পাশে বসে।

সীতাপতিবাবু একেবারে ভেতরে ঢুকে যায়।

বলে, খোকা কেমন পড়াশুনো করছে মাস্টার?

মাস্টার বলে—ভালোই তো পড়ছে—

—একটু মন দিয়ে পড়াবে মাস্টার, একটু যত্ন নিয়ে পড়াবে—বুঝলে?

মাস্টার বলে—আজ্ঞে, আমি তো মন দিয়েই পড়াই—

—হ্যাঁ, তাই পড়াবে মাস্টার। বৃন্দাবনের মাথাটা ভালো, বুঝলে মাস্টার, খুব বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে, তবে ছেলেমানুষ তো, তাই বলছি তোমায়—

এইটুকুই শুধু বলেছিল সীতাপতিবাবু। এর বেশি আর কিছু নয়।

কিন্তু পরদিনই মাধব দত্ত ডেকে পাঠালেন। মাধব দত্ত তখন আসরে এসে বসে পড়েছেন। সীতাপতিবাবু তাড়াতাড়ি গিয়ে বললে—আমাকে ডেকেছিলেন কর্তাবাবু?

মাধব দত্ত তামাকের নলটা মুখ থেকে নামিয়ে বললেন—তোমার কী মতলব শুনি সীতাপতি? কী মতলব তোমার?

—আজ্ঞে, কিসের কী মতলব?

BanglaBook.org

—বলি, বৃন্দাবন তোমার ছেলে, না, আমার ছেলে? তুমি কোন্ এক্তিয়ারে কথা বলতে যাও শুনি? তুমি কে?

—আজ্ঞে, আমি কী করেছি?

মাধব দত্ত বললেন—বৃন্দাবন পড়ে কি না-পড়ে তাতে তোমার কী? তুমি মাস্টারকে যত্ন করে পড়াতে বলবার কে বলো তো? মাস্টারের মাইনে তুমি দাও না আমি দিই? টাকা যদি নষ্টই হয় তো কার টাকা নষ্ট হবে—তোমার না আমার? তুমি কেন বৃন্দাবনের ব্যাপারে ফোড়ন কাটতে আসো? তুমি এখানে থাকতে পাচ্ছো, খেতে পাচ্ছো—এই যথেষ্ট। যদি এখানে থাকতে চাও তো মুখ বুজে পড়ে থাকবে, বুঝলে?—যাও এখন—

এর পর থেকে আর সীতাপতিবাবু কর্তাবাবুর আসরেও যেত না। মাধব দত্তও আর ডেকে পাঠাতেন না।

এক-একদিন কেউ খবর নিলে মাধব দত্ত বলতেন—আছে বোধ হয় কোথাও—বেঁচে আছে নিশ্চয়ই—মরে গেলে খবরটা পেতাম—

কথাটা শুনে সংসারবাবু হাসতো। নিতাইবাবু, গৌরীবাবু, প্রাণকেষ্টবাবু,—সবাই হেসে উঠতো কর্তাবাবুর রসিকতায়।

তারপর সীতাপতিবাবুর একদিন আরো বয়স হলো। আরো মাথার চুল পাকলো।

বাড়ির বউরাণী একদিন গত হলেন। দত্ত-বাড়ির গৃহিণী। কোথায় কোন্ কোণে তিনি থাকতেন, পৃথিবীর কোনও লোকের তা জানা ছিল না। এক জানতো সৌরভী, সরলা, এই রকম কয়েকজন ঝি। সেই তারাও আর তখন নেই। সেই ঝিলিমিলির আড়ালে কাউকে আর তখন আলতা পরাতে হবে না। চুল আঁচড়ে খোঁপা বেঁধে দিতে হবে না। গা-কোমর-পা টিপে দিতে হবে না। মাধব দত্ত সেদিন খুব শোক পেয়েছিলেন। সীতাপতিবাবুর মনে আছে সেদিন মাধব দত্ত বাড়িতেই রাত কাটিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল সংসারবাবু, নিতাইবাবু, গৌরীহরবাবু আর প্রাণকেষ্টবাবু।

মাধব দত্ত বলেছিলেন—খুব কষ্ট হচ্ছে হে—

সংসারবাবু বলেছিল—আজ্ঞে কষ্ট তো হবেই, স্ত্রী হলো গিয়ে সহধর্মিণী শাস্ত্রে স্ত্রীকে তাই অর্ধাঙ্গিনী বলেছে—

গৌরীহরবাবু বলেছিল—তিনি ছিলেন সৌভাগ্যবতী কর্তাবাবু, তাই এমন করে সিঁথির সিঁদুর নিয়ে যেতে পেরেছেন। এমন যাওয়া ক'জন যেতে পারে বলুন? তিনি যে সতীলক্ষ্মী মা ছিলেন আমাদের—

মাধব দত্ত বলেছিলেন—আদালত, আর একটু ঢাল তো—খুব কষ্ট হচ্ছে—

কিন্তু তখনও কি জানতেন তিনি যে, তার চেয়েও বড় শোক তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছে। তার চেয়েও বড় বিপর্যয়। বিপর্যয়ের যেন ঝড় বয়ে গেল দত্তবাড়িতে। সেই ফড়েপুকুরের দত্তবাড়িটা যেন বিপর্যয়ের ধাক্কায় কাৎ হয়ে পড়লো। সেই বোলবোলা গেল, সেই সংসারবাবু, নিতাইবাবু, গৌরীহরবাবু, প্রাণকেষ্টবাবু সবাই শেষ পর্যন্ত বিদায় নিয়েছিল। এমন কি সীতাপতিবাবুকেও যে দত্তবাড়ির আশ্রয় থেকে শেষ পর্যন্ত বিদায় নিতে হবে তাই-বা কে ভেবেছিল।

মাধব দত্ত একদিন তেড়ে-মেড়ে আসর ছেড়ে উঠলেন।

আদালত আলী শেষ পর্যন্ত ছিল মাধব দত্তর সঙ্গে। কর্তাবাবুর ব্যাপার দেখে সে-ও অবাক হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

মাধব দত্ত চটিটা পায়ে দিয়ে বাইরের বাগানে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বললেন—সীতাপতি—সীতাপতি কোথায়?

সীতাপতিবাবু যথারীতি আস্তাবল-বাড়ির নীচের ঘরে চিৎপাত হয়ে শুয়ে ছিল। কোনও কাজ-কর্ম নেই, সুতরাং শুয়ে থাকা ছাড়া আর গতি কী!

হঠাৎ কর্তাবাবুর ডাক শুনে সীতাপতিবাবু উঠে বসলো। চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে বাইরে যাবার চেষ্টা করতেই একেবারে ঘরের দোরগোড়ায় এসে হাজির হয়েছেন মাধব দত্ত নিজে।

সীতাপতিবাবু থতমত খেয়ে বললে—আমাকে ডাকছিলেন কর্তাবাবু?

মাধব দত্ত বললেন—তুমি এখুনি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও—

—আজ্ঞে—

—না, আর কোনও কথা শুনছি না তোমার। বৃন্দাবন মদ খাক না-খাক, তাতে তোমার অত মাথাব্যথা কেন শুনি? তোমার টাকায় মদ খায় সে? তোমার টাকায় বাবুয়ানি করে?

—কিন্তু কর্তাবাবু, আমি তো সে-জন্যে তাকে কিছু বলিনি?

—বলোনি তো কথাটা আমার কানে এল কী করে? আমার ছেলে গোল্লায় যাক, জাহান্নমে যাক, তাতে তুমি কথা বলবার কে? বেরিয়ে যাও তুমি আমার বাড়ি থেকে, বেরিয়ে যাও—

—আজ্ঞে...

আদালত আলীকে দিয়ে বোধ হয় গলা-ধাক্কা দেবার ব্যবস্থাই করছিলেন মাধব দত্ত। কিন্তু তার আগেই সীতাপতিবাবু সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে গিয়েছিল। সেই চটি পায়ে, একবস্ত্রে। অবশ্য সঙ্গে নিয়ে যাবার মত আর কিছু ছিলও না তখন তার। একটা দামী ক্যামেরা ছিল—তা সেটাও সীতাপতিবাবু কয়েক বছর আগে বেচে দিয়েছিল মধুসূদন স্যাকরার কাছে। সুতরাং ফড়েপুকুরের দত্তবাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক সেইদিনই শেষ হয়ে গিয়েছিল। বলতে গেলে চল্লিশ বছরের সেই একটানা সম্পর্ক।

কিন্তু চল্লিশ বছর পরে আবার যে সেই সীতাপতিবাবুর খোঁজ পড়বে তা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

চারদিকে খোঁজ পড়লো—কোথায় সীতাপতিবাবু। চারদিকে লোক ছুটলো সীতাপতিবাবুকে খুঁজতে। একজন গেল হাটখোলা, আর একজন গেল খড়দয়, আর একজন লোক গেল হাতীবাগানের বস্তিতে। কেউ গেল শিবপুর, কেউ হাওড়া, কেউ বাগমারী, দমদম।

সবাই এসে বললে—সীতাপতিবাবুকে পাওয়া গেল না হুজুর—

—পাওয়া গেল না মানে? লোকটা দুনিয়া থেকে উড়ে গেল? উড়ে গেলেই হলো অমনি? লোকটার পাখা গজালো নাকি?

মাধব দত্ত তখন বুড়ো হয়েছেন।

ডাকলেন—আদালত!

আদালত আলী তখনও টিমটিম করছিল। সামনে এসে হাজির হলো। বললে —হুজুর—

মাধব দত্ত জিজ্ঞেস করলেন—সীতাপতিবাবুর পাত্তা জানিস তুই?

—কোন্ সীতাপতিবাবু?

আদালত আলী সীতাপতিবাবুর নামটাও ভুলে গেছে তখন। সে কি আজকের

BanglaBook.org

কথা! আদালতেরও তো বয়স হয়েছে। আদালত আলীও তো চল্লিশ বছর ধরে সারাজীবন মাধব দত্তর সঙ্গে জেগে রাত কাটিয়েছে। কত রাত কত দিন গেছে আদালত। সে-সব কথা তখন আর মনে করতেও পারে না। সেই বরানগর, সেই হাতীবাগান, সেই খড়দ, সেই চন্দননগর। যেখানে হুকুম হয়েছে, সেখানে সঙ্গে গিয়েছে। গেলাস এগিয়ে দিয়েছে, তামাক-গড়গড়া এগিয়ে দিয়েছে। সেই অ্যাটর্নী নরহরিবাবু আসতেন, উকিল হেমদাকান্তবাবু আসতেন, কোথায় গেল তারা। কোথায় গেল সেই সরলা। কাশেম শুধু তখনও আছে। তার আর যাবার জায়গা নেই বলেই আছে। সেই ঘোড়া দুটোও মরে গেল একদিন। এখন ছোটবাবু মটর-গাড়ি কিনেছেন। সেই ঘোড়ার আস্তাবলের মধ্যে বৃন্দাবন দত্তর মটরগাড়ি থাকে এখন। আর কাশেম তার একপাশে শুয়ে থাকে। মটরগাড়ির ড্রাইভার, ক্লিনার থাকে। তারই পাশেই কাশেমও শুয়ে থাকে। আর সেই সংসারবাবু, সেই নিতাই-বাবু, গৌরীহরবাবু, প্রাণকেষ্টবাবু—নাম কারো মনে নেই। শুধু মনে আছে আদালতের বাবুরা আসতো নিয়ম করে, কর্তাবাবুর সঙ্গে নানান জায়গায় যেতো। আর রাত কাটিয়ে আবার ভোরের দিকে ফিরে আসতো।

মাধব দত্ত আবার জিজ্ঞেস করলেন—মনে নেই তোর, সেই আস্তাবল-বাড়ির নীচের ঘরে থাকতো আর খেতো এখানে?

মনে পড়লো আদালতের।

বললে—মনে পড়েছে হুজুর—

সত্যিই মনে পড়েছে। শেষকালে কী একটা রোগ হয়েছিল সেই বাবুর। দিন-রাত ক্ষিদে পেত কেবল। দিন-রাত খাই খাই করতো। বনমালীকে খোশামোদ করতো ভাতের জন্যে। সকাল এগারোটা না বাজতেই কেবল তাগিদ। বনমালীকে বলতো—হ্যাঁ রে ভাত দিবি নে? বেলা পড়ে গেল যে রে—পেটের নাড়িভুঁড়ি শুকিয়ে গেল যে—

শেষকালে সেই খাওয়া নিয়েই কত হেনস্থা!

তা তখনও কিছু বলেননি মাধব দত্ত। অমন কত লোক বাড়িতে খাচ্ছে, কে তার হিসেব রাখে! খাক্ না! খেলে তো কারোর কিছু ক্ষতি হচ্ছে না আর। যত ইচ্ছে খাক, লোকটার কেউ নেই সংসারে, মাথাটাও একটু খারাপ হয়ে গেছে হয়ত। আত্মীয়-স্বজন সবাই ত্যাগ করেছে তাকে। তাই দয়া করেই একদিন আশ্রয় দিয়ে-ছিলেন মাধব দত্ত।

বনমালী একদিন বলেছিল কর্তাবাবুকে।

বলেছিল—বড্ড খাই খাই করে সীতাপতিবাবু, সব ভাত খেয়ে ফেলে—ভাতে কুলিয়ে উঠতে পারি না আজ্ঞে—

—তার মানে?

বনমালী বলে—আজ্ঞে, ভাত খেয়ে উঠেই তখনি আবার বলে—ক্ষিদে পেয়েছে। এক-একদিন হাঁড়ির সব ভাত শেষ করে ফেলে আজ্ঞে, আবার রাঁধতে হয় তখন। খেয়ে তখন আর নড়তে পারে না কর্তাবাবু,—খেয়ে-দেয়ে রোয়াকের ওপরই চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে।

মাধব দত্ত বলেছিলেন—ও একরকম রোগ রে, ও রোগ বড় কঠিন রোগ, কিছু বলিসনি তোরা যেন ওকে।

বনমালী শেষকালে কিছু আর বলতো না। খাওয়া দেখতো আর হাসতো।

মাধব দত্ত বলতেন—খুব বনেদী বংশের ছেলে রে, খুব গুণী লোক, ভাল ছবি তুলতে পারে। নেহাৎ ফাঁপরে পড়েছে তাই এখানে এসে উঠেছে, নইলে ওর

BanglaBook.org

কি এখানে থাকা পোষায়!

শেষ পর্যন্ত এমনি অনেক অভিযোগ অনেক অনুযোগ সহ্য করেছিলেন মাধব দত্ত। কিন্তু শেষে আর পারলেন না। বৃন্দাবন কী করে না-করে, কোথায় যায়, কার সঙ্গে মেশে না-মেশে, তাই নিয়ে বড় মাথা ঘামাতো। তোমার অত দরকার কী? তুমি খেতে পাচ্ছো, থাকতে পাচ্ছো, তোমার সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কী? শেষে যেদিন বৃন্দাবনের মদ খাওয়া নিয়ে কথা বলতে শুনলেন, সেদিন আর মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না। সোজা ঘাড় ধরে বার করে দিয়েছিলেন বাড়ি থেকে।

বলেছিলেন—বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে—বৃন্দাবন মদ খেলো কি না-খেলো তাতে তোমার মাথা ঘামানোর দরকার কী? আমার ছেলে বৃন্দাবন, আমি তার বাপ, আমি তার ভাল-মন্দ বুঝবো—কিন্তু তুমি কে হে?

সেদিনই সীতাপতিবাবু দত্তবাড়ি ছেড়ে সেই যে চলে গিয়েছিল, আর আসে নি। আর তার খোঁজখবর নেবারও দরকার বোধ করেনি কেউ। আর তারও কোন প্রয়োজন হয়নি এ-বাড়িতে আসবার।

তা এতদিন পরে যে আবার সীতাপতিবাবুর খোঁজ পড়লো, তারও একটা কারণ আছে।

কারণটা উদয় হলো বৃন্দাবন দত্তর বিয়ের দিন। দত্তবাড়ির একমাত্র কুল-তিলক বৃন্দাবন দত্ত। বিয়ের জাঁকজমক, যা দত্তবাড়ির বৈশিষ্ট্য, তার আয়োজন হয়েছে। লোকজন আত্মীয়স্বজনে ভরে গেছে বাড়ি। ছাদে ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। মিষ্টি, দই, গয়নার অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। বাড়ি-বাড়ি নেমন্তন্নর চিঠি বিলি হয়ে গেছে।

এমন সময় মধুসূদন স্যাকরাই গোল বাধালো।

আসরে মাধব দত্ত তখন একলাই বসে ছিলেন।

মধুসূদন স্যাকরা এসে প্রণাম করলে।

মাধব দত্ত জিজ্ঞেস করলেন—কী মধুসূদন? কাজ হলো?

—আজ্ঞে, একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে—

মাধব দত্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। বললেন—কী কথা? টাকা? কাজ শেষ হলে টাকা তুমি পাবেই, দত্তবাড়ির টাকা তোমার মারা যাবে না, জেনে রেখো।

মধুসূদন জিভ কাটলে দাঁত দিয়ে। বললে—ছি-ছি হুজুর, অমন কথা কি আমি বলতে পারি? অমন কথা বললে আমার জিভ খসে যাবে না? আমি অন্য কথা বলতে এসেছি হুজুর।

বলে পকেট থেকে বেগুনি-কাগজে মোড়া একটা হার বার করলে। মোটা বিশ ভরি ওজনের সোনার শেতল-পাটি হার। বউরাণীর গলার জিনিস। আরো অনেক গয়নার সঙ্গে সেটাও মধুসূদনকে দেওয়া হয়েছিল। সেই সব পুরোনো গয়না ভেঙে বৃন্দাবনের বউ-এর জন্যে নতুন গয়না গড়ে দেবার বায়না দেওয়া হয়েছিল।

মধুসূদন মুখ নীচু করে বললে—বউরাণীর এই হারের লকেটটা গলাতে গিয়ে ভেতরে একটা ছবি পেয়েছি হুজুর—

—ছবি?

মাধব দত্ত সোজা হয়ে বসলেন। বললেন—লকেটের মধ্যে ছবি? কার ছবি? কিসের ছবি?

—এই দেখুন হুজুর!

আশ্চর্য! মধুসূদন স্যাকরা ছবিটা বার করে দেখালে। ছোট ছবি। পাকা

BanglaBook.org

হাতের ফোটো তোলা। মাধব দত্ত ভালো করে চেয়ে দেখলেন। সীতাপতিবাবুর! হুবহু সীতাপতির ছোকরা বয়সের ছবি একখানা। এ ছবি এখানে কী করে এলো? বউরাণীর গলার হার। তিনি মারা যাবার পর এ-গয়না তো আর কারো হাতে যায়নি! এর লকেটের মধ্যে সীতাপতির ছবি এল কী করে?

মাধব দত্ত কিছুতেই মনে করতে পারলেন না।

—এ হার তো তোমারই তৈরী মধুসূদন!

মধুসূদন বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মাধব দত্ত আবার জিজ্ঞেস করলেন—এ হার তুমি কবে তৈরি করেছ, তা তোমার মনে আছে?

—আজ্ঞে, অতদিনের কথা কি মনে থাকে?

মধুসূদন আবার বললে—কিন্তু হুজুর, এ হার তো আমাকে সীতাপতিবাবু তৈরি করতে দিয়েছিলেন।

—সীতাপতিবাবু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর কাছে তখন টাকা ছিল না, নিজের ক্যামেরা যন্ত্রটা বেচে দিয়ে এই হার গড়তে দিয়েছিলেন—

মাধব দত্ত লাফিয়ে উঠলেন যেন।

বললেন—সীতাপতি কার জন্যে হার তৈরি করেছিল? তোমায় বলেছিল কিছু?

মধুসূদন বললে—না হুজুর, তা বলেননি—শুধু বলেছিলেন ওই ক্যামেরা-বেচা টাকা দিয়ে এই হারটা গড়িয়ে দিতে!

—এর ভিতরের ছবিটা তুমি পুরে দাওনি?

—আজ্ঞে না, এ বোধহয় অন্য কোন স্যাকরাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলেন—

—তুমি একবার জিজ্ঞেসও করোনি, কার জন্যে এই হার গড়াচ্ছে?

মধুসূদন বললে—মিথ্যে বলবো না হুজুর, সে-কথা আমি জিজ্ঞেস করিনি, ভেবেছিলাম হয়ত আত্মীয়স্বজন কাউকে দেবেন।

—কত বছর আগে তুমি গড়িয়েছিলে এটা? মনে পড়ে?

মধুসূদন মনে মনে হিসেব করতে বসলো। বললে—সে কি আজকের কথা হুজুর! তা আমার মেজ ছেলেই তখন হয়নি, বৃন্দাবনবাবুও তখন জন্মায়নি হুজুর—মনে আছে, একবার ভীষণ জল-বৃষ্টি হয়েছিল কলকাতায়, শ্যামবাজারের মোড়টা জলে ডুবে গিয়েছিল—তারও আগে—

—আচ্ছা তুমি যাও।

মধুসূদন স্যাকরা চলে গেল।

মাধব দত্ত উঠলেন। উঠে পায়চারি করতে লাগলেন। একবার এদিক, একবার ওদিক। আদালত দূর থেকে দেখছিল। কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে—তামাক দেব হুজুর?

—না! আদালত চলে গেল।

ক'দিন থেকেই নহবৎ বসেছে দেউড়িতে। বিয়ের এখনও তিনদিন দেরি আছে। সুরটা যেন গায়ে এসে তীরের মত বিঁধতে লাগলো।

চিৎকার করে ডাকলেন—আদালত!

আদালত পাশের ঘরেই চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—হুজুর—

মাধব দত্ত বললেন—নহবৎ থামাতে বল।

আদালত থমকে দাঁড়াল। কিছু বুঝতে পারেনি প্রথমটায়।

বললো—থামাতে বলবো?

BanglaBook.org

—হ্যাঁ, থামাতে বল, বাজনা ভালো লাগছে না, একটা পয়সা দেব না বেটাদের, কেবল বেসুরো বাজাচ্ছে তখন থেকে—

আদালত হঠাৎ কর্তাবাবুর মেজাজ দেখে কেমন অবাক হয়ে গেল। মাধব দত্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বেরোবার মুখেই কাপড়ওয়ালা এসেছিল। কলেজ স্ট্রীটের পুরোন দোকানদার। মাধব দত্তকে দেখেই প্রণাম করলে নীচু হয়ে।

—কে?

—আমি কেশব আজ্ঞে, বেনারসী শাড়ি আনতে বলেছিলেন।

মাধব দত্ত হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—বেরোও, বেরিয়ে যাও, তোমরা সব জোচ্চোর, জোচ্চোর জুটেছে সব আমার বাড়িতে, বেরিয়ে যাও, বেরোও এখান থেকে!

কেশব তো অবাক! পুরুষানুক্রমে দত্তবাড়িতে কাপড় দিয়ে আসছে কেশব। এমন তো গালাগালি দেননি কখনও মাধব দত্ত।

—হ্যাঁ, বেরিয়ে যাও, আর কখনও আমার সামনে এসো না, বেরিয়ে যাও—

বলতে বলতে মাধব দত্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। চিৎকার শুনে যারা ঘরে এসেছিল তারাও কর্তাবাবুর হঠাৎ মেজাজ খারাপ দেখে অবাক হয়ে গেল। সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। বিয়ে-বাড়িতে গরীব আত্মীয়-স্বজনের ভিড় ক'দিন ধরেই চলছিল। তারা এতক্ষণ গোলমাল করছিল রান্নাবাড়িতে—এবার হঠাৎ চুপ করে গেল সবাই।

মাধব দত্ত সোজা অন্দর-মহলের দিকে চললেন। দিনে রাতে মাধব দত্ত জীবনে কতবার অন্দরে ঢুকেছেন তা আঙুলে গোনা যায়। যারা নতুন লোক এ বাড়ির, তারা একটু অবাকই হয়ে গেল তাই। মাধব দত্ত সোজা অন্দরে গেলেন—একেবারে নিজের নির্দিষ্ট ঘরে। সিঁড়ির পর সিঁড়ি, বারান্দার পর বারান্দা। তারপর বউ-রাণীর ঘর। বহুকাল আগে এইখানে কেটেছে তাঁর স্ত্রীর দিনগুলো। যেন বড় অচেনা লাগলো জায়গাটা। তিনি তাকে গয়না দিয়েছিলেন, আরাম দিয়েছিলেন, ঝি দিয়েছিলেন। শুধু তাই-ই নয়। নিয়মিত খাদ্য, নিয়মিত আহার্য সবই তিনি দিয়েছিলেন তাকে। শয্যা দিয়েছিলেন—শয্যার উপকরণও দিয়েছিলেন। আলতা, সিঁদুর, তেল, সাবান, সব দিয়েছিলেন। তবে কেন সে এমন করে প্রতিশোধ নিলে মাধব দত্তর ওপর!

সেই খাটটা তখনও ঠিক সেখানেই রয়েছে। সেই শয্যা। সেই বউরাণীর মৃত্যুর পর থেকে ও-ঘর তেমনিই রয়েছে। কোথাও কিছু বদলায়নি। ঠিক তেমনি। একটা ছবিও নেই বউরাণীর কোথাও। শুধু তার ব্যবহার করা শাড়ি, ব্যবহার করা আয়নাটা, ব্যবহার করা টুকি-টাকি জিনিসগুলো সব তেমনি রয়েছে। শুধু ধুলো পড়ে রয়েছে চারিদিকে। খাটের তলাটা দেখলেন। খাটের তলাতেই একদিন সীতা-পতির একজোড়া চটিজুতো দেখতে পেয়েছিলেন।

আশ্চর্য! সেদিন মাধব দত্ত ভেবেছিলেন—বেড়ালে বুঝি টেনে নিয়ে গিয়েছে। সেদিনও সন্দেহ হয়নি সীতাপতির ওপর।

ডাকলেন—আদালত!

আদালত সামনে এসে দাঁড়াল—হুজুর—

—নহবৎ বন্ধ করেছে ওরা?

—হ্যাঁ, হুজুর!

—সীতাপতি কোথায় আছে জানিস?

সীতাপতি! আদালতেরও মনে ছিল না সীতাপতিবাবুকে। সে-সব তো অনেক-

BanglaBook.org

দিনের কথা।

মাধব দত্ত আবার বললেন—যেখানে পারিস, যেমন করে পারিস সীতাপতিকে খুঁজে বার করতে হবে! সীতাপতিকে আমার চাই-ই চাই—

আশ্চর্য! মনে আছে যেদিন বউরাণীকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, মাধব দত্ত নিজে গিয়েছিলেন সঙ্গে। বৃন্দাবনও সঙ্গে ছিল। বৃন্দাবনই মুখাগ্নি করবে। মাধব দত্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখেছিলেন সেদিন। জীবনে কখনও অমন করে মুখের দিকে চাননি। আলতা পায়ে, বেনারসী দিয়ে বেশ ভালো করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাকে। বড় সুন্দর দেখিয়েছিল তাকে। এত সুন্দর! বউরাণী যে এত সুন্দর, তা তো তিনি জানতেন না। জানবার সুযোগই হয়নি তাঁর। মাধব দত্ত দেখেছিলেন—বউরাণীর মুখে যেন একটা হাসি ঝুলছে। একটা আলগা হাসি। মৃত্যুও পরেও কি মানুষে হাসে! সেদিন বুঝতে পারেননি মাধব দত্ত—ও কিসের হাসি! আজ যেন মাধব দত্ত বুঝতে পারলেন প্রথম। আজ যেন প্রথম উপলব্ধি করলেন। প্রতিশোধের হাসিও যে অত মিষ্টি হতে পারে, তা আজই প্রথম উপলব্ধি করলেন যেন!

তারপর হঠাৎ ডাকলেন আবার—আদালত!

—হুজুর!

—বৃন্দাবন কোথায়?

—আজ্ঞে, নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছে!

মাধব দত্ত বললেন—সব্বাইকে বলে দে, যে-যেখানে আছে, সব এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাক, আমি কারোর মুখ দেখতে চাই না।

আদালত তখনও দাঁড়িয়ে ছিল।

মাধব দত্ত বললেন—দাঁড়িয়ে দেখছিস কী, যা বলগে যা—যা শীগগির—

মাধব দত্তর গলাতে যে এত জোর থাকতে পারে তা আদালত আলীও আগে কোনদিন শোনেনি। আদালত সামনে থেকে সরে গিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল।

মাধব দত্ত আবার অন্দর-মহল থেকে বেরিয়ে এলেন। হাসিটার কথা মনে পড়লো আবার। শ্মশানের উঠোনে যখন শোয়ানো হয়েছিল তখন সেদিন হাসি দেখে একটু মায়াও হয়েছিল মাধব দত্তর। মনে মনে দুঃখও হয়েছিল খুব। সারা জীবন কখনও বাড়িতে রাত কাটাননি তিনি। বেঁচে থাকতে কখনও সে মুখের দিকে ভালো করে একবার তাকিয়েও দেখেননি। ভেবেছিলেন—কোনও অভাব তো রাখেননি তার! তার আবার কষ্ট কী! তার আবার কষ্ট কী থাকতে পারে! কিন্তু এমন করে সে যে তাঁর ওপর প্রতিশোধ নেবে কে জানতো?

মাধব দত্ত সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। হঠাৎ সামনে দিয়ে কে যেন কাছে এল। চিৎকার করে উঠলেন মাধব দত্ত।

—কে? কে তুই?

—আজ্ঞে, আমি সুশীলাবালা—

—কে সুশীলাবালা? এখানে কী করতে?

সুশীলাবালা ভয়ে জড়সড় হয়ে গিয়েছিল। বললে—আজ্ঞে মামাবাবু, আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি আপনার জ্ঞানদা দিদির ঝি?

মাধব দত্ত চিৎকার করে উঠলেন—জ্ঞানদা দিদি? বেরিয়ে যা এখান থেকে। তোদের কাউকে আমার দরকার নেই, বেরো এখান থেকে। মেয়েমানুষদের আর বিশ্বাস নেই—যা, যা এখুনি—

সুশীলাবালা তবু একবার বলতে চেষ্টা করলে—আজ্ঞে, আমরা যে বৃন্দাবন

BanglaBook.org

দাদার বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে এসেছি মামাবাবু!

মাধব দত্ত এবার তেড়ে এলেন।

বললেন—বিয়ে? কার বিয়ে? কোন্ ব্যাটার বিয়ে? হবে না বিয়ে—বিয়ে হবে না—চলে যা সব, যত আপদ জুটেছে বাড়িতে—যত সব আপদ—যা—

সুশীলাবালা ভয়ে ভয়ে সামনে থেকে পালিয়ে গেল।

বৃন্দাবন বাড়িতে এসেই খবর পেয়েছে—বাবা সকলকে বকছে, সকলকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলছে। নহবৎ বন্ধ হয়ে গেছে। দই, মিষ্টিওয়ালা, কাপড়-ওয়ালা সবাই ব্যাপার দেখে পালিয়ে গেছে। জিনিসপত্র সব ভেঙে ফেলেছে বাবা। ঘরময় দৌড়দৌড়ি করছে। মা-র শোবার ঘরের খাট-বিছানা বালিশ-তোশক সব আগুনে দিতে বলছে। বাড়িতে তুমুল কাণ্ড বেধে গেছে। এত বড় বাড়ি, সবাই কাণ্ড-কারখানা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। বাড়ির চাকর-বাকর, ঝি-ঝিউড়ি, মেথর-জমাদার ভিস্তি সবাই যে যার জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছে। কী হলো কর্তাবাবুর? দুমদাম শব্দ হচ্ছে দোতলায়, কাঁচ ভাঙছে, ফার্নিচার ভাঙছে। ঝম্ ঝম্ করে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে সব—বাসন-থালা-বাটি-গেলাস সমস্ত। আজ কারোর আর রেহাই নেই। কাউকেই আর রেহাই দেবেন না মাধব দত্ত।

বৃন্দাবনের গাড়িটা আসতেই আদালত আলী দৌড়ে গিয়ে খবর দিলে।

বৃন্দাবন তখন সবে নেমন্তন্নর চিঠি বিলি করে ফিরেছে।

সে-ও অবাক হয়ে গেল।

—কেন? হঠাৎ কি হলো বাবার?

আদালত আলী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে—তা জানি নে, হুজুর বলছেন, বিয়ে হবে না!

সে কী! বৃন্দাবন দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে হাজির হলো একেবারে অন্দর-মহলে। সেখানে তখনও দুমদাম ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ হচ্ছে। বৃন্দাবন সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বাবার চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল। সকালবেলাও তো এমন চেহারা ছিল না। এক ঘণ্টার মধ্যেই এমন বুড়ো হয়ে গেছে! চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে!

—বাবা?

—কে তুই? কে? তুই কে?

—আমি বৃন্দাবন! আমি—আমি—

মাধব দত্ত তেড়ে এলেন একটা লাঠি নিয়ে।

বৃন্দাবন প্রতিবাদ করতে গিয়ে বাবার চেহারা দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। নইলে কী সর্বনাশ হয়ে যেত বলা যায় না। হঠাৎ আদালত আলী ঘরে ঢুকে বললে—হুজুর, সীতাপতিবাবুকে পাওয়া গেছে।

—কোথায় সে হারামজাদা? নিয়ে আয় হারামজাদাকে টেনে—আমার খেয়ে আমার পরে আমারই সর্বনাশ—কোথায় সে?

আদালত বললে—তাঁর অসুখ হুজুর। বাগবাজারে রয়েছেন।

—বাগবাজার? তা চল্, বাগবাজারেই চল্, দেখি হারামজাদাকে আমি খুনই করে ফেলবো—

তখনি গাড়ি বেরোল। মাধব দত্তর তখন আর কোনদিকে দেখবার ফুরসৎ নেই। কোনও কিছু ভাববার সময়ও নেই তাঁর। নিজের আলমারি থেকে চাবি খুলে বন্দুকটা নিলেন। গুলি ভরা ছিল না, নিজের হাতে তাও ভরে নিলেন। তারপর

BanglaBook.org

গাড়িতে উঠে বললেন—চল, হাওয়ায় উড়ে চল, সে হারামজাদাকে দেখে নেব আজ—

বৃন্দাবন যাবার সময় আদালতকে বলে দিলে—খুব হুঁশিয়ার থাকবি আদালত—খুব হুঁশিয়ার—দেখিস যেন কেলেঙ্কারি না হয় কিছু—

কিন্তু কেলেঙ্কারিই হলো শেষ পর্যন্ত।

যে লোকটা সীতাপতির খবর এনেছিল, সে-ও সঙ্গে ছিল। বললে, তাঁর অসুখ খুব, তাই আনতে পারলাম না, একেবারে বাতে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে হুজুর—আজ-কালের মধ্যেই মারা যাবে হয়ত।

—হাওয়ায় উড়িয়ে চল্, দেরি হলে বেটা মরে যেতে পারে, মরে যাবার আগেই বেটাকে ধরবো—

বাগবাজার অনেক দূর নয়। ফড়েপুকুর থেকে বাগবাজার যেতে অনেক সময় লাগবার কথা নয়। মাধব দত্ত পাগলের মত প্রলাপ বকছিলেন তখন। একজন পালিয়েছে অনেক বছর আগেই। তাকে আজ আর ধরা যাবে না। ধরা-ছোঁয়ার একেবারে বাইরে চলে গেছে সে। শুধু হেসেছিল শ্মশানে শুয়ে শুয়ে। হয়ত ঠাট্টা করেছিল, হয়ত বিদ্রূপ করেছিল। ঠাট্টার হাসিকেই মাধব দত্ত অভিমান বলে সেদিন ভুল করেছিলেন। তাই সেদিন তাঁর মায়া হয়েছিল, দুঃখ হয়েছিল। তাই তিনি চোখের জলও ফেলেছিলেন সেদিন। নইলে সেইদিনই তাকে বাঁচিয়ে তুলে তার জবাবদিহি চাইতেন। সওয়াল জবাব চাইতেন তখনই, সেই শ্মশানের মধ্যেই। কিন্তু আর একজন এখনও বেঁচে আছে।

বাগবাজারের বলরামবাবুর বাড়ির সামনে এসে মাধব দত্তর গাড়ি থামলো।

গাড়ি থামতেই মাধব দত্ত উন্মাদের মত নেমে পড়লেন।

বলরামবাবু সীতাপতির দূর-সম্পর্কের পিসতুতো ভাই। শেষের কয়েক বছর বলরামবাবু না থাকলে সীতাপতিবাবুর আশ্রয়ই জুটত না। শুয়ে পড়ে ছিল পঙ্গু হয়ে। ডাক্তার আসতো, ওষুধ দিত। বিরাট বংশের ছেলে। অবস্থা খারাপ হলেও চেহারাটায় তখনও টোল খায়নি এতটুকু। কিন্তু তার পরমায়ু তখন হয়ত ফুরিয়ে আসছিল তিলে তিলে। অল্প অল্প কথা বলতে পারতো মাত্র। কিছু খেতে পারতো না, শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকতো। আর একটা দুটো কথা বলতো কখনও কখনও। তখন মাথার চুলগুলো ঢেউ খেলানো—পেকে সব চুল সাদা ধপ্‌ধপে হয়েছিল। গায়ের রং তখনও পাকা আমের মত। দেখলেই বোঝা যেত বয়েসকালে লাগসই চেহারা ছিল!

ডাক্তার বলতো—এ আর সারবার রোগ নয়—মিছিমিছি দেখা—

বলরামবাবু বলতো—তবু একটু শেষ চেষ্টা করে দেখুন ডাক্তারবাবু, সারা-জীবন বড় কষ্ট পেয়েছেন দাদা, আত্মীয়স্বজন মামলা করে বাড়ি থেকে উৎখাত করে দিয়েছিল, তার পর থেকেই চল্লিশ বছর একটানা ফড়েপুকুরের দত্তবাড়িতে কেটেছে, শেষকালে সেখান থেকেও বিদায় করে দিয়েছিল তারা।

ডাক্তার বলেছিল—কেন?

বলরামবাবু বলেছিল—কেন তা জানি নে, তাই শেষ-জীবনে আমার কাছেই রেখেছি, যদি মরবার সময়ও একটু শান্তি দিতে পারি।

কথাগুলো শুনতে শুনতে চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তো সীতাপতি-বাবুর, আর কোঁচার খুঁট দিয়ে মুছিয়ে দিতেন সে-জল বলরামবাবু।

সেদিনও ডাক্তারবাবু হাজির ছিল তখন। সকাল থেকেই অবস্থার গতিক ভাল নয়। বলরামবাবু তাড়াতাড়ি গিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে এসেছেন। ডাক্তার

BanglaBook.org

নাড়িটা ধরে বসেছিল। আর বেশিক্ষণ নয়। ওষুধ দেওয়াও বিফল।

হঠাৎ বাইরে গাড়ির আওয়াজ হতেই বেরিয়ে দেখেন মাধব দত্ত নামছেন গাড়ি থেকে।

বলরামবাবু অভ্যর্থনা করলেন। বললেন—আসুন কর্তাবাবু, কী সৌভাগ্য আমার—আর একটু পরে এলে আর দেখা হতো না।

মাধব দত্ত চিৎকার করে উঠলেন। বললেন—বেঁচে আছে এখনও?

—আজ্ঞে, শেষ দেখাটা দেখতে পারবেন, চলুন।

সীতাপতিবাবু একবার চোখ চাইলেন। বড় করুণ সে চোখের চাওয়াটা। ডাক্তারবাবু তখনও নাড়িটা ধরে আছে।

মাধব দত্ত সোজা বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বললেন—আমি মাধব দত্ত, ফড়েপুকুরের দত্তবাড়ির মালিক—তুমি আমাকে চিনতে পারছ?

সীতাপতিবাবু যেন মাথা নাড়লে মনে হলো।

মাধব দত্ত আবার জিজ্ঞেস করল—তুমি দত্তগিন্নীকে এই হার দিয়েছিলে? এই হারের লকেটের মধ্যে তোমার ছবি তুমি এঁটে দিয়েছিলে?

সীতাপতিবাবু চুপ করে রইল।

মাধব দত্ত এবার গর্জন করে উঠলেন—বলো, জবাব দাও?

সীতাপতিবাবু, মনে হলো যেন, ঘাড় নাড়লে একটু।

—কেন দিয়েছিলে?

কোনও জবাব নেই। ঘর সুদ্ধু লোক স্তম্ভিত হয়ে শুনছে। ডাক্তারবাবু তখনও নাড়ী ধরে আছে।

—কেন দিয়েছিলে জবাব দাও?

তখনও কোন জবাব নেই। ডাক্তারবাবু উসখুস করতে লাগলো। রোগীকে এ ভাবে অত্যাচার করবার অধিকার কারো নেই। কিন্তু মাধব দত্ত বড়লোক—হঠাৎ তাঁকে কিছু বলাও যায় না।

—কেন দিয়েছিলে জবাব দাও?

সীতাপতিবাবু তখনও জবাব দিচ্ছে না।

মাধব দত্ত আবার বললেন—পরশু বৃন্দাবনের বিয়ে, আজকে মধুসূদন স্যাকরা এসে গয়নাটা দিতেই আমি বিয়ে ভেঙে দিয়েছি। আমি এখুনি এর জবাব চাই। বলো, তোমার সঙ্গে দত্তগিন্নীর কী সম্পর্ক? কেন তুমি হার দিয়েছিলে তাকে? বলো?

সীতাপতিবাবুর কি হলো কে জানে! শেষ মুহূর্তে এত শক্তিই বা কোথায় পেলে তা-ই বা কে বলবে?

সীতাপতিবাবু স্পষ্ট উত্তর দিলে—বৃন্দাবন আমার ছেলে—

আর তারপরেই ঢলে পড়লো সীতাপতিবাবু। চোখের মণি দুটো উল্টে গেল। ঠোঁটটা বেঁকে গেল। একটা মাছি কোত্থেকে এসে বসলো নাকের ওপর।

ডাক্তারবাবু এবার দাঁড়িয়ে উঠলো।

বললে—সব শেষ।

আর মাধব দত্ত হঠাৎ আদালত আলীর হাত থেকে বন্দুকটা টেনে নিলেন। তারপর সীতাপতিবাবুকে লক্ষ্য করে দুমদুম করে গুলি ছুঁড়তে লাগলেন। একটার পর একটা। সেই অসংখ্য গুলির আঘাতে সীতাপতিবাবুর মৃতদেহটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল চোখের পলক পড়তে-না-পড়তে।

BanglaBook.org

যাঁরা এতক্ষণ গল্প শুনছিলেন তাঁরা এবার বললেন—তারপর?

বললাম—তারপর আর কি! টাকার জোর থাকলে যা হয়, তাই হলো। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা মারলে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের আইনে মারাত্মক অপরাধ বলে ধরা হয় না। কিন্তু পেনাল কোডের ওপরেও তো আর একটা পেনাল কোড আছে। আর একটা সুপ্রীম কোর্ট আছে। সেই সুপ্রীম কোর্টেরই রায় বেরিয়েছে পরশু। আপনারা পরশুদিন খবরের কাগজে দেখেছেন নিশ্চয় খবরটা। হাইকোর্টের নিলেমে বাদী বৃন্দাবন দত্তর সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রী হয়ে গেল নাম-মাত্র টাকায়। একে অভিশাপ বলুন, প্রতিশোধ বলুন, ভাগ্য-বিপর্যয় বলুন যা ইচ্ছে আপনারা বলতে পারেন, আমার আপত্তি নেই। আমি শুধু গল্প বলেই খালাস।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

স্ত্রী জাতক

শ্রীমতী মৃদুলা দেবীকে আমি বহুদিন আগে থেকেই চিনতাম। শুধু আমি নয়, তাজপুর জংশনের প্রত্যেকটি লোকই চিনতো। শুধু চিনতো নয়, আলাপ করতেও চাইতো। আলাপ করতে পেলে কৃতার্থ হয়ে যেত। মৃদুলা দেবীর বাড়ির পার্টিতে নেমন্তন্ন হলে তাজপুর জংশনের প্রত্যেকটি লোকই ধন্য হয়ে যেত। আমি তখন সামান্য একজন কর্মচারী। তাজপুরের ডি-টি-এস অফিসে সামান্য মাইনে পাই, কামিনীবাবুর হোটেলে খাই আর নিজের ছোট কোয়ার্টারটায় এসে শুই। কামিনী-বাবুর হোটেলে মাসকাবারি খরচ পড়তো দশ টাকা। সকালবেলা ভাত, ডাল, তরকারী আর মাছ, আর রাত্রে রুটি তরকারী আর মাংস। তা-ও আবার অনেকদিন খেতাম না। সেদিনকার চার্জ কাটা যেত। সকালে খেয়ে নিয়ে অফিসে গিয়ে বসতাম। সারাদিন কাজ করতাম কি করতাম না, তার হিসেব ছিল না। বিকেল পাঁচটা বাজতেই বেরিয়ে আসতাম বাইরে। তখন তাজপুর স্টেশনের প্লাটফরম ভরসা। আধ মাইল লম্বা প্লাটফরম। দিব্যি বেড়াও চেড়াও, চা খাও, খবরের কাগজ পড়ো। ওয়েটিংরুমের ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে খানিক জিরিয়ে নাও। তারপর সন্ধ্যে সাতটা বাজলে বম্বে মেল আসতো। সেখানে গিয়ে দাঁড়াও। দেখ, কত রকম প্যাসেঞ্জার, কত রকম লোক, কত ভিড়—কত বৈচিত্র্য। বম্বে মেল তাজপুর জংশনে দাঁড়াবে পনেরো মিনিট। সেই পনেরো মিনিট সময়টা ছিল সমস্ত তাজপুরের রেল কলোনীর লোকের একমাত্র আকর্ষণ। তাজপুর সিটি কলোনী থেকে তিন মাইল দূরে। সেই তিন মাইল দূর থেকে বম্বে মেল দেখতে আসতো সিটির রেণ্ট্ কণ্ট্রোলার ফারুক সাহেব। আসতো য়্যাডিশ্যানাল ম্যাজিস্ট্রেট্ জয়সোয়াল সাহেব। এমনি আরো অনেক লোক। রিটায়ার্ড গার্ড, ড্রাইভার, ফায়ারম্যান্‌রাও আসতো। তারা এসে ব্রেক-ভ্যানের কাছে যেত, ইঞ্জিনের কাছে যেত। ঘড়ি মিলিয়ে দেখতো। সেই আগেকার ব্রেক-ভ্যান—শুধু ড্রাইভার বদলিয়েছে, ফায়ারম্যান বদলিয়েছে, গার্ড বদলিয়েছে। এককালে একসঙ্গে সবাই কাজ করেছে। চেনা-শোনা মুখ। এক রানিংরুমে রাত কাটিয়েছে, দিন কাটিয়েছে। অনেকদিন পরে আবার দেখা হতেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা করতো।

—হ্যাল্লো বিল্, হোয়াট্‌স্ রং? পঁচিশ মিনিট লেট?

বিল্ নিজে ঘড়িটা মিলিয়ে নিয়ে বলতো—দিস ইঞ্জিন ইস্ রটন্ হ্যারি, গিভিং ট্রাব্‌ল্ ফ্রম দি ভেরি স্টার্ট—গোড়া থেকে ইঞ্জিনটা ট্রাবল্ দিচ্ছে আমায় —তার ওপর আমার ফায়ারম্যান এখনও ফায়ার করতেই শেখেনি—

রিটায়ার্ড গার্ড ওয়ার্কিং গার্ডের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করতো।

—হ্যালো টেডি? হোয়াট্ নিউজ, বয়?

তারপর টেডির সঙ্গে পুরোন দিনের কথা নিয়ে গল্প হতো। আগেকার দিনে চাকরি করে আরাম ছিল, আগেকার দিনে চাকরিতে সুখ ছিল, প্রসপেক্ট ছিল, গুণের কদর ছিল। সে-সব দিন আর নেই। টেডি আর টমিতে সেই সব দিনের সুখের কথা আলোচনা করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতো। কিন্তু পনেরো মিনিট মাত্র সময়। তখন য়্যাশ-পিটের ওপর দাঁড়িয়ে ওভারহেড্ ট্যাঙ্ক থেকে ইঞ্জিনে জল নেওয়া হচ্ছে। তখন থার্ড ক্লাস কামরার সামনে মাল ওঠানো নামানো নিয়ে তুমুল ঝগড়া বেধে গেছে। ইণ্টার ক্লাসের বাবুরা দৌড়ে প্লাটফরমের কল্ থেকে 'ড্রিঙ্কিং-

BanglaBook.org

ওয়াটার' ভরে নিচ্ছে কুঁজোয়। আর ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জাররা সবাই ওভারসীজ থেকে আমদানী। খাস য়ুরোপ থেকে আসতে আসতে বম্বেতে নেমে মেল্ ধরেছে। যাবে কলকাতায়। জানলা দিয়ে বকের মতন গলা বাড়িয়ে ডাইনিং-কারের খান্-সামাকে প্রশ্ন করে—হোয়াট্ টাইম ডিনার, বোয়?

মিহি মিষ্টি গলা। বাঁশির মতন সুর। লাল, একেবারে টক্‌টকে লাল চেহারা। ফাঁকা কামরার মধ্যে একটি দুটি লোক। সোডার বোতল, হুইস্কী, সিগ্রেট-প্যাকেট! ফোল্ডিং টেব্‌লের ওপর ছড়ানো।

প্লাটফরমের ওপর ফার্স্ট ক্লাস কামরার সামনেই ভিড়টা হতো বেশি। সবাই হাঁ করে চেয়ে দেখতো অবাক হয়ে। কোথাকার কোন্ দেশের সাহেব-মেম! কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে সব দেখছে। কেউ-কেউ আবার ফটো তুলতো। কেউ-কেউ আবার পয়সা দিত ভিখিরীদের।

আর রিফ্রেশ্‌মেণ্ট-রুমের ভেতরে তখন সোডা, লেমনেড্, কোল্ড ড্রিঙ্ক, চা, কফি চলেছে পুরোদমে। কেউ কেউ অমলেট, কেউ টোস্ট্, কেউ হাই-টি। ওদিকে ফার্স্ট বেল্ বাজলো। সবাই চঞ্চল হয়ে উঠলো। এবার মেল ছাড়বে। পুরী-কচুরীওয়ালারা সওদা বেচে দাম নিয়ে নিচ্ছে। পেপার-স্টলে দাঁড়িয়ে যারা এতক্ষণ কাগজ পড়ছিল, তারা এবার গিয়ে যার যার কামরায় উঠলো। ডাইনিং-কারের ওয়াটার-খানসামারা এমুড়ো থেকে ওমুড়ো ছুটোছুটি লাগিয়েছে।

তারপরই সেকেণ্ড বেল্। গার্ডসাহেব হুইশল্ বাজিয়ে সবুজ হ্যাণ্ডসিগ-ন্যাল্‌টা দুলিয়ে দিলে।

ইঞ্জিন থেকে সিগন্যাল দিলে ড্রাইভার পাল্টা হুইশল্ বাজিয়ে।

ট্রেন স্টার্ট দিলে।

—বাই-বাই বিল্, বাই-বাই—

—বাই-বাই টেডি, বাই-বাই—

যে-যার পথে চলে গেল। তখন আবার তাজপুর জংশন ফাঁকা। তখন ভেণ্ডাররা ঠেলাগাড়ি ঠেলতে ঠেলতে থার্ড ক্লাস ওয়েটিংরুমের দিকে চলতে লাগলো। তখন আবার ফোর্টিন আপ আসুক, কি এইটিন আপ ছাড়ুক, তাজপুর জংশনের লোকে-দের তা নিয়ে আর মাথা-ব্যথা নেই। তা নিয়ে আর প্লাটফরমে ভিড় হবে না। য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েরা তা দেখতে আর বাহারে রং-চঙে গাউন পরবে না। তাজ-পুর জংশন তখন ঢিমে তালে চলবে। তখন পার্শেল-ক্লার্ক একটা-একটা করে মাল পাঠাবে ব্রেক-ভ্যানে। ডিস্ট্রিক্ট্ অফিসের কণ্ট্রোলারদের তা নিয়ে আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তাজপুর জংশন তখন ডেড্।

এই তাজপুর জংশনেই একদিন শ্রীমতী মৃদুলা দেবী এই বম্বে মেল থেকে নেমেছিলেন।

সঙ্গে দু'বছরের একটি মেয়ে আর স্বামী।

মালপত্র সঙ্গে যা কিছু ছিল, তা নিয়ে কুলীরা তখন কাড়াকাড়ি করছে। ছেঁকে ধরেছে একেবারে।

আমাকে দেখেই ডাকলেন। বললেন—ও ভাই শোন-শোন এদিকে—

আমি কাছে যেতেই বললেন—তুমি বাঙালী তো?

বললাম—হ্যাঁ—

—তুমি তাজপুরেই থাকো?

—বললাম—হ্যাঁ, আমি ডি-টি-এস্ অফিসের ক্লার্ক।

BanglaBook.org

শ্রীমতী মৃদুলা দেবী বললেন—তা হলে তো ভালোই হয়েছে, এই যে দেখছো এঁকে, ইনি হলেন মিস্টার ভাদুড়ী, তোমাদের ডি-টি-এস্ অফিসের নতুন হেড ক্লার্ক, এখানে আমরা বদলি হয়ে এসেছি—তা কই, অফিস থেকে কেউ তো রিসিভ্ করতে এলো না—তোমাদের এখানে বুঝি ফুলের মালা নিয়ে স্টেশনে রিসিভ্ করার ব্যবস্থা নেই?

বললাম—না—

—সে কি! ওয়াণ্ডারফুল তো! আগে তো যেখানে গেছি সব জায়গায় সে-রকম ব্যবস্থা আছে দেখেছি। ধরো, ওয়ালটেয়ার গিয়েছি সেখানেও তাই দেখেছি, জব্বলপুরে দেখেছি সেখানেও তাই, খড়্গপুরে ছিলাম সেখানেও তাই, আর তোমাদের মিস্টার ভাদুড়ী হেড ক্লার্ক হয়ে এলেন, ফুলের মালা না-হোক, এমনি খালি হাতেও তো কেউ রিসিভ্ করতে এলো না?

আর আর কী বলবো।

মিস্টার ভাদুড়ী যেন লজ্জায় পড়েছিলেন। বললেন—আঃ, ওসব কথা আর ওর সঙ্গে কেন—

শ্রীমতী মৃদুলা দেবী রেগে গেলেন। বললেন—কেন? কেন বলবো না শুনি? আমি তো আন্‌ডিউ কিছু চাইছি না, তুমি এখানে হেড্ ক্লার্ক হয়ে এলে, আর কেউ এলোও না একবার স্টেশনে নিতে? আচ্ছা দেখে নেব আমি! দেখি কি করে প্রমোশন হয় কারো, প্রমোশনের সময় সেই তো তোমাকেই খোশামোদ করতে হবে—

আমি বললাম—আমি তো জানতাম না মিস্টার ভাদুড়ী আসবেন, জানলে আমি আসতুমই ঠিক, আমি এমনি প্লাটফরমে বেড়াতে এসেছিলাম।

—না, তোমার কথা বলছি না। তা এখন কে তোমাদের হেড ক্লার্ক?

আমি বললাম—নরসিংহম্‌বাবু।

—তোমরা কি হেড ক্লার্ককে মিস্টার বলো, না বাবু বলো?

বললাম—অফিসারদের মিস্টার বলি, আর বড়বাবুদের বাবু বলি।

কেন? হেড ক্লার্ক কি ছোট পোস্ট?

মিস্টার ভাদুড়ী এতক্ষণ যেন মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিলেন। একে নতুন এসেছেন, তায় অসাধারণ গো-বেচারা মানুষ বলে মনে হলো চেহারা দেখে। কুলীরা মাথায় মোট-ঘাট নিয়েছে। অনেক জিনিসপত্র সঙ্গে। একেবারে হিমশিম্ খেয়ে যাবার মত অবস্থা। ছোট একটা সুটকেস হাতে নিয়েছেন, তার ওপর একটা ছাতা, আর একটা হ্যাণ্ড-ব্যাগ। দু হাতে আর জায়গা নেই তখন।

শ্রীমতী মৃদুলা দেবীর যেন এতক্ষণে মালপত্রের দিকে নজর দেবার সময় হলো। তিনি ধমক দিলেন—এই খুব হুঁশিয়ার—ডি-টি-এস্ অফিসকা হেড ক্লার্ককা সামান্, বহুত্ হুঁশিয়ারসে লে না—

তারপর মিস্টার ভাদুড়ীর দিকে ফিরে বললেন—তুমি আছো তো ঠিক? দেখো, হারিয়ে যেও না যেন আবার—

কিন্তু চলতে গিয়েও আবার পেছন ফিরলেন। বললেন—ডলি? ডলি কোথায়?

মিস্টার ভাদুড়ী দু হাতে অনেক মালপত্র নিয়ে তখন এমনিতেই বিব্রত। বললেন—এই যে, ডলি আমার সঙ্গে আছে—

—তা ওর হাত ধরে নেবে তো? তোমার কি কোনও আক্কেল থাকতে নেই?

আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে মিস্টার ভাদুড়ীকে বাঁচালাম। বললাম—আমি ডলিকে কোলে তুলে নিচ্ছি, আপনি ভাববেন না মিছিমিছি—

ছোট্ট দু'বছরের মেয়ে ডলি। ঠিক মা'র মতই চেহারা। মিস্টার ভাদুড়ীর

BanglaBook.org

চেহারার কোনও আদলই পায়নি ওঁর মেয়ে।

শ্রীমতী মৃদুলা দেবী আমার ওপর বেশ সন্তুষ্ট হলেন বলে যেন মনে হলো। আমিও সব ব্যবস্থা করে দিলাম। কুলীদের মাথা থেকে মাল নামিয়ে গুনে তুললাম ট্যাক্সিতে। যার যা প্রাপ্য তা চুকিয়ে দিলাম। কোনও ঝামেলা হতে দিলাম না। নির্বিঘ্নে সবাই উঠলো ট্যাক্সিতে। গাড়িতে শ্রীমতী মৃদুলা দেবী বললেন—তোমার নাম কী?

নামটা বললাম।

বললেন—কোন্ গ্রেডে আছো এখন?

বললাম—একেবারে মিনিমাম গ্রেডে। হাতে পাই আটাশ টাকা তের আনা—

শ্রীমতী মৃদুলা দেবী অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—সে কি, আটাশ টাকা তের আনা মোটে? ক'বছর সার্ভিস?

বললাম—তিন বছর—

—যাক্ গে, এবার তো মিস্টার ভাদুড়ী এসে গেলেন হেড ক্লার্ক হয়ে, এবার তোমাকে একটা প্রমোশন দিতে হবে, সি-গ্রেডটা অন্তত দেওয়া উচিত ছিল য়্যাদ্দিন! কী যে সব করে অফিসে বুঝতেও পারি না! হেড ক্লার্কগুলোও হয়েছে তেমনি। কারোর ভালো করবার তো নাম নেই, যাক্‌গে ভাই, এবার আর তোমার কোনও ভাবনা নেই, দেখি আমি এবার তোমার কি করতে পারি ; তা তোমার নামটা কী বললে?

ট্যাক্সিটা কিছুদূর গেছে এমন সময় শ্রীমতী মৃদুলা দেবী হঠাৎ হৈ-চৈ করে উঠলেন।

—আমার লিপ্‌স্টিক্? আমার লিপ্‌স্টিক্ কোথায় ফেললে তুমি? কী সর্বনাশ, দেখো তো কাণ্ড!

—রোখো, ট্যাক্সি রোখো—

মিস্টার ভাদুড়ী বললেন—ট্রেনের কামরায় ফেলে আসোনি তো?

মৃদুলা দেবী বললে—বা রে, তা তুমিই তো শেষে নামলে, তুমি একবার দেখবে তো ভাল করে। কী ফেলে এলাম না-এলাম, তোমার কি কোনও দিকেই কিছু নজর নেই? এখন লিপ্‌স্টিক্ না-পেলে কী হবে বলো তো?

সত্যিই বড় ভাবনার কথা হলো। ট্যাক্সিটা মাঝপথে দাঁড়িয়ে গেছে। ট্যাক্সি-ড্রাইভারও হক্‌চকিয়ে গেছে। তাজপুর জংশনের ভিড় যা কিছু সব বম্বে মেল আসবার সময়। মেল চলে গেলে সব ভোঁ ভোঁ। তারপর যা কিছু লোকজন সব বাজার-এরিয়াতে। যেখানে ট্যাক্সি থেমেছিল সেখানে অন্ধকার। কয়েকটা বিরাট-বিরাট নাগেশ্বর ফুলের গাছ জায়গাটাকে অন্ধকার করে রেখেছে। বড় অসহায় অবস্থা হয়েছিল সেদিন শ্রীমতী মৃদুলা দেবীর। ট্যাক্সির ইনসাইড্ লাইটটা জ্বালিয়ে তিনি তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলেন। মনে হলো লিপ্‌স্টিক্ না পেলে যেন চোখ দিয়ে এখনি কান্না বেরিয়ে পড়বে। মিস্টার ভাদুড়ীও খুঁজতে লাগলেন। আমি আর কি করবো! বিব্রত দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম দুজনের কাণ্ড!

শ্রীমতী মৃদুলা দেবী মিস্টার ভাদুড়ীকে বললেন—তোমার জন্যেই তো এই সর্বনাশটা হলো, একটা কাজ যদি তোমাকে দিয়ে হয়—এখন এই অজ পাড়া-গাঁয়ে কোথায় লিপ্‌স্টিক্ পাই বলো তো?

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন—দেখলে তো মিস্টার ভাদুড়ীর কাণ্ড, এই রকম করেই উনি ডি-টি-এস্ অফিসে হেড ক্লার্কগিরি করেন! সামান্য একটা

BanglaBook.org

লিপ্‌স্টিক্‌ তারও হিসেব রাখবার যোগ্যতা নেই যাঁর...

বললাম—লিপ্‌স্টিক্‌ কি আপনার এখুনি দরকার?

—তা দরকার না? তুমি বলছো কী? আর তা ছাড়া দরকার হোক-না-হোক, জিনিসটা যাবে কোথায়? হাতের জিনিস হাতের কাছে না থাকলে খারাপ লাগে না?

বললাম—কাল সকালে আমি দোকান থেকে কিনে দিতে পারি।

শ্রীমতী মৃদুলা বেদী যেন হঠাৎ হাতে স্বর্গ পেলেন।

বললেন—সে কি, এখানে লিপ্‌স্টিক্‌ কিনতে পাওয়া যায়?

বললাম—যথেষ্ট! ক'টা চান আপনি?

শ্রীমতী মৃদুলা দেবী আরো অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—এখানকার মেয়েরাও লিপ্‌স্টিক্‌ ব্যবহার করে নাকি?

বললাম—কেউ কেউ ব্যবহার করেন, এখানে ডি-টি-এস্‌ গাঙ্গুলী আছেন, তাঁর স্ত্রী ব্যবহার করেন দেখেছি—মিস্টার মেটা আছেন, ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার, তাঁর স্ত্রী পরেন—

—যাক্‌, তাহলে এখানে কালচার্ড লোক আছে বলো, আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তাজপুর জংশনে যাচ্ছি, সেখানে কার সঙ্গে না জানি মিশতে হবে, একটা অজ্‌ পাড়াগাঁ—

—ওগো, পেয়েছি!

—পেয়েছ? বাঁচালে! কোথায় ছিল?

—আমার এই য়্যাটাচি কেসের মধ্যে—বলে মিস্টার ভাদুড়ি লিপ্‌স্টিক্‌টা এগিয়ে দিলেন শ্রীমতীর দিকে।

শ্রীমতী মৃদুলা দেবী লিপ্‌স্টিক্‌টা নিজের ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে রাখতে রাখতে বললেন—দেখেছ? আমি বলেছি তুমিই যত নষ্টের গোড়া, তুমি না হলে আর কার এত ভুলো মন—

মিস্টার ভাদুড়ী যে লিপ্‌স্টিক্‌টা খুঁজে দিলেন তার জন্যে কিন্তু শ্রীমতী মৃদুলা দেবীর কোনও কৃতজ্ঞতা দেখা গেল না।

বললে—ওঃ, আমায় যা ভাবিয়ে তুলেছিলে তুমি—

তারপর ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললেন—চলো, ছাড়ো এবার, মিছামিছি দেরি হয়ে গেল কত—

সেদিন শ্রীমতী মৃদুলা দেবী শুধু যে নিজেই ভাবিত হয়েছিলেন তাই-ই নয়, আমাকেও ভাবিয়ে তুলেছিলেন রীতিমত। সামান্য একটা লিপ্‌স্টিক্‌, সেই লিপ্‌স্টিকের জন্যেই মিস্টার ভাদুড়ীর প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত হবার যোগাড় হয়েছিল।

সেদিনকার সেই শ্রীমতী মৃদুলা দেবীই যে এতদিন পরে আমার খোঁজ নেবেন, তা আমি ভাবতে পারিনি। একটা চিঠিতে লিখেছেন—

"আমি আসছে সোমবার একদিনের জন্যে কলকাতায় যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া বিশেষ দরকার। সকালে ওয়ান ডাউন-এ আমি পৌঁছবো। বিকেল চারটে থেকে পাঁচটা আমি ফ্রি থাকবো। এই সময়ে এসো। ইতি—

—মৃদুলা দেবী"

অনেক দিন পরে, অনেক বছর পরে আবার শ্রীমতী মৃদুলা দেবীকে আমার মনে পড়লো। বলতে গেলে মৃদুলা দেবীকে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। সেই তাজপুর জংশনের পুরোন দিনগুলোর কথাও ভুলে গিয়েছিলাম। সেই মিস্টার

BanglaBook.org

ভাদুড়ী—ডি-টি-এস্ অফিসের হেড ক্লার্ক, সেই ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার মিস্টার মেটা, ডি-টি-এস্ গাঙ্গুলী। সেই তাজপুর জংশনে বিকেলবেলা বম্বে মেল দেখতে যাওয়া। সেই রেণ্ট কণ্ট্রোলার মিস্টার ফারুক্, য়্যাডিশন্যাল ম্যাজিস্ট্রেট্ জয়-সোয়াল সাহেব। সেই কামিনীবাবুর হোটেল। কত সব পুরোন কথা। দেখতে দেখতে সব একদিন কেমন করে পুরোন হয়ে যায়, সব বর্তমান একদিন অতীত হয়ে যায়, আর দেখতে দেখতে একদিনের খারাপ লাগা আবার একদিন ভালো-লাগায় পরিণত হয়।

বাড়ি ঠিক করাই ছিল আগে থেকেই। নরসিংহম্‌বাবু বদলি হয়ে যাচ্ছেন নাইনপুরে। তাঁর জায়গায় এলেন মিস্টার ভাদুড়ী। প্রথম প্রথম চিরকালের নিয়ম অনুসারে সবাই মিস্টার ভাদুড়ীকে ভাদুড়ীবাবু বলতো—আমিই শুধরে দিলাম। একবার চালু করে দিলেই হলো। প্রথমটাই যা একটু মুশকিল হয়। তারপর একজন যা বলে, তাই সবাই বলতে শুরু করে।

সকালবেলাই শ্রীমতী মৃদুলা দেবী মিস্টার ভাদুড়ীকে খাইয়ে-দাইয়ে অফিসে পাঠিয়ে দিতেন।

মিস্টার ভাদুড়ী ছিলেন আলসে প্রকৃতির লোক। ঘুম থেকে উঠতেনই দেরি করে। তারপর মুখ-হাত ধুয়ে চা-টোস্ট খেতে খেতে আটটা বেজে যেত। মৃদুলা দেবী তাড়া দিতেন—কী গো? কখন অফিসে যাবে?

মিস্টার ভাদুড়ী বলতেন—দাঁড়াও, এই খবরের কাগজটা পড়ে নিই—

—রাখো তোমার খবরের কাগজ,—বলে খবরের কাগজটা ছোঁ মেরে টেনে নিতেন মৃদুলা দেবী। বলতেন—এই দেরি করে অফিসে যাও বলেই তো তোমার প্রমোশন হয় না—ওঠো, ওঠো—

মিস্টার ভাদুড়ীর তখনও জড়তা কাটেনি ভালো করে। বলতেন—এখন তো আটটা—অফিস বসবে তো সেই দশটায়—আর যেতে তো মাত্র পাঁচ মিনিট লাগে—

—তুমি থামো দিকি!

মৃদুলা দেবী ধমকে উঠতেন। বলতেন—এই জন্যেই তো তোমার কিছু হয় না—সাধে কি আর তুমি এখনও অফিসার হতে পারলে না! তোমার সঙ্গে একসঙ্গে যারা কাজ করছিল তারা সবাই কবে এ-টি-এস্ হয়ে গেল, আর তুমি একলা হেড ক্লার্ক হয়ে পড়ে রইলে—

—এসো, এসো—তোমার গরম জল করেছি, চান করে নাও—

বলে মিস্টার ভাদুড়ীকে জোর করে ঠেলেঠুলে বাথরুমে পুরে দিতেন। তারপর নিজে সাবান নিয়ে গা ঘষে দিতেন। মাথায় গরম জল ঢেলে দিতেন। তোয়ালে দিয়ে গা মুছিয়ে দিতেন।

মিস্টার ভাদুড়ী বলতেন—তুমি কেন অত ব্যস্ত হচ্ছো, আমি নিজেই পারবো—

—থাক, তোমার দ্বারা যা হবে, তা আমি জানি!

বলে মৃদুলা দেবী মিস্টার ভাদুড়ীকে খেতে বসাতেন। মিস্টার ভাদুড়ীর স্বাস্থ্য বিশেষ সুবিধের ছিল না। বেশি খেতে পারতেন না। সাদাসিধে খাওয়ার দিকেই ঝোঁক ছিল তাঁর বেশি। বোধ হয় হজমও করতে পারতেন না ভাল জিনিস।

বলতেন—এত ভাত দিলে কেন আবার? অফিস যাবার সময় কি এত খাওয়া যায়?

—যায়, যায়, এই না-খেয়ে-খেয়েই তোমার এই শরীর। শরীরটাকে একটু জুৎসই করো দিকিনি। শরীরে জুৎ না থাকলে চাকরি করবে কী করে? আর চাকরিতে মন না দিলে কি প্রমোশন হয় ওমনি ওমনি?

BanglaBook.org

কোট প্যাণ্ট পরে যখন বেরোতেন, মৃদুলা দেবী তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে দাঁড়াতেন সামনে।

বলতেন—দেখি দেখি, কিরকম টাই বাঁধা হলো, দেখি?

—ছাই হয়েছে!

বলে নিজেই আবার নেকটাইটা খুলে নতুন করে বেঁধে দিতেন। চিরুনি দিয়ে মাথার চুলটা আঁচড়ে দিতেন। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দিতেন। তারপর বলতেন—যাও, মন দিয়ে কাজ করবে—

পাঁচ মিনিটের রাস্তা। তাজপুর জংশনের রেলের কলোনীর রাস্তাঘাট ভালো। মিস্টার ভাদুড়ী যখন অফিসে আসতেন তখন ঝাঁটও পড়েনি অফিসে। অফিসাররা কেউই আসেনি। ক্লার্করাও কেউ আসেনি। চাপরাসীরাও তখন কেউ আসেনি। অফিসে এসে ডাস্টার দিয়ে নিজের চেয়ার টেবিলটা মুছে নিতেন। জানলাগুলো খুলে দিতেন। তারপর টেবিলের ফাইলগুলো নিয়ে একে একে কাজ আরম্ভ করতেন। আমরা যখন যেতাম তখন দেখতাম আগের দিনের সব ফাইল ক্লিয়ার। টেবিল ফাঁকা।

এক-একদিন ডি-টি-এস্ ঘরে ঢুকতেন।

—একি, মিস্টার ভাদুড়ী, আপনি এত সকাল-সকাল?

সারাদিন মুখ বুঁজে কাজ করতে মিস্টার ভাদুড়ীর ক্লান্তি ছিল না। আগেকার নরসিংহম্‌বাবু হৈ-চৈ করতেন খুব। কাজের চেয়ে কাজের ভড়ং ছিল বেশি। বকাবকি, ওয়ার্নিং, ফাইন, অনেক কিছু করতেন। স্টাফ তখন কাজ করত কম। কিন্তু মিস্টার ভাদুড়ী আসবার পর কাজ বেশ শান্তভাবে চলতে লাগলো।

দুপুরবেলা বাড়ি থেকে টেলিফোন করতেন মৃদুলা দেবী।

—কী হলো? টিফিন খেয়েছো?

তখন মিস্টার ভাদুড়ীর মনে পড়তো। বলতেন—ওই যাঃ, ভুলে গেছি—

তখন টিফিন-কৌটোটার কথা মনে পড়তো। টিফিন-কৌটোর মধ্যে থাকতো ছানা, আপেলের ক'টা টুকরো, সঙ্গে দু'টো সন্দেশ।

মিস্টার ভাদুড়ী সন্দেশটা মুখে পুরে দিয়ে বলতেন—এই সন্দেশটা মুখে দিলাম—

—আর ছানা? ছানাটা, ফলটা খেয়ে নিয়ে তবে তো সন্দেশ খেতে হয়। তোমার দেখছি সবই উল্টো ব্যাপার—

মিস্টার ভাদুড়ী তাড়াতাড়ি গপ্ গপ্ করে খাবারগুলো খেয়ে নিয়ে আবার কাজে বসতেন। তখন আবার ফাইল। আবার ফাইলের ওপর ড্রাফট্ লিখতে বসতেন। ডি-টি-এস্ কখন অফিসে এসেছেন, কখন চলে গিয়েছেন, তার কোনও খেয়ালই থাকত না। কেউ ছুটির জন্যে দরখাস্ত দিলে তাকে ডাকতেন। বলতেন —তুমি সাত দিনের ছুটি চেয়েছ? এ দরখাস্ত তোমার?

মিস্টার ভাদুড়ী আবার বলতেন—তা ছুটি না নিলেই নয়?

—না স্যার, বড় জরুরী, বড় শরীর খারাপ যাচ্ছে ক'দিন।

মিস্টার ভাদুড়ী বলতেন—তা একটু কাজ করো না, সকালবেলা উঠে একটু ছোলা-ভিজে খাও না, সেরে যাবে সব—কিন্তু সকাল সন্ধ্যায় একটু বেড়াতে পারো না? হাঁটতে হাঁটতে একেবারে সেই পাম্পিং-স্টেশনের দিকে চলে যাবে—

—আজ্ঞে বিশ্রাম না নিলে সারবে না, ওসব অনেক করে দেখেছি।

তখন মিস্টার ভাদুড়ী বিপদে পড়তেন বড়। বলতেন—আজ বরং বাড়ি গিয়ে ভেবে দেখ—আর একবার ভাবো, দেখছো তো অফিসে কী রকম কাজের চাপ।

BanglaBook.org

এ সময়ে ছুটি নিলে অফিস চলবে কী করে বুঝে দেখ? তুমি দরখাস্তখানা আজ বরং নিয়ে যাও—

কিন্তু পরের দিন আর ভেবে বলতে হতো না। মিস্টার ভাদুড়ী অফিসে এসেই চাপরাসীকে ডাকতেন—ওরে এই দরখাস্তখানা চ্যাটার্জিবাবুকে দিয়ে আয়—

আমরা সবাই অবাক হয়ে দেখতাম হেড ক্লার্ক চ্যাটার্জির ছুটির দরখাস্ত স্যাংশন করে দিয়েছে। কী করে হলো? কী করে হলো স্যাংশন?

চ্যাটার্জি বললে—আর কী করে? কালকে মিসেস ভাদুড়ীর কাছে গিয়ে একসের রসগোল্লা দিয়ে এসেছিলুম। বললাম, কলকাতা থেকে পাঠিয়েছেন আমার মা—ব্যস—

দিন দুইও গেল না, সমস্ত তাজপুর জংশনের লোক জেনে গেল মিসেস ভাদুড়ী ভারি সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। বাপ বিরাট বড়লোক ছিলেন। দুই মেয়ে। এক বোনের বিয়ে হয়েছে পাটনার এক মুন্সেফের সঙ্গে। সে-জামাই এখন জজ। আর এই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তাজপুরের হেড ক্লার্ক মিস্টার ভাদুড়ীর সঙ্গে। রাজসাহীতে মানুষ, সেখানেই লেখাপড়া করছিল। দুই বোনই গ্রাজুয়েট, দুই বোনই মোটর ড্রাইভ, লন-টেনিস, সুইমিং সব রকম বিদ্যেয় ওস্তাদ। দিন দুই-এর মধ্যেই খবরটা রটে গেল তাজপুর জংশনে।

মিস্টার মেটা সেদিন মিস্টার ভাদুড়ীর কাছে এসে বললেন—আপনি তো আমাদের বলেননি মিস্টার ভাদুড়ী যে মিসেস ভাদুড়ী এমন কালচার্ড্ লেডী?

মিস্টার ভাদুড়ী বড় লজ্জায় পড়লেন। কী যে বলবেন ভেবে পেলেন না। মুখ-কান লাল হয়ে উঠলো। বললেন—আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে নাকি?

—সে কি, আপনি তো অফিসের ফাইল নিয়েই ব্যস্ত, আপনি আর জানবেন কী করে? তিনি নিজে এসেছিলেন যে কাল আমার বাংলোয়, নিজেই ইন্‌ট্রোডিউস্ করলেন নিজেকে। তারপর আমরা সবাই মিলে তাস খেললাম। খুব ভালো কাটলো সময়টা—

মিস্টার ভাদুড়ী দাঁড়িয়ে উঠে সসম্ভ্রমে বিনয়ের হাসি হাসলেন।

মিস্টার মেটা বললেন—আমাদের একদিন নেমন্তন্ন করে গেছেন আপনার বাড়িতে। আমরা সবাই একদিন যে আপনার বাড়িতে যাচ্ছি—

মিস্টার মেটা পাঞ্জাবী মানুষ। বেশ ভদ্র। গেজেটেড্ অফিসার। তবু মিস্টার ভাদুড়ীর মনে হলো কোথাও যেন কোনও আতিশয্য নেই চরিত্রে।

সেদিন ডি-টি-এস্-এর ঘরে একটা ফাইল নিয়ে গিয়েছিলেন।

ডি-টি-এস্ মিস্টার গাঙ্গুলী সই করতে করতে হঠাৎ মুখ তুলে বললেন—বাই-দি-বাই, মিস্টার ভাদুড়ী, আপনি কি রাজসাহীতে বিয়ে করেছেন?

প্রথমটায় প্রশ্নটা শুনে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ডি-টি-এস্ গাঙ্গুলী সাধারণতঃ একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক। সহজে অফিসের কাজের কথা ছাড়া অন্য কথা বলেন না। তাঁর মুখ থেকে হঠাৎ বাংলায় কথা শুনে একটু অবাক হয়ে গেলেন। ডি-টি-এস্ মিস্টার গাঙ্গুলী নামেই শুধু বাঙালী। আসলে পাকা সাহেব। বাড়িতেও সাহেবিয়ানা পুরোদস্তুর। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার, এই সব! সাত বছর বিলেতে ছিলেন। যেবার লন্ডনে রেলের স্ট্রাইক হয়, সেই সময় সেখানে কাজ করেছিলেন, ভলান্টিয়ার হিসাবে। তার পুরস্কার হিসেবে ইণ্ডিয়ান রেল-ওয়েতে গেজেটেড পোস্ট পেয়েছিলেন।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন—আমার সঙ্গে কালকেই প্রথম আলাপ হলো, আমার বাংলোয় গিয়েছিলেন মিসেস ভাদুড়ী, সি ইজ্ এ ভেরি কালচার্ড লেডী ইট্

BanglaBook.org

সীম্‌স্‌—আমি ওঁর বাবাকে চিনতাম—

তারপর বললেন—আপনার ভায়রাভাই তো পাটনা হাইকোর্টের জজ্‌?

মিস্টার ভাদুড়ী বললেন—ইয়েস স্যার—

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন—আমি তো শুনে অবাক্‌ হয়ে গেলাম, আপনি তো কখনো বলেননি আমাকে—

এরপর মিস্টার জয়শোয়ালের সঙ্গে দেখা অফিস থেকে ফেরবার পথে। মিস্টার ভাদুড়ী তখন সারাদিনের কাজের পর ফাইল নিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন। অফিসে কাজ বেশি, তাই বাড়িতেও ফাইল নিয়ে এসে কাজ করতে হতো তখন। মাথা নিচু করেই আসছিলেন মিস্টার ভাদুড়ী। হঠাৎ মিস্টার জয়শোয়ালের গাড়িটা পাশ দিয়ে যেতে যেতে থেমে গেল।

ভেতর থেকে মিস্টার জয়শোয়ালের গলা শোনা গেল।

—কাম্‌ ইন্‌ মিস্টার ভাদুড়ী, ইফ্‌ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড্‌—

মিস্টার ভাদুড়ী সসঙ্কোচে গাড়িতে উঠে বসলেন।

মিস্টার জয়শোয়াল বললেন—মিস্টার ভাদুড়ী, আপনার ওয়াইফ্‌ এত অ্যাক-ম্‌প্লিশ্‌ড লেডী আপনি তো বলেননি। মিস্টার মেটার বাংলোয় আলাপ হলো কাল—সি ইজ চার্মিং—সি ইজ এ নাইস্‌ পার্টনার ইন্‌ কার্ডস—

মিস্টার ভাদুড়ী সবিনয়ে বললেন—খুব বড়লোকের মেয়ে কিনা...

মিস্টার জয়শোয়াল বললেন—তাই তো শুনলাম, আপনার ব্রাদার-ইন-ল পাটনা হাইকোর্টের জজ—

বাড়ির সামনে মিস্টার জয়শোয়াল নামিয়ে দিলেন। বললেন—এখন বড় ব্যস্ত আছি, মিসেস ভাদুড়ীকে বলবেন আমি আসছি একদিন টি-তে—

শ্রীমতী মৃদুলা রাতারাতি দু'দিনের মধ্যেই তাজপুর জংশনকে একেবারে জয় করে ফেলেছিলেন। হেড ক্লার্কের কোয়ার্টার দু-কামরাওয়ালা। আগে নরসিং-হম্‌বাবু থাকতেন পর্দানশীন ফ্যামিলি নিয়ে। কোয়ার্টারের সামনে বাঁশের বেড়া দিয়ে একটু আব্রু করেছিলেন। সেই বাঁশের বেড়া আবার পচে পচে খসে ধ্বসে পড়তো! সেখানে গরু পুষেছিলেন। গরুর চোনা আর গোবরের জায়গাটা দুর্গন্ধ-ময় হয়ে থাকতো। ভেতরে আলো ঢুকতো না। রোজ ভোরবেলা সেই দরজার সামনে আবার আলপনা দেওয়া হতো। আর এদিকে সন্ধ্যে সাতটা বাজতে-না-বাজতে ভোঁ ভোঁ অন্ধকার। খেয়েদেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়ুক আর জেগেই থাকুক আলো নিভে যেত। বেশি আলো জ্বাললেই তো বেশি পয়সা খরচ!

কিন্তু মিস্টার ভাদুড়ী সেই কোয়ার্টারে আসার পর থেকেই রাত এগারোটা বারোটা পর্যন্ত আলোয় আলো হয়ে থাকতো। বাইরে রাস্তা দিয়ে কেউ গেলে শুনতে পেত রেডিওর গানের সুর। সে বাঁশের বেড়া তখন উঠে গেছে। সাদা, ফরসা, ফাঁকা হয়ে গিয়েছে সামনেটা। জানলায় পর্দা ঝুলেছে, বাগানে চেয়ার টেবিল পড়ে আছে। সেখানে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শ্রীমতী মৃদুলা দেবী হয় চা খাচ্ছেন নয়তো সেলাই করছেন, নয়তো মেয়েকে নাচ শেখাচ্ছেন।

আর আশ্চর্যের ওপর আশ্চর্য, দেখতে দেখতে সেই কোয়ার্টারই মিস্টার মেটার দৌলতে অন্য চেহারায় রূপান্তরিত হয়ে গেল একদিন। ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্টের লোক এসে একদিন এক্সপ্যাণ্ডেড মেটালের ফেনসিং বানিয়ে দিলে। দেখা গেল রেলওয়ের মালী এসে ক্রোটনের চারা লাগিয়ে দিচ্ছে। মিস্ত্রীরা হোয়াইট-ওয়াশ করছে ঘর। সামনে ঢাকা ব্যালকনি। বাগানের ফেনসিং মানুষের মাথা সমান উঁচু হয়ে গেল। দেখা গেল অ্যাডিশন্যাল ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার জয়শোয়ালের গাড়ি এসে

BanglaBook.org

দাঁড়াচ্ছে সামনে। মিস্টার আর মিসেস গাঙ্গুলী আসছেন। বাইরে থেকে দেখা যায় না আর কিছু। কিন্তু বাগানের ওপর টেবিলে চায়ের আয়োজন হয়, তাস খেলা হয়, মাঝে মাঝে গান হয়। আবার মাঝে মাঝে ব্যাডমিণ্টনের নেটও পড়ে।

অনেক রাত্রে শেষ হয় পার্টি।

মিস্টার ভাদুড়ীর তখন ঘুমে চোখ ঢুলে আসছে। সারাদিন অফিসে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ফাইল ঘেঁটেছেন। তারপর একটু কোট-ট্রাউজার ছেড়ে খালি গায়ে থাকতে ইচ্ছে করে। গরমের দিনে খালি গায়ে হাওয়া লাগলে শরীরটা বেশ জুড়িয়ে যায়। সেই সময়ে লুঙ্গীটা পরে মাদুরের ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লেও খানিকটা আরাম হবার কথা। কিন্তু তা হয় না। অফিস থেকে এসেই তাড়াতাড়ি চান করে নিতে হয়। নিয়ে আবার ট্রাউজার সার্ট স্লিপার সব পরতে হয়।

শ্রীমতী মৃদুলা দেবী তখন ভীষণ ব্যস্ত।

হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ে গেল। বললেন—একি, তুমি আজকে শেভ্ করোনি?

মিস্টার ভাদুড়ীর মনেও ছিল না দাড়ি না কামানোর কথাটা। গালে হাত বুলিয়ে বললেন—না, সকালবেলা তাড়াহুড়োতে আর সময় হয়নি—

শ্রীমতী মৃদুলা দেবী বললেন—ছি ছি, এক্ষুনি শেভ্ করে নাও—আর একটু হলে কী সর্বনাশ হয়েছিল বল তো! এখুনি হয়তো মিস্টার ফারুক্ এসে পড়বেন।

শ্রীমতী জোর করে মিস্টার ভাদুড়ীকে বাথরুমে পাঠিয়ে দেন।

মিস্টার ভাদুড়ীর একটু অস্বস্তি লাগে। বলেন—আজ আবার মিস্টার ফারুককে নেমন্তন্ন করেছ নাকি?

—তা তোমার কিচ্ছু মনে থাকে না? সকাল থেকে তো তোমাকে বলেছি মিস্টার ফারুককে ডিনারে বলেছি আজ! তোমার কি কিছুতেই মনে থাকবে না? এই ভুলো মন নিয়ে অফিসে কাজ করো বলেই তোমার প্রমোশন হয় না—

মিস্টার ভাদুড়ী যেন অনিচ্ছার সঙ্গেই আবার ট্রাউজার পরেন, সু পরেন, সার্ট পরেন। অফিস থেকে এসেও তাঁকে যেন আবার ডিউটি দিতে হয়।

শ্রীমতী মৃদুলা দেবীর সম্বন্ধে এত খবর বাইরের লোকের পক্ষে জানবার কথা নয়। বাইরের লোকেরা কিছুটা আন্দাজ করতো—সামান্যই দেখতে পেত। তাজপুরের কলোনী-মহলে গুজ্-গুজ্ ফিস্-ফিস্ আলোচনাও হতো মেয়েমহলে।

ডি-গ্রেড করালীবাবুর বউ বলতো—ছি ছি, বাঙালী মেয়েদের নাম ডোবালে মা—

সি-গ্রেড সতীশবাবুর বউ বলতো—কিন্তু যাই বলো দিদি, মানায় খুব চমৎকার—

—অমন মানানোর মুখে আগুন!

—তা আমরা তো আর ওর মতন মটরগাড়িও চালাতে পারবো না, বিড়ি খেতেও পারবো না।

—মটর চালায় নাকি আবার?

—ওমা, তবে আর বলছি কী! সেদিন দেখি না বাজারের রাস্তা দিয়ে বিড়ি খেতে খেতে ফারুক সাহেবের মটরগাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন।

সি গ্রেড সতীশবাবুর বউ বললে—তা বলে বিড়ি খাওয়ার কথাটা বাড়াবাড়ি তোমার দিদি—বিড়ি কখনও মেয়েমানুষে খায়? সিগারেট বলো—

—ও একই কথা! যার নাম বিড়ি, তার নামই সিগারেট!

বাইরের লোকের কাছে এসব খানিকটা অবিশ্বাস্য, খানিকটা অনুমান-সাপেক্ষ

BanglaBook.org

ব্যাপার। কিন্তু আমি সমস্ত ব্যাপারটাই জানতাম। আমি শুধু মিস্টার ভাদুড়ীর অফিসে যে চাকরি করতাম তাই-ই নয়, আমি ছিলাম মেয়ের প্রাইভেট টিউটর। প্রথম তাজপুর স্টেশনে ট্রেন থেকে নামার দিন থেকে বহুদিন পর্যন্ত মিস্টার ভাদুড়ীর বাড়িতে ছিল আমার অব্যাহত গতি। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সব দেখেছি, সব শুনেছি। যে-কোয়ার্টার ছিল ভাঙা পুরোন নোংরা, মৃদুলা দেবীর যাবার পর থেকে সে-কোয়ার্টারের চেহারা কী হয়ে গেল, তা লক্ষ্য করলাম।

সেই প্রথম রাত্রিতেই কোয়ার্টারের চেহারা দেখে মৃদুলা দেবীর চোখে জল বেরিয়ে গিয়েছিল। এখানে ভাঙা, ওখানে নোংরা, সেখানে জল পড়ছে, বাইরে গরুর গোবর।

মৃদুলা দেবী বললেন—আমি এখানে থাকবো না, এক মিনিটও থাকবো না। তুমি যা বলো আর তাই বলো—

মিস্টার ভাদুরী কেমন বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। বলেছিলেন—কিন্তু এখন তো আর ফিরে যাবার গাড়ি নেই—

ফিরে যাবার গাড়ি থাকলে মৃদুলা দেবী হয়ত সেই রাত্রেই আবার যথাস্থানে ফিরে যেতেন। কিন্তু মৃদুলা দেবী বোধ হয় অত সহজে হেরে যাবার লোক নন। সেই রাত্রেই তিনি ঝাঁটা ধরলেন। সেদিন সেই লিপ্‌স্টিক্‌-পরা মৃদুলা দেবীরই যেন আর এক রূপ দেখেছিলাম। মনে আছে, কী সে নিষ্ঠা, কী সে ধৈর্য! এতটুকু হতাশাও যেন মৃদুলা দেবীকে হারিয়ে দিতে পারে না। কোমরে আঁচল বেঁধে ঘর-পরিষ্কারে লেগে গেলেন। ট্রাঙ্ক, হোল্ড্‌-অল্‌, বাক্স-প্যাঁটরা, বিছানা-বালিশ, যেগুলো সঙ্গে এসেছিল সব কোণে পড়ে রইল। মৃদুলা দেবী আর আমি—দুজনে মিলে ধরাধরি করে সেদিন বাসযোগ্য করলাম কোয়ার্টারটাকে। তারপর রান্না। মৃদুলা দেবী যে এত কাজের মানুষ সেদিন নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না। ঘেমে-নেয়ে তখন তিনি একেবারে গলদঘর্ম হয়ে গেছেন। কোথায় গেল তাঁর সেই লিপ্‌স্টিক্‌, কোথায় গেল তাঁর সেই পাউডার, টিপ্‌ আর খোঁপা। জর্জেট শাড়ির বদলে একটা ময়লা শাড়ি পরে নিয়েছেন। রান্নার সঙ্গে সঙ্গে উনুনের ধোঁয়ার যন্ত্রণায় তিনি কিন্তু এতটুকু কাতর হননি।

আমি সেদিন তাঁর কষ্ট দেখে বলেছিলাম—আপনার খুব কষ্ট হলো—

মৃদুলা দেবীর তখন সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল। বলেছিলেন—এই মানুষের হাতে যখন পড়েছি, তখন কষ্ট না হয়ে যায়?

তারপর আমাকে বলেছিলেন—তুমিও খেয়ে যাও—

বললাম—আমার তো হোটেলের রাঁধা ভাত আছে—

—তা হোক, এত রাত্তিরে হোটেল কি আর খোলা আছে তোমার জন্যে? আর সে-ভাত কড়কড়ে বাসি হয়ে গেছে এতক্ষণে—

অবশ্য আমার তখন থাকতেই ইচ্ছে করছিল। হেড ক্লার্ক আমার ভাগ্য-আকাশের বিধাতা-পুরুষ। তাঁর বাড়ির কোনও উপকারে লাগলে সেটা আখেরে লাভেরই হবে। মিস্টার ভাদুড়ীকে সেই দিন দেখেই বুঝেছিলাম—আসলে তিনি নিমিত্ত মাত্র, পেছনে থেকে যে-শক্তি তাঁকে উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে ঠেলে দেবে, সে-শক্তি তাঁর সহধর্মিণী। আর, সত্যি কথা বলতে কি, এমন সহধর্মিণীই বা ক'জন পায়!

মৃদুলা দেবী বলেছিলেন—তুমি রোজ আসবে, বুঝলে? তোমাকে আমি সি-গ্রেড পাইয়ে দেব—

BanglaBook.org

বলেছিলাম—মিস্টার ভাদুড়ী যদি ইচ্ছে করেন তো হতে পারে—

শুনে মিসেস ভাদুড়ী বলেছিলেন—ওঁর কথা ছেড়ে দাও, ওঁর দ্বারা হবে না, আমি নিজে করে দেব—

তারপর আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন—আচ্ছা, বলো তো, এখানকার গণ্যমান্য লোক কে কে আছে? মানে যারা আসল ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক?

আমি নাম করেছিলাম সকলেরই। ডি-টি-এস্ গাঙ্গুলী, ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার মিস্টার মেটা। রেণ্ট কণ্ট্রোলার মিস্টার ফারুক, য়্যাডিশন্যাল ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার জয়শোয়াল। আমি সামান্য কেরানী, আমার বিদ্যেয় যতখানি কুলোয়, ততখানি খবর আমি দিয়েছিলাম। সেইটুকুতেই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন শ্রীমতী মৃদুলা দেবী। আর তার বেশী তাঁর দরকারও হয়নি।

বলেছিলেন—ব্যস্, ব্যস্, ওতেই আমার কাজ হয়ে যাবে—

তারপর অনেক রাত্রে যখন ওঁরা শোবার উদ্যোগ করছিলেন তখন আমি চলে এসেছিলাম।

দরজার কাছে আসতেই শ্রীমতী মৃদুলা দেবী বলেছিলেন—আর শোন—

আমি ফিরে দাঁড়াতেই মৃদুলা দেবী বলেছিলেন—আর একটা কথা, তুমি আমাকে কী বলে ডাকবে?

আমি যে কী বলে ডাকবো মৃদুলা দেবীকে, তা নিয়ে তখনও কিছু ভাবিনি। বললাম—কী বলে ডাকবো বলুন?

—তুমি যেন ওই সব 'মাসীমা', 'বৌদি', 'কাকীমা' এ-সব বলে ডেকো না, ও-সব শুনলে আমার গা-জ্বালা করে, তুমি আমাকে মিসেস ভাদুড়ী বলে ডাকবে, বুঝলে?

সি-গ্রেড অবশ্য তখন আমি পাইনি। মিসেস ভাদুড়ী কথা দেওয়া সত্ত্বেও পাইনি। তার জন্যে তখন আমার দুঃখ থাকলেও এখন আর নেই। কিন্তু লাভ হয়েছিল অন্য দিক থেকে। লাভ হয়েছিল এই যে আমি শ্রীমতী মৃদুলা দেবীর মত একজন স্ত্রীলোককে দেখতে পেয়েছিলাম। তাঁর সাক্ষাৎ সম্পর্কে এসেছিলাম। তাঁকে না দেখলে আমার মানুষ দেখা যে অসম্পূর্ণ হতো!

নিজের অতীত জীবনের কথা মৃদুলা দেবী বরাবর চাপা দিয়েই রাখতেন। কিন্তু জানতে পেরেছিলাম অন্য সূত্র থেকে। খড়্গপুরের একজন ছেলে তাজপুরে এসেছিল কয়েকদিনের জন্যে। হোটেলে খেতে বসে তার সঙ্গে দেখা।

সে বললে—ওরে বাবা, মিস্টার ভাদুড়ীর মেয়েকে পড়াস? তা মাইনে তো তুই পাবি না—

বললাম—মাইনে পাবো না তা জানি, তবে যদি গ্রেড্‌টা পাই—

সে বললে—তাও পাবি না—

বলে আমার কাছে সরে এল। বললে—তবে পুরো হিস্ট্রিটা শোন্—

পুরো হিস্ট্রিটা তার কাছেই প্রথম শুনি। শ্রীমতী মৃদুলা দেবীরা আসলে রাজসাহীর লোক। রাজসাহীতেই মৃদুলা দেবীর জন্ম। শেষজীবনে মৃদুলা দেবীর বাবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি থেকে রিটায়ার করেছিলেন ওই রাজসাহী থেকেই। রায়বাহাদুর হয়েছিলেন। রাজসাহীতেই চারতলা বাড়ি করেছিলেন, বাগান করেছিলেন, পুকুর, খেলার মাঠ সব কিছু করেছিলেন। রাজসাহীর লোকেরা বলতো—'রাজবাড়ি', 'রাজবাড়ি'র রাজকন্যা ছিল দুজন। বড়র নাম কুন্তলা আর ছোটর নাম মৃদুলা। দেখতে মৃদুলাকেই ভালো। তবু দুজনেই একসঙ্গে মানুষ।

BanglaBook.org

তখনকার দিনে মেমসাহেব গভর্নেস্ রেখে পড়েছে দুই মেয়ে। কুন্তলা দেখতে ভাল ছিল না কিন্তু টেনিস খেলতে পারতো, রাইডিং করতে পারতো, মোটর ড্রাইভিং করতো।

রায়বাহাদুরের তখন পয়সাও প্রচুর। ধান-জমি, ক্ষেত-খামার, পুকুরের মাছ, নানান দিক থেকে তাঁর প্রচুর আয় হচ্ছিল।

কুন্তলা সিনীয়ার কেম্ব্রীজ পাস করলো। রাজসাহীর সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক সপরিবারে সেদিন নেমন্তন্ন খেয়ে গিয়েছিল রাজবাড়িতে।

লোকে বলতো—রায়বাহাদুর, দুটি মেয়েই আপনার জুয়েল—

একজন বলেছিল—ছোট মেয়েকে আপনার বিলেত পাঠিয়ে দিন রায়বাহাদুর—

রায়বাহাদুর হেসেছিলেন। বলেছিলেন—বিলেতে পাঠাতে তো কিছু না, কিন্তু ওদের ছেড়ে থাকতে পারবো কি?

তা বটে! দুটি মেয়েই ছিল রায়বাহাদুরের চোখের মণি! ছেড়ে থাকতে পারতেন না এক মুহূর্ত! গভর্নেস্ ছিল, আয়া ছিল, চাকর-ঝি সবই ছিল। ছিল না শুধু মেয়েদের মা! রায়বাহাদুরের স্ত্রী গত হয়েছিলেন যখন মৃদুলা দেবী পাঁচ বছরের। সেই থেকে রায়বাহাদুর নিজে মেয়েদের শিক্ষা-সহবত সব শেখাতেন। ভাল বই কিনে দিতেন। সাঁতার শেখার জন্যে পুকুরের চারধারে উঁচু পাঁচিল গেঁথে দিয়েছিলেন। ঘোড়ায় চড়বার জন্যে বর্মা থেকে পণি কিনে এনেছিলেন একজোড়া। লাইব্রেরী করেছিলেন বাড়িতে। নিজের হাতে মোটর চালানো শিখিয়েছিলেন। মানুষের দ্বারা যা কিছু সম্ভব সবই করেছিলেন।

বন্ধু-বান্ধবরা বলতো—বিলেত পাঠালে আপনার মেয়েদের পক্ষে ভালো হতো।

—তা তো ভালো হতো জানি, কিন্তু আমি বাঁচবো কী নিয়ে?

—তা আপনি কি চিরকাল বেঁচে থাকবেন রায়বাহাদুর? মেয়েদের ভবিষ্যৎ দেখতে হবে না?

—ইণ্ডিয়ায় মানুষ হলে কি ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যায়? সবাই তো আর সরোজিনী নাইডু হবে না—

—তা কা'র মধ্যে কী গুণ আছে কে বলতে পারে? তরু দত্তর ব্যাপারটা দেখুন না, ফরাসী ভাষায় উপন্যাস লিখে ফেলেছিল বাঙালীর মেয়ে হয়ে! আর তা ছাড়া বিয়ে হলে তো একদিন শ্বশুরবাড়িতে যাবেই, তখন তো আর আটকে রাখতে পারবেন না নিজের কাছে!

কথাটার যুক্তিটা শেষের দিকে বুঝেছিলেন রায়বাহাদুর। একদিন মেয়েদের জিজ্ঞেস করেছিলেন—হ্যাঁ রে, তোরা বিলেত যাবি?

কুন্তলা বলেছিল—যাবো—

রায়বাহাদুর জিজ্ঞেস করেছিলেন—আমাকে ছেড়ে থাকতে তোদের কষ্ট হবে না তো?

কুন্তলা একটু লাজুক প্রকৃতির ছিল। সে কিছু উত্তর দেয়নি।

কিন্তু মৃদুলা বলেছিল—আমার কোনও কষ্ট হবে না বাবা তোমাকে ছেড়ে থাকতে—আমি যাবো—

মৃদুলাই ছিল দুই মেয়ের মধ্যে বেশি স্মার্ট। বেশি সুন্দরী। লন্-টেনিসে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল একবার ঢাকায়। পিং-পং খেলায় ডিস্ট্রিক্ট-মেডেল পেয়েছিল। রাইডিং-এ দিদিকে হারিয়ে দিত। কুন্তলার ঘোড়া যখন জোড়কদম দৌড়চ্ছে, তখন মৃদুলার ঘোড়া এক-ফারলং দূরে। কমিশনার সাহেব নিজে হ্যাণ্ড্-শেক্ করে কন্গ্রাচুলেট করেছিল মৃদুলাকে তার টেনিস খেলা দেখে। গভর্নেস্ মিস্ হথর্ন

BanglaBook.org

বলতো—সি ইজ্ এ জিনিয়াস—

সত্যিই, তখন সবাই জানতো, সবাই বিশ্বাস করতো মৃদুলার ভবিষ্যৎ বেশি উজ্জ্বল, বেশি ব্রাইট্। কুন্তলার চেয়েও ব্রাইট্।

রায়বাহাদুরও বলতেন—মৃদুলার জন্যে তো আমি ভাবি না—ও জীবনে সাইন করবেই—

সত্যিই রায়বাহাদুরের বড় ভাবনা ছিল বড় মেয়ে কুন্তলার জন্যে। বড় লাজুক, বড় অল্পতে কাতর, বড় সহজে কেঁদে ফেলতো।

মৃদুলা বার বার কথায় কথায় বলতো—তোর কিছু হবে না দিদি—

কুন্তলাও শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে তার কিছু হবে না। যে-মেয়ে বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারে না, যে-মেয়ে ছোট বোনের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়তে পেছিয়ে পড়ে, সে-মেয়ের কিছু যে হবে না তা সহজেই ধরে নেওয়া চলে। রায়-বাহাদুরও তাই ধরে নিয়েছিলেন।

প্রথম দিকে কুন্তলার পাত্র যোগাড় করতে কষ্ট হয়েছিল। অনেক বড় বড় সম্বন্ধ এসে ফিরে যেত। কেন যে ফিরে যেত তারা, তা বোঝা যেত না। বড়লোকের এক-মাত্র ছেলের মা-বাবা এমন কি পাত্র নিজে এসে দেখেও শেষকালে আর কোনও উচ্চবাচ্য করেনি। রায়বাহাদুর টাকার কমতি করেননি। পণের ব্যাপার নিয়েও টানা-হ্যাঁচড়া করেননি। পাত্র-পক্ষের দাবী-দাওয়া সমস্তই মেটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষকালে তিনি আসল কথাটা বুঝতে পারলেন। একজন পাত্রপক্ষ স্পষ্টই বলে ফেললেন—আপনার ছোট মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করুন না—

রায়বাহাদুর বললেন—বড় মেয়ের বিয়ে না দিয়ে ছোট মেয়ের বিয়ে কী করে দিই বলুন—?

তাঁরা বলতেন—তা বড় মেয়ের বিয়ে আপনি দিয়ে নিন, ততদিন না হয় আমরা অপেক্ষা করবো—

শেষকালে এক পাত্র জুটলো। বাপ পাটনা হাইকোর্টের মস্ত বড় অ্যাড্-ভোকেট। তাঁরই ছেলে। ছেলেও অ্যাড্ভোকেট হয়েছে। তবে নতুন। আস্তে আস্তে বাপের মক্কেলগুলো পাবে একদিন। সেই আশায় বিয়ে দেওয়া। তা-ও কুন্তলার কপাল! কপালের ওপর ভরসা করেই রায়বাহাদুর কুন্তলার সঙ্গে পাটনা হাই-কোর্টের অ্যাড্ভোকেটের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

মৃদুলা তখনই নাক সিঁটকেছিল।

বলেছিল—ছি ছি, শেষকালে কি না তুই উকীলের বউ হলি দিদি—

কুন্তলা বলেছিল—উকীল না তো, উকীল কে বললে, অ্যাডভোকেট—

মৃদুলা বলেছিল—ওই একই কথা হলো, যার নাম চাল-ভাজা তারই নাম মুড়ি—

রাজসাহীর লোকেরাও একটু গুঞ্জন তুলেছিল। আই-সি-এস্ গেল, বি-সি-এস্ গেল, আই-পি-এস্, ব্যারিস্টার, ডাক্তার ইন্জিনীয়র গেল—শেষকালে সেই উকীল! রায়বাহাদুরের তাড়াহুড়ো করবার কীসের দরকার ছিল। অত ভাল মেয়ে, শেষ-কালে পড়লো এক উকীলের হাতে! অ্যাড্ভোকেট আর উকীল তফাৎটা কি! আর তাছাড়া কুন্তলা দেখতে এমন কিছু ফ্যাল্না নয় যে জলে ফেলে দিতে হবে! আর বয়েস ই বা এমন কী হয়েছে যে এখুনি যার-তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে না ফেললে আর চলছে না।

যাহোক বিয়ে-থা হয়ে গেল। জামাই দেখে কেউ আহা-মরিও করলে না। যেমন পুরুষ-মানুষের পাঁচ-পাঁচী চেহারা হয়, তেমনি আর কি! নিতান্তই সাদা-

BanglaBook.org

সিধে চেহারা। রং কালোই বলতে হবে। দুই কালোয় মিলে ছেলেমেয়ে যা হবে তা হয়ত (ভগবান না করুন) রক্ষে-কালীর বাচ্ছার সামিলই হবে! তখন বুঝবে ঠেলা।

এসব কথা রায়বাহাদুরের কানেও গেল। তিনি তখন বেশ বৃদ্ধ। টাকা থাকলে কী হবে, টাকায় তো আর বয়েস কমানো যায় না, যৌবনের তেজও ফিরিয়ে পাওয়া যায় না। তিনি শুনলেন আর মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখলেন। কুন্তলার কানেও গেল কথাগুলো। বাসর-ঘরের টীকা-টিপ্পনী হাসি-ঠাট্টার মধ্যেও কথাটা আর চাপা রইল না।

শেষে যখন মৃদুলার বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগল তখন রায়বাহাদুর একটু সজাগ হলেন।

ভাবলেন এবার অনেক ভেবে-চিন্তে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে।

মৃদুলাকে বললেন—হ্যাঁ মা, এঁদের তোর পছন্দ?

মৃদুলা বললে—কাদের কথা বলছো?

—এই যাঁরা দেখতে এসেছিলেন আজ? এঁদের অবস্থা খুব ভাল, অনেক পুরুষের জমিদার, ছেলেটি বড় মেধাবী, এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে ইংরেজীতে, চাকরি করবার দরকারই হয়নি কোনওদিন, ও-বংশের কেউ কখনও চাকরিই করেনি—

মৃদুলা শুনছিল।

রায়বাহাদুর আবার বলতে লাগলেন—বড় চমৎকার স্বাস্থ্য মা, আর বড় সুন্দর মুখশ্রী, স্বভাব-চরিত্র একেবারে শিশুর মত পবিত্র—

মৃদুলা তখনও শুনে যাচ্ছিল বাবার কথাগুলো।

রায়বাহাদুর তারপর বলেছিলেন—আর তাছাড়া আমার বড় সাধ মা যে তুমি আমার কাছে কাছে থাকো। কুন্তলা কোথায় কতদূরে চলে গেল, তোমার বিয়েটা আর দূরে দিতে চাই না। তোমরা দুজনেই দূরে চলে গেলে আমি বুড়োমানুষ কী করে বাঁচবো?

শেষকালে তাই-ই ঠিক হলো। কথা দেওয়া হলো ভাদুড়ী-বংশের কর্তাকে। তারপর এক শুভদিন দেখে মিস্টার ভাদুড়ী এলেন বিয়ে করতে।

তা যেমন চেহারা, যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি রূপ! ছোট জামাই-এর রূপ দেখেই রাজসাহীতে ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

লোকে বললে—হ্যাঁ, রায়বাহাদুর এবার জামাই করেছেন বটে—

যেমন বিদ্বান, তেমনি নম্র স্বভাব। যে-দু'দিন জামাই ছিল শ্বশুরবাড়িতে, জামাই-এর ব্যবহারে সমস্ত পরিবার মুগ্ধ হয়ে গেল।

মৃদুলারও যেন অহঙ্কারের শেষ ছিল না। সত্যিই মিস্টার ভাদুড়ী তখন বড় চমৎকার দেখতে ছিলেন। পাকা আমের মতন ফরসা গায়ের রং। মিষ্টি ব্যবহার, শান্তশিষ্ট স্বভাব। বড় জামাই আর ছোট জামাইতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ!

রায়বাহাদুর মেয়ের শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় বলে দিয়েছিলেন—লোকে তো সবাই ধন্য ধন্য করছে, আমার যথাসাধ্য আমি করেছি, এখন মা তোমার কপাল—আমি কপাল মানতুম না মা, কিন্তু কুন্তলার বিয়ে দেওয়ার পর থেকে কপাল মানতে আরম্ভ করেছি—

মৃদুলা বলেছিল—আপনি মিছিমিছি ভাবছেন বাবা, আমারও বুদ্ধিসুদ্ধি হয়েছে, আমাকেও তো লেখাপড়া শিখিয়েছেন আপনি—

তা, এই-ই হল আদি ইতিহাস! আদি ইতিহাসের একেবারে গৌরচন্দ্রিকা!

BanglaBook.org

গৌরচন্দ্রিকার পর যখন মূল পালা আরম্ভ হলো তখন দু'বছর কেটে গেছে। পদ্মার জল বেড়েছে। জল বেড়ে ডাঙা আক্রমণ শুরু করেছে ভাদুড়ী-বংশের বাস্তু-বাড়িটা থেকেই। প্রথমে নাটমন্দিরটা ভাঙলো, তারপর দরদালান। তারপর দেউড়ি। তারপর চণ্ডীমণ্ডপ। তখন আর কেউ সাহস করলে না। একে একে সরতে আরম্ভ করলে। সরতে সরতে শেষকালে একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। খবরের কাগজে লেখালেখি হলো। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সরেজমিনে তদন্ত করতে এলেন। সদরে রিপোর্ট গেল। সেই ফাইল কলকাতায় এল। সেখান থেকে দিল্লীর খাস-দরবারে। যখন নিষ্পত্তি হলো মামলার, তখন ভাদুড়ী-বংশের আর একজনও সেখানে নেই। ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। কেউ ঢাকায়, কেউ ময়মনসিং-এ, কেউ ইউ-পি'তে। মৃদুলা ভাসতে ভাসতে গিয়ে কলকাতায় পৌঁছেছিল, সেইখানেই হাতের কাছে রেলের চাকরি একটা পাওয়া গেল। তাইতেই ঢুকে পড়লেন মিস্টার ভাদুড়ী। ছোট চাকরি, তা হোক। চিরকাল যে ছোট চাকরিতেই থাকতে হবে তার কোনও মানে নেই।

মৃদুলা বুঝিয়েছিল—তুমি ঢোকই না, তারপর আমি তো আছিই—

যখন হয়, তখন এমনি করেই বোধহয় হয়। যখন ঘটনা ঘটে তখন এমনি করেই বোধহয় ঘটে। সব আশা-আকাঙ্ক্ষা সব উদ্যম-উদ্দীপনা ওলট-পালট করে দিয়েই ঘটে!

তখন রায়বাহাদুর মারা গেছেন। তাঁর সম্পত্তির অংশ নিয়ে খুড়তুতো জ্যাঠ-তুতো ভাইয়েরা মামলা-মোকদ্দমা শুরু করে দিয়েছে। মৃদুলা একবার ভেবেছিল রাজসাহীতে গিয়ে উকীল-মোক্তার লাগাবে। পাটনায় দিদিকে চিঠিও লিখেছিল একটা। কিন্তু সেখান থেকে কোনও গা আসেনি।

জামাইবাবু তখন অ্যাড্‌ভোকেট থেকে মুন্সেফ হয়ে গেছে। তারপর সেইখান থেকে প্রমোশন পেয়ে পেয়ে অ্যাডিশনাল জজ হয়েছে।

দিদি লিখেছিল—তুই যদি কিছু পারিস তো করিস, তোর জামাইবাবু এখন কোর্টের কাজে বড় ব্যস্ত, তাঁর মোটেই সময় নেই—

মৃদুলা দেবী মিস্টার ভাদুড়ীকেও একবার বলেছিলেন। তা মিস্টার ভাদুড়ীর তখন নতুন চাকরি। হেড্ অফিসে সামান্য কেরানীর চাকরি!

তিনি বলেছিলেন—আমি তো এখন ছুটি পাবো না—

তখন অত গা করেননি মৃদুলা দেবী। তারপর সে সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই থেকেই মৃদুলা দেবী বুঝেছিলেন যে তাঁকে যদি পূর্ব-গৌরব ফিরে পেতে হয় তো তাঁকে নিজেকেই কোমর বাঁধতে হবে।

সেইদিন থেকেই তাঁর সাধনা শুরু হলো।

স্বামীকে একদিন বললেন—এত লোকের মাইনে বাড়ে আর তোমার বাড়ে না কেন?

মিস্টার ভাদুড়ী আম্‌তা আম্‌তা করে বলেছিলেন—বাড়ে তো!

মৃদুলা দেবী বলেছিলেন—বছরে পাঁচ টাকা করে বাড়াকে কি মাইনে বাড়া বলে?

তারপর জিজ্ঞেস করেছিলেন—তোমাদের সাহেব কে? সাহেবের নাম কী? যে-সাহেব মাইনে বাড়াবার কর্তা?

মিস্টার ভাদুড়ী বলেছিলেন—জেন্‌কিন্‌স্ সাহেব।

তারপর মৃদুলা দেবী খোঁজখবর নিতে লাগলেন নিজেই। টাকা ধার করে ভাল সিল্কের শাড়ি কিনলেন, ভাল দামী জুতো কিনলেন। বাবার পরিচয় দিয়ে আলি-

BanglaBook.org

পুর কোর্টের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট লিওপোল্ড্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন তাঁর ঠিকানায়। লিওপোল্ড সাহেব বাবার পুরোনো মনিব। বাবা তাঁর আণ্ডারে কাজ করেছিলেন অনেকদিন। লন্-টেনিসের চ্যাম্পিয়নশিপ্ মেডেলটা তিনিই হাতে করে দিয়েছিলেন একদিন মৃদুলা দেবীকে। সে-সব কথাও মনে করিয়ে দিলেন।

সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—তোমার ব্রাদার-ইন্-ল এখন কী করছে?

মৃদুলা দেবী বললেন—তিনি পাটনা হাইকোর্টের জজ্ এখন—

—আর তোমার হাস্ব্যান্ড্?

—তিনি রেলওয়েতে পুয়োর ক্লার্ক—সেই জন্যেই তো আপনার কাছে এসেছি স্যার, আপনি যদি জেন্কিন্স্ সাহেবকে একটা চিঠি দিয়ে দেন তো আমার বড় উপকার হয়।

সেই লিওপোল্ড্ সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন জেন্কিন্স্ সাহেব। এক-সঙ্গে রেস-কোর্সে যান, একসঙ্গে রোটারী ক্লাবের মেম্বার দুজনেই।

মৃদুলা দেবী একদিন একেবারে লিওপোল্ড সাহেবের চিঠি নিয়ে জেন্কিন্স্ সাহেবের খাস-বাঙলোয় গিয়ে হাজির।

জেন্কিন্স্ সাহেব সব শুনেটুনে বললেন—কিন্তু আমি কী করতে পারি মিসেস ভাদুড়ী?

মৃদুলা দেবী বললেন—আপনি সব করতে পারেন স্যার, আপনি তো আমার হাস্ব্যান্ডের বস্, আপনার হাতেই আমার হাস্ব্যান্ডের উন্নতি-অবনতি নির্ভর করছে—

মৃদুলা দেবীর কথাবার্তা, চালচলন, হাবভাব, ইংরিজী উচ্চারণ দেখে জেন্-কিন্স্ সাহেব বিগলিত হয়ে গিয়েছিলেন। তার ওপর ছিল ডিস্ট্রিক্ট 'ম্যাজিস্ট্রেট লিওপোল্ড' সাহেবের চিঠি। তারই বন্ধু রায়বাহাদুরের মেয়ে।

জেন্কিন্স্ সাহেব অনেক ভিবেচিন্তেই বললেন—আমি যদি হঠাৎ তোমার হাস্ব্যান্ডের প্রমোশন দিয়ে দিই তো হেড-অফিসের স্টাফের মধ্যে খুব হৈ-চৈ বাধবে, খুব কমোশনের সৃষ্টি হবে,—তার চেয়ে এক কাজ করো মিসেস ভাদুড়ী—

মৃদুলা দেবী উদ্গ্রীব হয়ে বললেন—বলুন স্যার কী কাজ?

সাহেব বললেন—তোমার হ্যাস্ব্যান্ডকে দিয়ে ডিস্ট্রিক্ট-এ ট্রান্সফার-এর জন্য একটা দরখাস্ত দিতে বলো আমার কাছে—আমি যেখানে ভেকেন্সি পাবো সেই-খানেই প্রমোশন দিয়ে পাঠিয়ে দেব—

মৃদুলা দেবী অত সহজে ছাড়বার পাত্রী নন।

বললেন—স্যার, আপনি ওঁকে গেজেটেড্ পোস্টে প্রমোশন দিলে বড় ভালো হতো—গেজেটেড্ পোস্ট না-হলে আমাদের প্রেস্টিজ আর থাকে না—আমার বাবা রায়বাহাদুর ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের একজন মস্তবড় লয়্যাল অ্যান্ড ফেথফুল সার-ভেন্ট্ ছিলেন, সারা জীবন তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মর্যাদা আপ্হোল্ড করে গেছেন—

জেন্কিন্স্ সাহেব বললেন—তা বুঝতে পারছি মিসেস ভাদুড়ী, কিন্তু হঠাৎ তো গেজেটেড্ পোস্ট দেওয়া যায় না, ধাপে ধাপে দিতে হয়, নইলে আসেম্-ব্লিতে কোশ্চেন উঠবে—

শেষ পর্যন্ত কথা আদায় করে এনেছিলেন মৃদুলা।

প্রথমে খড়্গপুরে হেড্ ক্লার্ক হয়ে এলেন মিস্টার ভাদুড়ী।

মৃদুলা দেবী ধুতি-পাঞ্জাবি ছাড়িয়ে কোট প্যান্ট পরিয়ে ভাদুড়ী মশাইকে

BanglaBook.org

মিস্টার ভাদুড়ী করলেন। স্যুট্, টাই, হ্যাট্ পরালেন। চুরুট ধরালেন।

প্রথমে চুরুট খেতে চাননি মিস্টার ভাদুড়ী। বরাবর ভাল ছেলে ছিলেন তিনি। মাথার চুলে টেরি পর্যন্ত কাটেননি ছাত্র-জীবনে। চা খাননি, পান খাননি। মিথ্যে কথা বলেননি। জীবনে কখনও স্বপ্নেও ভাবেননি যে তাঁকে একদিন আবার চাকরি করে খেতে হবে! বরাবর বাবা-মা-ঠাকুর্দা-ঠাকুমার কাছে আদরে মানুষ। তিনি জানতেন শুধু সততা, জানতেন শুধু আত্মবিশ্বাস, জানতেন নিষ্ঠা থাকলে সাফল্য একদিন অনিবার্য! বিদ্যাসাগরের লেখা 'বোধোদয়'-এর কথাগুলোই বেদ-বাক্য বলে মেনে এসেছেন। জানতেন—যে সত্য কথা বলে সকলে তাহাকে ভালবাসে। যে চুরি করে সকলে তাহাকে ঘৃণা করে। তিনি বিশ্বাস করতেন—সদা সত্য কথা বলিবে। মিথ্যা কথা বলা বড় দোষ! কিন্তু চাকরিতে ঢোকার পর তাঁর আজীবনের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সমস্ত যেন গোলমাল হয়ে গেল। দেখলেন—মিথ্যে কথা বললেই চাকরিতে উন্নতি হয়। কাজে ফাঁকি দিলেই প্রমোশন হয়। পেছনে কেউ না থাকলে উন্নতি হয় না। শুধু মন দিয়ে কাজ করলেই হয় না, কাজ যে সত্যিই করা হচ্ছে তা ওপরওয়ালাদের কাছে জানাতেও হয়। দরকার হলে তোষামোদ, চাটুকারীতাও করতে হয়। তিনি দেখলেন—বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়'-এর সঙ্গে কোনও কিছু মিলছে না পৃথিবীর!

তবু চিরদিনের স্বভাব যাবে কোথায়?

বললেন—চুরোট মুখে দিলে কেমন যেন বমি-বমি আসে আমার—

মৃদুলা দেবী বললেন—তা আসুক, অভ্যেস করতে করতে সবই সহ্য হয়ে যাবে—

—কিন্তু চুরোট খেলেই কি আমার মাইনে বাড়বে?

মৃদুলা দেবী বললেন—বেশি কথা বোল না, যা বলছি শোন, চুরোট খেলে পার্সোন্যালিটি বাড়ে তা বোঝ না?

কথাটার মধ্যে কোথায় যে যুক্তি আছে তা তিনি বুঝতে পারলেন না। তবে যখন দেখলেন যে স্ত্রীর চেষ্টাতেই তাঁর প্রমোশন হলো, তখন আপত্তি করলেন না। তিনি চুরোট ধরলেন। শুধু চুরোট নয়। কোট, প্যান্ট, নেকটাই, সু, মোজা, হ্যাট—সবই ধরলেন। অনেক দিন ধরে চেষ্টা করার পর মৃদুলা দেবী মিস্টার ভাদুড়ীকে নিজের হাতে টাই বাঁধতে শেখালেন।

খড়্গপুরে গিয়েই চিঠি লিখেছিলেন পাটনায় দিদিকে।

লিখেছিলেন—তুই বোধহয় শুনে খুশি হবি দিদি, ইনি খড়্গপুরে বদলি হয়েছেন সুপারভাইজার হয়ে।

কুন্তলাও খুশি হলো খুব। সে লিখলে—মিস্টার ভাদুড়ীর প্রমোশনের খবর শুনে খুশি হলাম—এটা কি গেজেটেড্ পোস্ট?

বলা বাহুল্য, এ-প্রশ্নের উত্তর আর যায়নি পাটনায়।

কিন্তু মনটা সেই থেকেই খচ্ খচ্ করতে লাগলো মৃদুলা দেবীর। সবই হলো, কিন্তু তবু যেন কিছুই হলো না। যেন সব থেকেও কিছু নেই। কলোনীতে বেড়াতে যান, কিন্তু গেজেটেড্ অফিসারদের বউদের যে-ভাবে খাতির করে লোকে, সে-ভাবে খাতির করে না মৃদুলা দেবীকে।

লোকে বলতো—ভাদুড়ী-গিন্নি!

কথাটা ভালো লাগতো না মৃদুলা দেবীর। মনঃপূত হতো না। মনে হতো মিসেস ভাদুড়ী বলে সবাই কবে ডাকবে তাঁকে! কবে একখানা গাড়ি হবে! কবে নিজে গাড়ি চালিয়ে যেতে পারবেন দোকানে জিনিসপত্র কিনতে! শপিং করতে! হাঁটতে হাঁটতে ঘেমে যায় শরীর—তখন পাউডার লিপ্স্টিক্ সব ধুয়ে মুছে

BanglaBook.org

একাকার হয়ে যায়। মনে হয়—এত যে সুইমিং শেখা, এত যে রাইডিং, এত যে টেনিস্ খেলা—সব যেন ব্যর্থ হয়ে গেল! গেজেটেড্ অফিসারের স্ত্রী না হলে যেন সব বে-মানান! সব ইউজলেস্!

তখন আবার ছুটলেন কলকাতায় জেন্‌কিন্‌স্ সাহেবের কাছে।

—ইয়েস, তোমার জন্যে কি করতে পারি মিসেস ভাদুড়ী?

মৃদুলা দেবী বললেন—আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন্ করেছিলাম, পেয়েছেন স্যার?

—তুমি অ্যাপ্লিকেশন করেছো?

—আমি না, মিস্টার ভাদুড়ী। আপনি বলেছিলেন গেজেটেড্ পোস্ট দেওয়া হবে পরে, তাই আপনাকে একবার মনে করিয়ে দিতে এসেছি স্যার।

সাহেব বললেন—আমি দিল্লীর বোর্ডে লিখেছি মিস্টার ভাদুড়ীর জন্যে—এখনও কোন জবাব আসেনি—

মৃদুলা দেবী বললেন—কিন্তু আর কতদিন ওয়েট্ করবো স্যার, ততদিনে যে আমি বুড়ী হয়ে যাবো—

সাহেব বোধহয় ব্যস্ত ছিলেন, বললেন—আচ্ছা, দেখি আমি কী করতে পারি।

তা খড়্গপুরে খুব খারাপ কাটেনি মৃদুলা দেবীর। খড়্গপুরে থাকতেই ডলি হয়েছিল। খড়্গপুরে সব মহলেই বেশ মেলা-মেশা চেনা-শোনা হয়েছিল। সবাই জেনে গিয়েছিল—মিসেস ভাদুড়ী সম্ভ্রান্ত রায়বাহাদুর-কন্যা। মিসেস ভাদুড়ী রাইডিং জানেন, সুইমিং জানেন, টেনিস্ খেলতে জানেন,—ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বলতেন—ও-সব জানলে কি হবে, আসলে সবাই জানে আমি হেড্ ক্লার্কের বউ—

মিস্টার ভাদুড়ী সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পেতেন না। বোকার মত শুধু চুপ করে থাকতেন।

তা জেন্‌কিন্‌স্ সাহেব থাকলে হয়ত গেজেটেড্ পোস্ট পেতে দেরি হতো না মিস্টার ভাদুড়ীর। তিনি তো কথাও দিয়েছিলেন মিসেস ভাদুড়ীকে।

কিন্তু কী যে হলো!

তিন দিনের জ্বরে হঠাৎ জেন্‌কিন্‌স্ সাহেব মারা গেলেন। তারপর লোয়ার সার্কুলার রোডের কবরখানায় তাঁকে কবরও দেওয়া হয়ে গেল।

খবর যখন খড়্গপুরে পৌঁছুলো, তখন বেলা এগারোটা।

তখনও খাওয়া হয়নি মৃদুলা দেবীর। কিন্তু খবরটা শুনেই তিনি সেই যে শয্যাশায়ী হলেন, আর তিনদিন বিছানা ছেড়ে উঠলেন না। পিতৃশোকেও মৃদুলা দেবী এমন করে কাতর হয়ে পড়েননি।

মিস্টার ভাদুড়ী কয়েকবার সাহস করে তাগাদা দিলেন।

বললেন—ওগো, ওঠো, খাও—না-খেলে যে শরীর শুকিয়ে যাবে—

মৃদুলা দেবী ধমকে উঠলেন।

বললেন—তুমি থামো, তুমি আর কথা বোল না—তুমি যদি একটা মানুষের মত মানুষ হতে তো আমার ভাবনা—

মিস্টার ভাদুড়ী আর কথা বলবার সাহস পেলেন না, চুপ করে গেলেন।

কিন্তু মিস্টার ভাদুড়ী চুপ করলেও মৃদুলা দেবী চুপ করলেন না!

বললেন—একটা আস্ত জানোয়ারের হাতে আমায় তুলে দিয়েছেন বাবা, নইলে স্বামীর চাকরি নিয়ে কোনও স্ত্রী মাথা ঘামায়? আমাতে দেখেছ কাউকে পৃথিবীতে?

রাগ হলে আর জ্ঞান থাকতো না মৃদুলা দেবীর। খানিক পরে নিজের মনেই

BanglaBook.org

কাঁদতেন।

বলতেন—জেন্‌কিন্‌স্‌ সাহেব আর কিছুদিন পরে মারা গেলে কি ভাবতাম? না মাথা ঘামাতাম? তুমি যদি মানুষ হতে তো বুঝতে যে, জেন্‌কিন্‌স্‌ সাহেব মারা গিয়ে আমার কী সর্বনাশটা করে গেলেন!

তারপর সাতদিন মৃদুলা দেবী কালো শাড়ী কালো ব্লাউজ কালো সু পরেছিলেন।

মিসেস বাট্‌লিওয়ালা জিজ্ঞেস করেছিলেন—এ কালো ড্রেস কেন মিসেস ভাদুড়ী?

মৃদুলা দেবী বলেছিলেন—মিস্টার জেন্‌কিন্‌স্‌ আমার বাবা লেট্‌ রায়বাহাদুরের ফ্রেন্ড ছিলেন কিনা—খুব ইন্‌টিমেট্‌ ফ্রেন্ড ছিলেন।

জেন্‌কিন্‌স্‌ সাহেবের পর সেই জায়গায় এলেন—স্যামুয়েল সাহেব।

স্যামুয়েল সাহেব নতুন লোক। পুরোন সব কথা মনে করিয়ে দিতে হবে তাঁকে। দিল্লীর বোর্ডের কাছে যে-চিঠি লেখা হয়েছিল—তার কী হলো, তা-ও জানা দরকার।

আবার আসতে হলো মিস্টার লিওপোল্ডের কাছে।

আবার চিঠি নিলেন তাঁর কাছ থেকে। আবার দেখা করলেন স্যামুয়েল সাহেবের বাঙলোয়।

স্যামুয়েল সাহেব বললেন—আমি কী করতে পারি মিসেস ভাদুড়ী। দিল্লীর বোর্ডের এখনও কোন রিপ্লাই আসেনি।

মৃদুলা দেবী বললেন—কিন্তু লেট্‌ মিস্টার জেন্‌কিন্‌স আমাকে কথা দিয়েছিলেন স্যার—আমার লেট্‌ ফাদার রায়বাহাদুর ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের একজন স্টনচ্‌ সাপোর্টার ছিলেন, তিনি সারাজীবন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মর্যাদা আপ্‌হোল্ড্‌ করে গেছেন—তাঁর মেয়ে হয়ে যদি এই রকম সাফার করি—

অনেক কাকুতি-মিনতি করার পর স্যামুয়েল সাহেব বললেন—অল রাইট্‌, আমি মিস্টার ভাদুড়ীকে এখন তাজপুর জংশনে ট্রান্সফার করতে পারি, সেখানে হেড্‌ ক্লার্ক হয়ে তিনি যান এখন, তারপর ওখানে গেজেটেড্‌ পোস্ট একটা খালি হবে—সেখানে টেম্পোরারী অ্যাক্‌টিং করতে হবে—

তা তাই-ই সই, সেই ব্যবস্থাই হলো।

মিস্টার ভাদুড়ী আর মিসেস ভাদুড়ী মেয়ে ডলিকে নিয়ে তাজপুর জংশনে এসে হাজির হলেন। আর হাজির হবার দিনই আমার সঙ্গে ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে গেল।

সেইদিন থেকে আমি ডলির প্রাইভেট টিউটর হয়ে গেলাম।

কিন্তু যে-ছেলেটি আমাকে মৃদুলা দেবীর অতীত ইতিহাস বলেছিল তার কথা যে এমন বর্ণে বর্ণে ফলবে তা তখন বিশ্বাস করিনি!

কেউ ছুটি পাচ্ছে না দরখাস্ত করে, সে মিসেস ভাদুড়ীর কাছে এক সের রসগোল্লা কিনে দিয়ে এলেই ছুটি মঞ্জুর হয়ে যেত।

মিস্টার ভাদুড়ী য়্যাডিশন্যাল ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার জয়শোয়ালের গাড়িতে বাড়িতে নেমেই জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁগো, তোমাকে রসগোল্লা দিয়ে গেছে কেউ?

মৃদুলা দেবী বললেন—হ্যাঁ, কেন?

—তুমি বলেছিলে তাকে যে তার ছুটি স্যাংশন হবে?

—হ্যাঁ, বলেছিলাম, কেন, তাতে কী হয়েছে?

BanglaBook.org

—কিছু হয়নি, কিন্তু এরকম করলে যে অফিসের কাজ চালানো মুশকিল হয়ে পড়বে!

মৃদুলা দেবী এ ধরনের কথায় খুব রেগে যেতেন।

বললেন—রাখো তোমার অফিসের কাজ, তুমি না থাকলে কি অফিসের কাজ অচল হবে ভেবেছ? কারোর জন্যে কি কিছু অচল হয় পৃথিবীতে?

এর পরে আর কথা বলা চলে না। মৃদুলা দেবী যে মিস্টার ভাদুড়ীর চেয়েও বেশি কাজের লোক, তা মৃদুলা দেবী নিজেই প্রমাণ করে দিয়েছেন। মৃদুলা দেবীই নিজে চেষ্টা করে মিস্টার ভাদুড়ীর চাকরিতে প্রমোশন করিয়ে দিয়েছেন। তা আর অস্বীকার করবার কোনও উপায় নেই। তিনিই তাজপুর জংশনের সমাজে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন তাঁকে। বড় বড় গেজেটেড্ অফিসার তাঁর বাড়িতে রোজ আসেন, এসে টেবিলে বসে চা খান, আড্ডা দেন, গল্প করেন, তাঁদের গাড়িতে লিফ্‌ট্ দেন, এ সব কার জন্যে? কার জন্যে তিনি মিস্টার মেটার ফ্রেন্ড? কার জন্যে তিনি মিস্টার গাঙ্গুলীর ফ্রেন্ড? কার জন্যে তাঁকে মিস্টার ফারুক মিস্টার জয়শোয়াল এত খাতির করেন? আর তা ছাড়া দু'দিন বাদেই তো তাঁর গেজেটেড্ পোস্টে প্রমোশন হবে, মিস্টার স্যামুয়েল কথা দিয়েছেন মিসেস ভাদুড়ীকে—এ সবই বা কার জন্যে? কার জন্যেই বা তাঁর কোয়ার্টারের এত বাহার খুলেছে, স্পেশাল আলো বসেছে, স্পেশাল জল সাপ্লাই হচ্ছে—? সব তো মৃদুলা দেবীর জন্যে!

কিন্তু মনে মনে জানলেও মাঝে মাঝে তাঁর আর ভালো লাগতো না এই পরিশ্রম! এই অভিনয়।

এক-একদিন ইচ্ছে হতো মুড়ি খেতে! তাজপুর জংশনের মুড়ি খুব ভালো। ওয়াগন ভর্তি মুড়ি চালান হয় শালিমারে। অথচ দেশে থাকতে ছোটবেলায় আদা-কাঁচালঙ্কা দিয়ে কত মুড়ি খেয়েছেন মিস্টার ভাদুড়ী। এখানে সে সব নাম করতে পারেন না।

মৃদুলা দেবী বলতেন—রাখো, ওই বাটি করে মুড়ি খাওয়া আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না—শেষকালে কেউ দেখে ফেলুক আর কি—

তারপর একটু হেসে বলতেন—তোমার যত সব প্লিবিয়ান টেস্ট—

শুধু মুড়িই নয়, লুঙ্গি পরাও দেখতে পারতেন না মৃদুলা দেবী। মেঝের ওপর মাদুর পেতে শোয়াও দেখতে পারতেন না। প্রত্যেক দিন দাড়ি কামাতেও ভাল লাগতো না মিস্টার ভাদুড়ীর—কিন্তু মৃদুলা দেবীর ভয়ে তা-ও কামাতে হতো। কারণ সন্ধ্যে হতে-না-হতে যে কেউ এসে পড়তে পারে। সব সময় তৈরী হয়ে থাকতে হতো। একেবারে ফিট্‌ফাট্ পরিপাটি। যেখানে ফুলের ভাস্ থাকবার কথা সেখান থেকে নড়লে চলবে না। ঘরের প্রত্যেকটি জিনিস সাজানো গোছানো নিখুঁত। প্রথম প্রথম চাকর-ঝি বেশি রাখতে পারেন নি। নিজেই ভোরবেলা উঠতেন। উঠে সদর দরজায় খিল দিয়ে মাত্র একটা শায়া-ব্লাউজ পরে সারা ঘর-দোর পরিষ্কার করতেন। রান্নাঘরে গিয়ে তাড়াতাড়ি রান্না করে নিতেন। শাড়ি বেশি ছিলও না। যা দু'একখানা আটপৌরে শাড়ি ছিল তাই-ই সাবান দিয়ে ইস্ত্রী করে নিতেন। তারপর মিস্টার ভাদুড়ীকে অফিসের ভাতে-ভাত দিয়ে মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে দিতেন। সকাল বেলাটা ছিল ঝি-এর পোশাক। তখন কাউকেই বাড়িতে ঢুকতে দিতেন না। তখন দেখলে মনে হতো মধ্যবিত্ত হিন্দু-ঘরের কোনও বউ বুঝি। একহাতে উনুনে রান্না চাপিয়েছেন, আর একহাতে জানলার পর্দা রিপু করছেন। আবার কখনও বা টেবিল-চেয়ার ফার্নিচার সাফ করছেন নিজের হাতে। ফুলগুলো সাজিয়ে রাখছেন ফ্লাওয়ার ভাসে। তারপর বিকেলবেলার অতিথিদের জন্যে সিঙাড়া

BanglaBook.org

কচুরি নিমকি ভাজছেন। তারই মধ্যে আছে খবরের কাগজ পড়া, স্যাম্পু করা, নিজের শরীরের যত্ন নেওয়া। মিস্টার ভাদুড়ীকে টেলিফোন করে জেনে নেওয়া তিনি টিফিন খেয়েছেন কি না। যা ভুলো মানুষ, টিফিন খেতেই হয়ত ভুলে যাবেন।

আবার ঠিক সন্ধ্যেবেলা সেই মানুষটিকেই দেখলে কে বলবে ইনিই সেই সকালবেলার মৃদুলা দেবী! তখন তাঁর আমূল ভোল্ পাল্টে গেছে। তখন ফাঁপানো মাথার চুলে বব্ করা এফেক্ট, চোখে সুর্মার আলস্য, নখে নেল্পালিশ্, ঠোঁটে লিপ্স্টিক্, গালে ফেস্-পাউডার, মুখে কাঁচা-মিঠে হাসি।

তখন আল্গা ভাবে একটা সিগারেট ধরাবেন। আর হাতে একটা এম্ব্রয়ডারির কাজ।

তখন মিস্টার ভাদুড়ীকেও অফিসের কোট-প্যান্ট ছেড়ে নতুন একদফা সার্ট ট্রাউজার পরতে হবে। স্নান করতে হবে। দাড়ি কামাতে হবে, পাউডার লাগাতে হবে। আর মুখে চুরোট ধরাতে হবে!

আর ডলি?

আমি যতক্ষণ না যাই, ডলিও এক টেবিলে বসে চা খাবে, কেক্ খাবে, গল্প করবে।

ঠিক এমনি সময়ে যদি কেউ আসে তো দেখবে বড় শান্তির সংসার এটা। এ সংসারে অর্থাভাব নেই, এ সংসারে কোনও সমস্যা নেই, এ সংসারে প্রাচুর্য অপর্যাপ্ত, এ সংসার সুখে-শান্তিতে-আনন্দে-উপভোগে অনবদ্য!

মিস্টার ফারুক্ এসে পড়তেই মিসেস ভাদুড়ী মুখ তুলে হাসিতে অভ্যর্থনা করেন।

—আসুন মিস্টার ফারুক, আপনি অনেকদিন বাঁচবেন, আপনার কথাই আমি এখখুনি ভাবছিলাম!

সে মিস্টার ফারুকই আসুন কিংবা মিস্টার জয়শোয়ালই আসুন—ওই একই অভ্যর্থনা। সকলের কথাই তিনি সব সময়ে ভাবেন।

—মিসেস ভাদুড়ী, আপনার জন্য এই গোলাপ ফুলটা নিয়ে এলাম, নিন—

মিসেস ভাদুড়ী হাসিতে গদগদ হয়ে উঠবেন।

—ওঃ, কী চমৎকার ব্ল্যাক্-প্রিন্স! আপনি কী করে জানলেন মিস্টার ফারুক, যে আমি ব্ল্যাক্-প্রিন্স ভালবাসি?

মিস্টার ফারুক বলবেন—আপনাকে এতদিন ধরে দেখছি আর এটা জানবো না মিসেস ভাদুড়ী?

যেদিন মিস্টার জয়শোয়াল আগে আসেন, সেদিনও ওই।

মিস্টার জয়শোয়াল আসতেই মিসেস ভাদুড়ী বলবেন—আসুন মিস্টার জয়শোয়াল, আপনি অনেকদিন বাঁচবেন, আপনার কথা আমি এই এখখুনি ভাবছিলাম—

মিস্টার জয়শোয়াল বলবেন—মিসেস ভাদুড়ী, আপনার জন্যে এই আগ্রার ডালমুট এনেছি, নিন—

প্যাকেট্টা খুলে মিসেস ভাদুড়ী বলবেন—ওঃ, কী চমৎকার ডালমুট, আপনি কী করে জানলেন মিস্টার জয়শোয়াল যে আমি আগ্রার ডালমুট খেতে ভালবাসি?

মিস্টার জয়শোয়াল বলবেন—আপনাকে এতদিন ধরে দেখছি আর এইটুকু জানবো না মিসেস ভাদুড়ী?

তারপর চা খেতে খেতে সবাই মিলে গল্প হবে। মিস্টার ফারুক বলবেন—কী

BanglaBook.org

ওয়াণ্ডারফুল ম্যাচ্ করেছে আপনার শাড়িটা মিসেস ভাদুড়ী!

মিসেস ভাদুড়ী ঘাড় বাঁকিয়ে বলবেন—আপনার পছন্দ হয়েছে মিস্টার ফারুক?

—পছন্দ হবে না? আপনি যা পরবেন তাতেই মানাবে! কি বলুন মিস্টার ভাদুড়ী।

মিস্টার ভাদুড়ী বোকার মতন সমর্থন জানিয়ে ঠোঁট চিতিয়ে একটু হাসবেন—

মিসেস ভাদুড়ী বলবেন—ওঁর কথা ছেড়ে দিন—

মিস্টার ফারুক বলবেন—কেন, ওঁর কথা ছাড়বো কেন?

মিসেস ভাদুড়ী বলবেন—উনি হয়ত এখন অফিসের ফাইলের কথা ভাবছেন—

—তাই নাকি মিস্টার ভাদুড়ী, আপনি কি এখন অফিসের ফাইলের কথা ভাবছেন? আমরা তো অফিস থেকে বেরিয়ে ও-সব কথা আর ভাবিই না!

মিসেস ভাদুড়ী বলবেন—জানেন, এক-একদিন উনি ঘুমের মধ্যেও ফাইল-নাম্বার বলে ওঠেন, ঘুমোতে ঘুমোতেও উনি ফাইলের স্বপ্ন দেখেন—

—কী আশ্চর্য! তাই নাকি?

সবাই অবাক হয়ে যান মিস্টার ভাদুড়ীর ব্যাপার শুনে। সবাই বলেন—স্ট্রেনজ্, ভেরি স্ট্রেনজ্ ইনডীড্—খুবই আশ্চর্য কাণ্ড তো!

মিসেস ভাদুড়ী বলবেন—আরো কী করেন শুনবেন? উনি আমাকেই মাঝে মাঝে ভুল করেন, 'মোহর আলী' বলে ফেলেন—

—মোহর-আলী কে?

—ডি-টি-এস্ অফিসের চাপরাসী!

তখন হাসির রোল পড়ে যায় সভার মধ্যে। হাসতে হাসতে চায়ের কাপ উল্টে পড়ে। সে হাসি আর থামতে চায় না। রাস্তায় যারা হাসি শোনে, তারা হিংসে করে। তারা ভাবে কী সুখে আছে এরা, কী আনন্দেই আছে অফিসাররা। তারা হাসি শোনে আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। তারা কেউ কেউ অফিসের কেরানী, কেউ কেউ সি-গ্রেড ডি-গ্রেডের বউ!

ডি-গ্রেড করালীবাবুর বউ বলে—কী সুখেই আছে ভাই সব—! বেশ আছে ভাই ওরা—

সি-গ্রেড সতীশবাবুর বউ বলে—ও ভাই আমাদের কপাল, এই দেখ না এই মাইনেতে সাতটা ছেলে-মেয়ের ধকল সইতে সইতে আমি হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি—

ডি-গ্রেড করালীবাবুর বউ বলে—তা তো বটেই, সকাল থেকে রাঁধতে রাঁধতেই জীবন গেল, চুল বাঁধবারই সময় পাই না, তা পাউডার-স্নো-ক্রিম মাখবো কখন?

মিস্টার জয়শোয়াল, মিস্টার ফারুক, মিস্টার গাঙ্গুলী, মিস্টার মেটা অনেক রাত্রে ফিরে যান। তাস খেলতে খেলতে কখন যে সময় কেটে যায়, কেউ বুঝতেও পারেন না।

মিস্টার মেটা বলেন—আপনার কাছে এলে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যায় বুঝতেই পারি না মিসেস ভাদুড়ী—

তারপর বাইরে বেরিয়ে মিস্টার জয়শোয়ালকে বললেন—খুব হ্যাপি ফ্যামিলি, কী বলেন মিস্টার জয়শোয়াল?

সত্যিই, সবাই যে মিসেস ভাদুড়ীর পার্টিতে আসেন, তা মিসেস ভাদুড়ীর লোভে নয়। তাঁরা আসেন তার একমাত্র কারণ মিসেস ভাদুড়ী তাঁর হাসি দিয়ে, তাঁর কথা দিয়ে, তাঁর ব্যবহার দিয়ে সকলের সব দুঃখ ভুলিয়ে দেন। অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টার জন্যে সকলে নিজের নিজের সমস্যার কথা ভুলে থাকেন।

মিসেস গাঙ্গুলী একদিন জিজ্ঞেস করলেন—এই চুড়ির সেট গড়ালেন নাকি

BanglaBook.org

ভাই?

মিসেস ভাদুড়ী বললেন—ওমা, নতুন গড়াবো কেন, এ তো পুরোন—

—হীরে সেট্ করা বুঝি?

মিসেস ভাদুড়ী হো হো করে হেসে উঠলেন।

বললেন—হীরে? আপনি বলছেন কী মিসেস গাঙ্গুলী? আমি পরবো হীরে! হীরে কেনবার পয়সা কোথায় পাবো? হেড ক্লার্কের মাইনে কী তা তো জানেন—আমাদের তো গেজেটেড্ পোস্ট নয়!

মিসেস গাঙ্গুলী অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—তা হীরে নয় তো কী?

—কাচ! কাচের চুড়ি।

কাচও যে এত ভাল দেখাতে পারে তা মিসেস গাঙ্গুলীর জানা ছিল না। তারপর সেই মিসেস ভাদুড়ীকে ধরে আবার যে দোকানে পাওয়া যায় কাচের চুড়ি, সে দোকানে গেলেন। ঠিক সেই একই রকম কাচের চুড়ি কিনলেন মিসেস গাঙ্গুলী!

কিন্তু ঠিক মানালো না যেন তেমন। মিসেস ভাদুড়ীকে যেমন মানায় তেমন মানালো না। সত্যিই মিসেস ভাদুড়ীকে যেন সব কিছুতেই মানিয়ে যায়। সাদা আটপৌরে একখানা শাড়ি এলোমেলো করে পরলেও মনে হয় যেন সেজেগুজে ফিটফাট্ হয়েছে।

ডি-গ্রেড করালীবাবুর বউ বলে—দিনরাত ওই সাজগোজ নিয়েই আছে, তা মানাবে না কেন, বলো না!

সি-গ্রেড সতীশবাবুর বউ বলে—তা অত সাজগোজ কার জন্যে দিদি? ভাদুড়ী মশাই তো দেখি হাবা-গোবা মানুষ—

ডি-গ্রেড করালীবাবুর বউ বলে—ও হলো সেই রকম, সেই যে কথায় আছে না—'বর-কনের দেখা নেই শুক্কুরবারে বিয়ে—'

এ সব কথা মিসেস ভাদুড়ীর কানে যাবার কথা নয়। কানে গেলেও কিছু পরোয়া করবার মানুষ নন তিনি। মৃদুলা দেবী তখন রোজ পার্টি নিতে ব্যস্ত। বাজে কথা শোনবার সময় নেই তাঁর। পাটনায় দিদি জজের বউ হয়েছে—মৃদুলা এখানে হেড্ ক্লার্কের। তারপরে দিদির ছেলে, আর তার মেয়ে। যে-কোনও প্রকারেই হোক মৃদুলা দেবীকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে।

স্যামুয়েল সাহেব কথা দিয়েছিল বটে। কিন্তু বোর্ড থেকে জবাব এসেছে—মিস্টার ভাদুড়ী বড় জুনিয়র, এখন গেজেটেড্ পোস্ট দেওয়া চলতে পারে না।

মৃদুলা দেবী আবার কলকাতা ছুটলেন। আবার স্যামুয়েল সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন।

বললেন—স্যার, আমি যে আর ওয়েট করতে পারছি না—বুড়ী হবার পর গেজেটেড্ পোস্ট্ পেয়ে লাভ কী স্যার?

স্যামুয়েল সাহেব বললেন—আমি একবার দিল্লী যাচ্ছি, দেখি কী করতে পারি—

মৃদুলা দেবী বললেন—স্যার, ওখানকার ডি-টি-এস খুব হাইলি রেকমেন্ড করেছেন—

সাহেব বললেন—তা হলে ভালই হয়েছে, গ্রাউন্ড্ আরো স্ট্রং হয়েছে! তুমি ফিরে গিয়েই য়্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে দাও, আমি দেখি বোর্ডে নিজে গিয়ে কী করতে পারি—

সাহেব একটু থেমে আবার বললেন—তুমি গোড়াতেই ভুল করছে মিসেস

BanglaBook.org

ভাদুড়ী, প্রথম ঢোকবার সময় যদি আমাকে ধরতে, তখন আমি ডাইরেক্ট গেজেটেড পোস্ট দিতে পারতাম কিন্তু এখন হয়েছে কোশ্চেন অব্ প্রমোশন্—এখন এসে গেছে সিনীয়রিটির ব্যাপার—

মৃদুলা দেবী বললেন—তবু আপনি চেষ্টা করলে সবই পারবেন—সবই তো হচ্ছে স্যার, যার ধরবার লোক আছে, তার সবই হচ্ছে, আমার যে আপনি ছাড়া আর কেউ জানাশোনা নেই—

ওদিকে তাজপুরে টিপে দেওয়া ছিলই।

এবার আর মৃদুলা দেবীর কোনও ভাবনা রইল না। এমন করে সাহেব যখন বললে তখন একটা কিছু হবেই। তাজপুর ফিরে গিয়ে মিসেস ভাদুড়ী আবার পার্টি, আবার আড্ডায় মেতে উঠলেন।

রাত্রে সবাই চলে যাবার পর মিস্টার ভাদুড়ী একদিন বললেন—তাজপুর স্টোরে' তিনশো টাকা দেনা হয়ে গেছে নাকি?

মৃদুলা দেবী গম্ভীর হয়ে মুখ ফেরালেন।

বললেন—কেন? তোমার কানে কী করে গেল?

মিস্টার ভাদুড়ী বললেন—ওরা এসেছিল অফিসে। বলছিল তিনশো টাকা নাকি বাকি পড়ে গেছে। তা আমি ভাবলাম সত্যিই তো, তিনশো টাকা তো চারটিখানি...

—তুমি থামো!

ধমকে উঠলেন মৃদুলা দেবী! বললেন—তিনশো টাকাই হোক আর তিন হাজার টাকাই হোক, সে আমি বুঝবো, তোমার কাছে যায় কেন ওরা? তা তুমি কিছু বলতে পারলে না ওদের? দু'কথা শুনিয়ে দিতে পারলে না?

মিস্টার ভাদুড়ী বললেন—আমি ধার করেছি, আমি কী করে কথা শোনাই বলো?

মৃদুলা দেবী বললেন—তুমি এই রকম হাবাগোবা বলেই তোমার কাছে ধার শোধ চাইতে আসে। আসুক তো আমার কাছে, আমার কাছে আসতে ওদের সাহস হোক দেখি—

মিস্টার ভাদুড়ী বললেন—তা টাকা পেলেও চাইতে দোষ?

মিসেস ভাদুড়ী বললেন—কেন, মিস্টার গাঙ্গুলীর কাছে টাকা চাইবার সাহস হবে ওদের? মিস্টার মেটার কাছে টাকা চাইতে সাহস হবে? মিস্টার ফারুক, মিস্টার জয়শোয়াল—ওদের কাছে টাকা চাইতে যাক না—

—ওদেরও ধার আছে নাকি!

—তা নেই—যে যত বড় গেজেটেড্ অফিসার তার তত বেশি ধার। ধার থাকাটাই স্টাইল!

—স্টাইল?

মিস্টার ভাদুড়ী যেন নতুন কথা শুনলেন জীবনে!

মৃদুলা দেবী বললেন—হ্যাঁ, স্টাইল! টাকা থাকলেই কি শোধ করতে হবে নাকি! তুমি গেজেটেড্ পোস্ট পেলে তোমার কাছেও ধার শোধ চাইতে আর সাহস করতো না ওরা—! এবার তোমার কাছে গেলে তুমি বাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে—

মিস্টার ভাদুড়ীর মনটা তবু খচ্ খচ্ করে।

বলেন—কিন্তু মিছিমিছি ওদের ঘুরিয়ে লাভ কী?

মৃদুলা দেবী রেগে যান। বলেন—তা টাকা থাকলে তো শোধ দেব। টাকা

BanglaBook.org

পাবো কোথায় শুনি?

মিস্টার ভাদুড়ী বলেন—তা হলে এত খরচ না বাড়ালেই হয়। এত পার্টি এত নেমন্তন্ন রোজ রোজ না করাই ভালো—

মৃদুলা দেবী বললেন—পার্টি যে দিই সে তো তোমার জন্যে! তোমার জন্যেই তো মিস্টার গাঙ্গুলী মিসেস গাঙ্গুলীকে এত খাতির করি, মিস্টার মেটাকে মিসেস মেটাকে এত নেমন্তন্ন খাওয়াই—! নইলে রোজ এই তাসখেলা আর চা খাওয়ানো কি ভাল লাগে মানুষের? রোজ সেই একই কথা বলা, রোজ সেই ইঞ্চি মেপে হাসা।

এর পর আর কোনও যুক্তি খাটে না। এর পর মিস্টার ভাদুড়ী চুপ করে যান।

ঠিক এই সময়েই একদিন আমি কথাটা পাড়লাম।

বললাম—মিসেস ভাদুড়ী, আপনি আমায় বলেছিলেন সি-গ্রেডটা করে দেবেন—

আর যায় কোথায়, যেন আগুনে ঘি পড়লো!

বললেন—তোমাকে আমি গ্রেড দিতে পারবো না—তোমার গ্রেড পাবার কোনও যোগ্যতা নেই—

হঠাৎ যে আমার ওপর কেন এত বিরক্ত হয়ে উঠলেন তা বুঝতে পারলাম না। আমি যথারীতি নিয়ম করে ডলিকে পড়াতে যাই। নিয়ম করে পড়িয়ে আসি। শুধু পড়ানোই নয়। পড়ানো ছাড়া আরো অনেক কাজই করতে হয়। মিসেস ভাদুড়ীর মার্কেটিং করতে হয় সকালে। আলু পেঁয়াজ মাছ তরকারি সবই আমায় করতে হয়। তারপর আছে খুচরো বাজার। হঠাৎ সরষের তেল ফুরিয়ে গেলে আমার ডাক পড়ে অফিস থেকে। টেলিফোনে আমাকে ডেকে পাঠান। একটা চাকর আছে বাড়িতে—কিন্তু সে শুধু বাড়ির শোভা। পাগড়ি ইউনিফর্ম পরিয়ে তাকে তিনি শোভার জন্যে রেখেছিলেন। আমি ডলিকে স্কুলে দিয়ে আসতাম, স্কুল থেকে নিয়ে আসতাম ; হঠাৎ সাবান কিনতে হবে—তার জন্যে ছিলাম আমি। হঠাৎ কারো বাড়িতে জরুরী চিঠি দিয়ে আসতে হবে—তার জন্যে ছিলাম আমি। আমিও এ-সব করেছি একটি মাত্র লোভে। সে আমার প্রমোশনের লোভ। ভেবেছিলাম মিসেস ভাদুড়ীকে হাতে রাখলে চাকরিতে আমার উন্নতি কেউ রুখতে পারবে না।

কিন্তু সেই আমাকেই তিনি ওই উত্তর দেওয়াতে আমি কেমন মর্মাহত হলাম।

মৃদুলা দেবী বললনে—না, না, তোমাকে প্রমোশন কিছুতেই দেব না—

বললাম—কিন্তু আপনি তো বলেছিলেন দেবেন—

—সে তখন বলেছিলাম বটে কিন্তু পরে দেখলাম তোমার দ্বারা কিছু হবে না—তুমি এখনও সিগারেট খেতেই শিখলে না—

সিগারেট! আমি সেদিন সত্যিই আকাশ থেকে পড়েছিলাম।

—সিগারেট? কিন্তু সিগারেটটা খাওয়া কি ভালো মিসেস ভাদুড়ী?

মৃদুলা দেবী বললেন—তা সিগারেট না খেলে স্মার্ট হবে কী করে? এই জন্যেই তো তোমাদের কিছু হয় না! মিস্টার ভাদুড়ীরও তোমার মতো এই রকম ধারণা ছিল প্রথমে, জানো—

কথাটা বলে আমার দিকে কেমন তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকালেন।

বললাম—সিগারেট খাবার পয়সা কোথায় পাবো বলুন—

—তা জীবনে উন্নতি করতে গেলে পয়সা তো প্রথম দিকে খরচ করতেই হবে, পয়সা না থাকলে ধার করতে হবে!

তারপর আমার জামার দিকে চেয়ে বললেন—তোমার এ শার্টের কাপড়ের গজ

BanglaBook.org

কত করে?

বললাম—দেড় টাকা—

—ছি ছি, এই জন্যেই তো প্রমোশন হয়নি তোমার এতদিন! দেড় টাকা গজের কাপড় তুমি কী করে পরো? তোমার লজ্জা করে না? তুমি আবার কোন্ মুখে প্রমোশন চাও আমার কাছে শুনি। তিন টাকা গজের কাপড় পরতে পারো না? এত গরীবিয়ানা!

নিজের দুঃখের কথা বললাম সবিস্তারে। বললাম বুড়ো বিধবা মা, দু'টি বোন, তাদের বিয়ে দিতে হবে, একটি নাবালক ভাই—তারও লেখাপড়ার খরচ আছে—সমস্ত তো আমাকেই দেখতে হয়। মাইনে পেয়েই তাদের টাকা আগে পাঠিয়ে তবে নিজের দিকটা দেখি।

মৃদুলা দেবী বললেন—সেই জন্যেই তো আরো বেশি করে তোমার সাজগোজ করা উচিত—

তারপর আমার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি দিয়ে বললেন, দেখ, তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট, ছোট ভাই-এর মত তোমাকে একটা উপদেশ দিচ্ছি, কিছু মনে করো না—মন দিয়ে শোন—দরকার হলে খাতায় নোটবুকে টুকে নাও—

নোটবুকে আর সত্যি সত্যিই টুকলাম না।

তিনি বললেন—এ সংসার অত সহজ জায়গা নয়, যত সহজ তুমি ভাবছো! এ সংসারে ভিখিরীর কদর কেউ করবে না। তুমি যত অভাবের কথা বলবে, পৃথিবী তত তোমাকে অভাবের মধ্যে ঠেলে দেবে। তুমি যত তোমার মাথা ভাল-মানুষী করে নিচু করে থাকবে, পৃথিবীর লোক তত তোমার মাথা নিচু করিয়ে দেবে। গরীবিয়ানা করেছ কি মরেছ, লোকে তোমাকে আরো গরিব বানিয়ে ছাড়বে—

—কিন্তু...

আমি কথাটা বলবো কিনা ভাবছিলাম। কিন্তু অনেক ভেবে শেষে বলেই ফেললাম—কিন্তু রামমোহন, বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁরা তো অন্য কথা বলে গেছেন—

মৃদুলা দেবী এক তুড়ি দিয়ে যেন উড়িয়ে দিলেন আমাকে।

বললেন—দূর, ও সমস্ত এখন ব্যাক্‌ডেটেড্ হয়ে গেছে—ওঁদের কথা যদি মানো তো বনে যাও, ফলমূল খাও, কেউ আপত্তি করবে না। তা হলে আর প্রমোশন চাইতে এসো না—

তা যা'হোক এরপর একদিন অর্ডারটা বেরিয়ে গেল।

তাজপুরের কলোনীতে সেদিন সাড়া পড়ে গেল, একেবারে সেইদিনই।

মিস্টার ভাদুড়ী গেজেটেড্ পোস্ট্ পেয়ে গেছেন। য়্যাসিস্ট্যাণ্ট অফিসার।

তা হোক। গেজেটেড্ পোস্ট্ তো! আর হেড ক্লার্ক বলবে না কেউ।

ডি-গ্রেড করালীবাবুর বউ আর খোঁটা দিয়ে কথা বলবে না। ডি-গ্রেড সতীশ-বাবুর বউও আর হিংসেতে জ্বলে পুড়ে মরবে না। ওদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

সেদিন উৎসবের বহরটা কিছু বেশীই হলো।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন—আমি হাইলী রেকমেণ্ড করেছিলুম আপনাকে মিস্টার ভাদুড়ী—

সবাই কন্‌গ্র্যাচুলেট্ করলেন মিসেস ভাদুড়ীকেও। মিস্টার মেটা এলেন। মিস্টার ফারুক এলেন, মিস্টার জয়শোয়াল এলেন। কেউ গোলাপ ফুল দিলেন, কেউ আগ্রার ডালমুট দিলেন।

BanglaBook.org

মিস্টার ভাদুড়ীও স্বীকার করলেন যে এটা মিসেস ভাদুড়ীর চেষ্টাতেই হলো শেষ পর্যন্ত।

মিসেস ভাদুড়ী রাত্রিবেলা বললেন—কেমন দেখলে তো?

মিস্টার ভাদুড়ী বললেন—হ্যাঁ, দেখলাম—

মৃদুলা দেবী সেই রাত্রেই চিঠি লিখে দিলেন পাটনায়। লিখলেন—দিদি, তুই বোধহয় শুনে সুখী হবি যে মিস্টার ভাদুড়ী গেজেটেড্ পোস্ট্ পেয়ে গেছেন—

কিছুদিন পরেই কুন্তলার উত্তর এল—শুনে খুবই সুখী হলাম, কিন্তু পোস্টটা কী? য়্যাসিস্টেণ্ট অফিসার, না ডিস্ট্রিক্ট্ অফিসার?

সে প্রশ্নের উত্তর মৃদুলা দেবী অবশ্য দেন নি তখন।

আমি এদিকে মিসেস ভাদুড়ীর কথামত সিগারেট ধরেছিলাম। শনিচরি বাজার থেকে রেডিমেড সুট্ও কিনেছিলাম একটা। ভেবেছিলাম হয়ত মিসেস ভাদুড়ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবো, হয়তো প্রমোশন পাবো! ভেবেছিলাম হয়ত সত্যিই স্মার্ট দেখাবে!

কিন্তু হঠাৎ এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। হঠাৎ একদিন মিসেস ভাদুড়ী একেবারে আগুন হয়ে উঠলেন আমার উপরে।

বললেন—তুমি গল্প লেখো? বাংলা গল্প লেখো—?

খানিকটা লজ্জা, খানিকটা গৌরব—সব কিছু মিলে আমি স্বীকারও করতে পারলাম না, আবার অস্বীকারও করতে পারলাম না। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলাম শুধু মিসেস ভাদুড়ীর দিকে।

বললেন—জবাব দিচ্ছ না কেন? জবাব দাও আমার কথার?

তখন সবে আমার দু'একটা লেখা ছাপা শুরু হচ্ছে মাসিক পত্রিকায়। স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি একদিন সাহিত্যিক হবো।

মৃদুলা দেবী কোথা থেকে খবরটা পেলেন তা জানি না। কেউ হয়ত বলেছে তাঁকে। কিংবা তাঁর মেয়ে হয়ত বলেছে।

তিনি বললেন—তুমি বাংলা গল্প লেখো তো আগে বলোনি কেন? আগে বললে তোমাকে আমি আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে দিতাম না—

তারপর বললেন—এই জন্যেই তোমাদের বাঙালীদের কিছু হয় না, ছি ছি, শেষকালে তুমি কি না বাংলা গল্প লেখো?

তিনি যেন আমার অধঃপতন দেখে একেবারে হতাশ হয়ে গেছেন আমার সম্বন্ধে!

বললেন—যাও, যা হবার হয়েছে, ডলিকে আর তোমায় পড়াতে হবে না—তুমি কাল থেকে এ বাড়িতে আর এসো না—আর তোমাকে আসতে হবে না এখানে—

মৃদুলা দেবীর বাড়িতে সেই আমার শেষ যাওয়া! ডলির জন্যে তারপর গভর্নেস রাখা হয়েছিল। আমার হাতে তাঁর মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্টই হয়ে যেত! কিন্তু ঠিক সময়ে ধরা পড়ে যাওয়াতে বেঁচে গেলেন তিনি। তারপর আরো কয়েক বছর ছিলাম তাজপুরে। তারপর একদিন বিরক্ত হয়ে চাকরিই ছেড়ে দিয়েছিলাম।

তারপর দূর থেকে অনেক খবরই পেয়েছি তাজপুরের। পুরোন বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে চিঠিপত্র পেতাম। সেই সূত্রেই জানতে পেরেছিলাম মিস্টার ভাদুড়ীর আবার প্রমোশন হয়েছে। তিনি আরো বড় বাংলো পেয়েছেন। ডলিও বড় হয়েছে। সুন্দর দেখতে তাকে বরাবরই ছিল—পরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আরো সুন্দরী হয়েছে।

BanglaBook.org

মিস্টার ভাদুড়ী তাজপুরের মাথা হয়ে বসেছেন একেবারে। মিসেস ভাদুড়ী মহিলা-সমিতির প্রেসিডেণ্ট্ হয়েছেন, লাইব্রেরীর প্রেসিডেণ্ট্ হয়েছেন। সে-সব ব্রিটিশ আমলের কথা। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট হননি তিনি। ভগ্নিপতি পাটনার জজ। কোথায় যেন দিদির চেয়ে ছোট-ছোট মনে হতো নিজেকে।

মিস্টার ভাদুড়ী তখন ক্লান্তিতে পরিশ্রমে একেবারে ভেঙে পড়েছেন। আর নড়তে ইচ্ছে করে না। শরীর তাঁর কোনও দিনই ভাল ছিল না। সেই শরীর বেশি পরিশ্রমে আরো ভেঙে পড়লো একদিন।

মিস্টার ভাদুড়ী বলতেন—আর নয়, আর পারছিনে আমি—

মিসেস ভাদুড়ী বলতেন—সে কি, এখনও তো তিন-বছর আছে তোমার রিটায়ার করতে—

মিস্টার ভাদুড়ী বলতেন—আর তিন বছর চাকরি করতে বোল না আমাকে —চাকরি করে আর কী হবে?

মিসেস ভাদুড়ী বলতেন—তার মানে? জানো, আর একটু কষ্ট করলেই ডিভিশন্যাল্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ হতে পারো ; সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছি আমি।

—সে কী!

—হ্যাঁ, আমি নিজে বোর্ডে গিয়ে গ্রেগরি সাহেবকে বলে এসেছি, তুমিই এখন সিনীয়রমোস্ট্ অফিসার লিস্ট-এর মধ্যে—

মিস্টার ভাদুড়ী বলতেন—কিন্তু আমি আর চাকরি করতে পারবো না মনে হচ্ছে, মাথাটা খুব ধরে থাকে সব সময়—

—আর তিনটে বছর কোনও রকমে চালাতে পারবে না?

মিস্টার ভাদুড়ী বলতেন—মনে হচ্ছে আর তিন মাসও পারবো না—

—না না, সে হয় না—তুমি যেন আমাকে না বলে-কয়ে কিছু কোরো না, আমি অনেক আশা করে বসে আছি কলকাতায় বদ্‌লি হবো—এই তাজপুরে ডিস্ট্রিক্ট্ অফিসার হয়ে আমার কী লাভ হলো? কলকাতায় তো কাউকে দেখাতে পারলুম না—

শেষে একদিন অফিসে যাবার জামা-কাপড় পরে অফিসে যেতে গিয়েও বললেন —শুনছো, আমার মাথাটা কেমন করছে—

মিসেস ভাদুড়ী বললেন—ও কিছু না, অফিসে গিয়ে বসলেই ঠিক হয়ে যাবে—

—কিন্তু অফিসে গিয়ে তো কাজ করতে হবে! কাজ করতে পারবো না যে!

—রাখো, আমাকে আর অফিসের কাজের কথা বোল না, সেখানে কাজ তোমার যা, তা আমি জানি! শুধু গিয়ে তো হাজির থাকা! কাজ তো করে ক্লার্করা— যাও, উঠে পড়ো—

মিস্টার ভাদুড়ীর তখন মাথার শিরগুলো যন্ত্রণায় টন্ টন্ করছে।

মিসেস ভাদুড়ী বললেন—একটুখানি যাবে, পাখার তলায় বসবে আর চলে আসবে—দেখ আর কোনও রকমে তিনটে বছর, তিনটে বছর কাটাতে পারবে না?

মিস্টার ভাদুড়ী সেই অবস্থাতেই বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

বললেন—আর পারছি না আমি—একটু জল দাও তো—

মিসেস ভাদুড়ী জল দিলেন।

বললেন—কেমন? এখন একটু সুস্থ বোধ করছো তো?

মিস্টার ভাদুড়ী কিছু কথা বললেন না। অনেকক্ষণ পরে একটু চোখ খুললেন। মিসেস ভাদুড়ী কাছে গিয়ে মুখ নীচু করলেন। বললেন—একটু সুস্থ হয়েছ, না? আমি গাড়ি রেডি করতে বলছি—তুমি ওঠো, আমি ধরছি—

BanglaBook.org

মিসেস ভাদুড়ী একটু ধরে তুললেন মিস্টার ভাদুড়ীকে।

চাকর-বাকর তৈরিই ছিল। তখন অসংখ্য চাকর-বাকর বাড়িতে। অফিসের চাপরাসীরাই বাড়িতে কাজ করতো। তারাই এসে ধরে গাড়িতে তুলে দিলে মিস্টার ভাদুড়ীকে। মিসেস ভাদুড়ী সাবধান করে দিলেন সবাইকে। তিনি নিজে তদারক করতে লাগলেন।

বললেন—খুব হুঁশিয়ার দেখিস্—যেন ফেলে দিস্‌নি—

তারা বললে—না মেমসাহেব, আমরা ঠিক হুঁশিয়ার আছি—

তারপর অফিসে পাঠিয়ে দিয়ে সেদিনকার মত নিশ্চিন্ত হলেন মিসেস ভাদুড়ী। আর তিনটে বছর। এত দিন কাটলো—আর কটা দিন কাটালেই একেবারে কলকাতার হেড্-অফিসে গিয়ে ডিভিশন্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্! গ্রেগরি সাহেব নিজে কথা দিয়েছেন। অনেক কষ্টে গ্রেগরি সাহেবকে ধরেছিলেন তিনি। অনেক সূত্র বার করে, অনেক তদ্বির-তদারকের পর তবে গ্রেগরি সাহেবকে ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু এত চেষ্টার পর সব কি ব্যর্থ হবে?

এদিকে ডলিরও তখন বিয়ে হয়ে গেছে। অনেক পাত্রই রাজি ছিল বিয়ে করতে। কিন্তু মিসেস ভাদুড়ী গেজেটেড্ পোস্ট্ দেখেই পাত্র করেছিলেন। সুখে স্বচ্ছন্দে যখন মিসেস ভাদুড়ী প্রায় সাফল্যের সপ্তম স্বর্গে উঠে পড়েছেন, এমন সময় দুর্ঘটনাটা ঘটলো।

আর শুধু একটা দুর্ঘটনা নয়। একটার পর একটা।

এ-সব খবর আমার সংগ্রহ করতে হতো না। এ-সব খবর পয়সা খরচ করে লোককে জানিয়েও আনন্দ! সমস্ত রাজপুর কলোনীর লোক তখন এই আলোচনাতেই মুখর। কোনও খবর বেরোয় বাড়ির চাকর-বাকরদের কাছ থেকে, কোনও খবর পাড়া-পড়শীর কাছ থেকে, আবার কোনও খবর অফিসের কর্মচারীমহল থেকে। বাড়ির চাকর-ঝিরাই বেশি খবর রাখে, একেবারে ঘরের ভেতরকার গোপনতম খবর। তাদের মুখ বন্ধ করাই শক্ত।

তখনও মিস্টার মেটা আসেন, মিস্টার জয়শোয়াল আসেন। মিস্টার মেটা তখন রিটায়ার করে গেছেন, মিস্টার গাঙ্গুলীও তখন রিটায়ার করে তাজপুর ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু অন্য অনেক নতুন সাহেব জুটেছে। তাজপুরের কমিশনার ফেয়ারলি সাহেব, পুলিস সুপার ক্যামেরন সাহেব ইত্যাদি ইত্যাদি বহু বড় বড় অফিসার। আরো বড়—আগের চেয়েও বড়। তারাও ব্ল্যাক প্রিন্স্ দেয়, তারাও নানারকম উপহার দেয় মিসেস ভাদুড়ীর জন্মদিনে।

তখনি শুনেছিলাম মিসেস ভাদুড়ী বাড়ি করছেন কলকাতায়। বিরাট বাড়ি, বিরাট গাড়ি। মিসেস ভাদুড়ী জীবনে যা চেয়েছিলেন, প্রায় তার সবটুকুই পেয়েছিলেন। শুধু একটুখানি বাকি। ডিভিশন্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ পোস্ট্—কলকাতার হেড্-অফিসে।

কিন্তু সেইটেই হলো না শেষ পর্যন্ত। শেষ আশাটুকু তার পূর্ণ হল না। সব মানুষের সব আশা কি পূর্ণ হয়?

মিস্টার ভাদুড়ী একদিন অফিসেই কাজ করতে করতে হঠাৎ পড়ে গেলেন চেয়ার থেকে। ডাক্তার এল, নার্স এল, মিসেস ভাদুড়ীও টেলিফোনে খবর পেয়ে দৌড়ে এলেন।

ডাক্তার বললেন—স্ট্রোক্—

তা সেই-ই শেষ!

BanglaBook.org

এর পরে আর কোনও খবর রাখবার সময় পাইনি। তাজপুরের লোকেরাও আর কিছু খবর পেত না। শুনেছিলাম মিসেস ভাদুড়ী কলকাতায় খুব কমই থাকেন। বেশির ভাগ সময়ই তাঁর কাটে দিল্লীতে। সেখানেও তিনি একটা ফ্ল্যাট্ রেখে দিয়েছেন। সেখানেই পুরোন বন্ধু-বান্ধবদের পার্টি দিতেন, সেখানেও তাঁর নতুন ভক্তের দল জুটেছিল। তা এ-সব খবরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী! সুতরাং আমি কোন চেষ্টা করতাম না এ-সব সংবাদ সংগ্রহ করতে।

এতদিন পরে সেই মৃদুলা দেবীর খবর পেয়ে অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম বৈ কি!

তখন সবে কলকাতায় রায়ট্ থেমেছে। স্বাধীনতাও এসে গেছে। উনিশ শো সাতচল্লিশ সালের আগস্টের পরের ঘটনা। লর্ড মাউণ্ট্ব্যাটেন বোধ হয় তখন দিল্লী থেকে বিদায় নিয়েছেন। দেশময় একটা ওলোট-পালট হয়ে গেছে। দিশী-লোকদের কেবল উৎসব আর উৎসব। উৎসবের দিন হাজার হাজার লোক কলকাতার গভর্নরস্ হাউসে ঢুকে সব জিনিসপত্র ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। তবু পুলিসের লাঠি চলেনি। গুলী-গোলা চলেনি। যারা বিদেশী সাহেব এখানে এত পুরুষ ধরে ছিল, রেলে, মার্চেণ্টস্ অফিসে চাকরি করতো, তারাও দলে দলে চলে গেছে। কেউ গেছে ইংলণ্ডে, কেউ কানাডায়, কেউ অস্ট্রেলিয়ায়। কেউ কেউ আবার সাউথ্ আফ্রিকায়। সে এক দিন গেছে ভারতবর্ষের মানুষের জীবনে। আবার আশা পেয়েছে আবার আনন্দ পেয়েছে। আবার সুখ পেয়েছে। এত দিনের পর দেশ স্বাধীন হলো, আশা হওয়াটা অন্যায় নয়। অনেক লোক এই স্বাধীনতার জন্যে গুলী খেয়েছে, প্রাণ দিয়েছে, এবার থেকে নিশ্চিন্ত। এবার আবার নতুন করে বাঁচতে পারবে, নতুন করে মন খুলে কথা বলতে পারবে। যে-সব কথা আগে ব্রিটিশ আমলে বলা অপরাধ ছিল, এবার থেকে তা প্রকাশ্যে বলবে। যে সব বই এতদিন নিষিদ্ধ হয়ে ছিল, তাও ছেড়ে দেওয়া হলো।

সে এক যুগই বটে।

ঠিক সেই সময়েই আমি মৃদুলা দেবীর চিঠি পেলাম।

ভাবলাম—এতদিন পরে এখন আমার সঙ্গে তাঁর কিসের প্রয়োজন থাকতে পারে!

তবু গেলাম।

গিয়ে দেখি, সত্যিই বড় চমৎকার বাড়ি করেছেন মিসেস ভাদুড়ী। কিন্তু মিস্টার ভাদুড়ী এ-বাড়ি ভোগ করে যেতে পারেন নি। দেয়ালে অন্যান্য অনেক ছবির মধ্যে তাঁর একটা অয়েল-পেণ্টিং পোর্ট্রেট্ও টাঙানো। কিন্তু আসবাবপত্র সব দেশী। সেই তাজপুরের কোয়ার্টারও দেখেছিলাম, আর এ-বাড়িও দেখলাম। অনেক তফাৎ। অনেক ফারাক! সেখানে ছিল সবটাই সাহেবিয়ানা। এখানে সমস্ত দেশী ব্যাপার। ভারতবর্ষে যত মহাপুরুষ বেঁচেছিলেন এবং এখনও বেঁচে আছেন —তাঁদের সকলের পোর্ট্রেটই দেওয়ালে রাখা। কিন্তু সে-সব বিদেশী রাজা-রাণীদের ছবি দেখতে পেলাম না কোথাও। দরজা-জানালায় খদ্দরের পর্দা, সর্বত্রই খদ্দরের ছড়াছড়ি।

মৃদুলা দেবী ঢুকতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম।

বললেন—বোস বোস—

কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। বয়েস হয়েছে বটে, কিন্তু সে জৌলুস কোথায় গেল? সেই পাউডার, লিপ্স্টিক্, নেল-পালিশ্ আর কাঁচা-মিঠে হাসির জৌলুস? আগাগোড়া খদ্দরের সাজপোশাক। যেন বার্ধক্যের ছাপ

BanglaBook.org

এসেছে চেহারায়। মাথার চুলগুলো এলো করা। বিধবা মূর্তি। বিধবা হবার পরে আর দেখিনি তো। হয়ত মিস্টার ভাদুড়ীর মৃত্যুর পর থেকেই সব বিলাসিতা ত্যাগ করেছেন। হয়ত এই নিরাভরণ-শুচিশুভ্রতাই তাঁর একমাত্র অবলম্বন।

মৃদুলা দেবী বললেন—আমার চিঠি পেয়েছিলে?

বললাম—আপনার চিঠি পেয়েই তো এলাম, কবে এলেন দিল্লী থেকে?

বললেন—আজই সকালে। বড় মানসিক অশান্তির মধ্যে আছি সেদিন থেকে, জানো—

মৃদুলা দেবীর আবার কিসের অশান্তি বুঝতে পারলাম না। তিনি জীবনে যা চেয়েছিলেন তা তো পেয়েছেন। তাঁর দিদি জজের স্ত্রী হয়েছিল, তিনিও হয়েছেন ডি-টি-এস্-এর স্ত্রী। সামান্য অবস্থা থেকে তুলে স্বামীকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে নিজেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তারপর এই বাড়ি করেছেন। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন আই-সি-এস-এর সঙ্গে। দিল্লীর ইংরেজমহলে মিসেস ভাদুড়ীর অপ্রতিহত ক্ষমতা। ভাইস্‌রয়ের একজিকিউটিভ্ কাউন্সিল থেকে শুরু করে সেক্রেটারি মহল, সর্বত্র মৃদুলা দেবীর দোর্দণ্ড প্রভাব। তাঁর নাম করলে দিল্লীতে তাঁকে না চিনবে এমন লোক সোসাইটিতে নেই। সেই তাঁরই অশান্তির কথা শুনে আমার তো অবাক হবারই কথা!

বললাম—আপনার কিসের অশান্তি?

মৃদুলা দেবীর মুখটা সত্যিই কেমন যেন ভার-ভার দেখালো।

বললেন—সেই জন্যেই তো তোমায় ডেকেছি। আমার কিছু উপকার করতে হবে তোমাকে!

এবার আমার বিস্ময় আর চেপে রাখতে পারলাম না।

বললাম—আমাকে আর লজ্জা দেবেন না—

মৃদুলা দেবী গম্ভীর হয়ে বললেন—না, আমি সত্যি কথাই বলছি, আমার উপকারের জন্যেই আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি আজ—

বললাম—কিন্তু আমি আপনার কী উপকার করতে পারবো, বুঝতে পারছি না।

মৃদুলা দেবী বললেন—পারবে পারবে, এখন তোমরাই আমাদের উপকার করতে পারবে! এখন তো তোমরা সাহিত্যিক হয়েছ, স্বদেশী আমলে তোমাদেরই এখন খাতির! আমরা তো এখন পরগাছা! আমরা যারা এতদিন সাহেবদের সঙ্গে মেলা-মেশা করে এসেছি, সাহেবদের পার্টি দিয়েছি তাদের এখন তো কোনও স্থান নেই দেশে!

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—না না, আপনি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন মিসেস ভাদুড়ী।

মৃদুলা দেবী বললেন—না, তুমি জানো না ঠিক, আমি যে সব লক্ষ্য করছি! এবার আমাদেরই খারাপ দিন এল—এবার তোমাদেরই যুগ। অবশ্য ভালই হয়েছে। এই রকম হওয়াই তো ভালো। দেশ স্বাধীন হওয়া কে না চায়? দেশের লোক দেশ চালাবে, এটা তো ভালো কথাই!

তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো মৃদুলা দেবীর।

বলতে লাগলেন—তা দেশ স্বাধীন হয়েছে তার জন্যে আমার কোনও দুঃখ নেই, জানো! বরং আনন্দ হবারই তো কথা। আর আমার সত্যিই আনন্দ হয়েছে। এই দেখ না, দেয়ালের আগেকার সেই সব ভাইস্‌রয় আর গভর্নরদের ছবি সব আমি নামিয়ে ফেলেছি, সব সেকেন্ড্-হ্যান্ড্ দোকানে বিক্রি করে দিয়েছি! আর দেখ, এই ক'দিনে আমি প্রায় দু'হাজার টাকার মত খদ্দর কিনেছি। আর বিলিতি

BanglaBook.org

ক্রেপ্, নাইলন, জর্জেট যা কিছু ছিল সব বাক্সর ভেতরে পুরে ফেলেছি—এমন কি তুমি শুনলে বিশ্বাস করবে না আমি একটা ইংলিশ্ পুড্‌ল্ কিনেছিলাম গ্রেগরি সাহেবের কাছ থেকে—ভারি পোষ মেনেছিল কুকুরটা—সেটাও বিক্রি করে দিয়েছি সেদিন! ভাবলাম আমার মনে পাপ না থাক, লোকে হয়ত কী মনে করবে!

মৃদুলা দেবী কথাগুলো বলে যাচ্ছিলেন, আর আমি চুপ করে শুনে যাচ্ছিলাম। বড় কষ্ট হচ্ছিল মৃদুলা দেবীকে দেখে। সত্যিই বড় মর্মান্তিক লাগছিল তাঁর কথাগুলো—

তিনি আবার বলতে লাগলেন—দেখ, আমিও বাঙালী, বাঙলা দেশে আমারও জন্ম। বাঙালীর ভাল হয়, এটা আমিও চাই। সত্যিই আমি তো আলাদা নই! রাজসাহীতে আমি জন্মেছি। এতদিন পরে, এই দু'শ বছর পরে, ইংরাজেরা চলে গেল, এতে কি আমার আনন্দ হয়নি বলতে চাও? কিন্তু আমার কথা নয়—আমার কথা হলো, আমি যদি একটু আগে খবর পেতাম যে এমন করে দেশ স্বাধীন হবে তো আমার আজকের এই অশান্তি আর হতো না—! ভেবে দেখ, আজ যদি গ্রেগরি সাহেব ইণ্ডিয়ায় থাকতো তো আমার এই অবস্থা?

একটু বিস্মিত হলাম। বললাম—গ্রেগরী সাহেব নেই!

মৃদুলা দেবী বললেন—গ্রেগরী সাহেব কী করে আর থাকে বলো? আমার যত ফ্রেণ্ড ছিল সব চলে গেছে। স্যামুয়েল সাহেবকে তো তুমি চিনতে, সেই স্যামুয়েল সাহেব, যে ইণ্ডিয়ানদের অত ভালোবাসতো, সে-ই চলে গেল শেষকালে। আর গ্রেগরী সাহেব তো যাবার সময় কেঁদেই ফেললে।

কথাগুলো বলে মৃদুলা দেবী আমার দিকে চাইলেন। বললেন—তুমি কী করছো আজকাল?

যা করছি বললাম।

মৃদুলা দেবী বললেন—তোমার খুব নাম হয়েছে, জানো। সব্বাই তোমার বইটার প্রশংসা করে। আমি অবশ্য পড়িনি। তা লোকে যখন ভালো বলছে, তখন ভাল হয়েছে নিশ্চয়ই—এখন তো তোমাদের যুগ—

বললাম—আপনি আমায় ডেকেছিলেন কী জন্যে?

—বলছি। এখন, তুমি তো জানো, আমি সারাজীবন একটা পয়সাও জমাতে পারিনি। যা পেয়েছি দু'হাতে খরচ করেছি, পার্টি দিয়েছি আর সাহেবদের মহলে মিশেছি। তা এখনি হয়েছে মুশকিল। যাদের সঙ্গে আমার মেলামেশা ছিল, যারা ছিল আমার ওয়েল্‌উইশার, মানে শুভাকাঙ্ক্ষী, তারা সবাই চলে গেছে—এখন তো প্রায় আমার একেবারে অসহায় অবস্থা—

তারপর হঠাৎ কী যেন একটা কথা মনে পড়ে গেল এমনি ভাবে বললেন—আর তুমি বোধহয় শুনেছ ডলি বিধবা হয়ে গেছে—

—সে কী!

—হ্যাঁ, সে এক করুণ ইতিহাস। তুমি শুনেছিলে নিশ্চয়, আমি বেস্ট জামাই করেছিলাম। ইণ্ডিয়াতে অমন জামাই পাওয়া যায় না! গ্রেগরী সাহেব নিজে দাঁড়িয়ে ডলির বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই যে বললাম, যখন সময় খারাপ হয়, তখন সব দিক দিয়েই খারাপ যায়। এ-ও হয়েছে তাই। এখন তোমরা তো অনেকের সঙ্গে মেলা-মেশা করো, তোমাদের তো এখন খুবই খাতির, তা আমার একটা কিছু করতে পার না?

বললাম—আপনার আমি কী করতে পারি বলুন—?

মৃদুলা দেবী বললেন—যা হোক একটা কিছু! এই ধরো আজকাল তো কত

BanglaBook.org

ফরেন্ টুরিস্ট আসছে, তাদের দেখা-শোনা করা, কিংবা কত রকম সব হচ্ছে, দেখতে তো পাচ্ছি, তুমি একটু চেষ্টা করলেই হয়—

বললাম—আপনি বিশ্বাস করুন, আমার সঙ্গে কারো তেমন পরিচয় নেই। আমি শুধু ঘরে বসে লিখি—

মৃদুলা দেবীর চোখ দুটো এবার ছল্‌ছল্ করে উঠলো। সত্যিই তাঁকে দেখে আমার মায়া হলো। তিনি তো প্রস্তুত ছিলেন না এই অবস্থার জন্যে ; তিনিই বা কেমন করে কল্পনা করতে পারবেন এমন করে তাঁর সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা ওলোট্-পালোট্ হয়ে যাবে!

মৃদুলা দেবী বললেন—দেখ আমার বাবা ছিলেন রায়বাহাদুর, ইংরেজের সঙ্গেই মেলামেশা করেছেন সারাজীবন। আমাদেরও তিনি সেই ভাবেই মানুষ করেছেন। এতদিন আমরাও সেই ভাবেই চলে এসেছি, এখন এ কী বিপদ বলো তো আমাদের!

বললাম—আমি চেষ্টা করবো, দেখবো কী করতে পারি আপনার জন্যে—

সেদিন আমি চলে এলাম। মৃদুলা দেবীও আসবার আগে আমাকে তাঁর অসহায় অবস্থার কথাটা মনে রাখতে বার বার অনুরোধ করেছিলেন।

মৃদুলা দেবীকে কথা তো দিয়েছিলাম। সান্ত্বনাও দিয়েছিলাম। কিন্তু মনে মনে ঠিক জানতাম সে-কথা দেওয়ার কোনও মূল্য নেই। সে সান্ত্বনারও কোনও অর্থ নেই। অথচ চেষ্টা যে করিনি তা-ও নয়। আমার সঙ্গে কোনও হোমরা-চোমরা ব্যক্তির পরিচয় হবার সুযোগ ছিল না, সুতরাং সে-চেষ্টা বলতে গেলে একরকম নিরর্থকই। কিন্তু চেষ্টারও কসুর করিনি।

বোধ হয় বছরখানেক পরেই হবে মনে আছে।

একজন পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে ঘটনাচক্রে একদিন পরিচয় হয়ে গেল। আমি প্রকারান্তরে কথাটা পাড়লাম। বললাম সমস্ত খুলে। বাপ ছিলেন সেকালের পদস্থ রায়বাহাদুর। সেকালে রাজসাহীর নামজাদা লোক। তিনি চিনতে পারলেন।

বললাম—ইনি তাঁরই ছোট মেয়ে। স্বামী মারা গেছেন, মেয়েও বিধবা হয়েছে, লেখা-পড়া শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে কোনও ফাঁক নেই, আপনি যদি এ'র জন্যে একটা কিছু করতে পারেন। তা হলে বিশেষ উপকার হয়—

অনেক কথা বলবার পর তিনিও বিশেষ চিন্তিত হলেন।

বললেন—একটা চাকরি আছে তবে তেমন বড় চাকরি নয়, রিসেপ্‌শনিস্টএর চাকরি, আর মাইনেও তেমন বেশি দিতে পারবো না—

—কত?

বললেন—সব মিলিয়ে সাড়ে সাতশো—বিদেশ থেকে যে সব টুরিস্ট্ আসবে, ডেলিগেট্ আসবে তাঁদের তদ্বির-তদারক করতে হবে আর কি। ওই রকম মহিলা হলেই আমাদের সুবিধে হয়—

সেইদিনই টেলিফোনে যোগাযোগ করলাম।

বললাম—আপনার সঙ্গে একটা দরকার ছিল, আপনার একটা ব্যাপার নিয়ে—

মিসেস ভাদুড়ী বললেন—আমার সময় বড় কম, হোক, তবু তুমি এসো একবার—আধঘণ্টা সময় আছে হাতে এখন।

গেলাম আবার তাঁর বাড়ি। বাড়ির সামনে গিয়ে কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম। অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে। ভেতরে গিয়ে দেখি স্যুট-পরা অনেকেই বসে আছেন। ঘরের চেহারাও বদলে গেছে ভেতরে। সেই আগের বারের ফার্নিচার আর নেই।

BanglaBook.org

খদ্দরের পর্দাগুলোর বদলে আবার দামী বিলিতি ক্রেপসিল্কের পর্দা ঝুলছে। কয়েকজন দামী স্যুট-পরা ভদ্রলোক বসে বসে সিগারেট খাচ্ছেন। আমি একমাত্র ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা লোক।

মৃদুলা দেবী হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন। বেশ ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। সেই যেন ঠিক আগেকার মিসেস ভাদুড়ী। আবার দেখলাম সিল্কের শাড়ি, আবার লিপ্‌স্টিক্, আবার সেই ফেস্ পাউডার, আবার সেই কাঁচা-মিঠে হাসি।

আমাকে দেখেই বললেন—আমার মোটে সময় নেই, কী বলবে তাড়াতাড়ি বলো—এঁরা সব বসে আছেন আমার জন্যে—

আমি কি বল্‌বো বুঝতে পারলাম না। এমন হবে তো ভাবিনি! এমন চেহারা দেখবো তা-ও তো কল্পনা করতে পারিনি। এত গাড়ি, এত অতিথি, এত স্যুট-সিল্কও তো সেদিন ছিল না—কী করেই বা ভাবতে পারবো!

বললাম—আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল, একটু আড়ালে বলতাম—

—চলো, চলো, ও-ঘরে যাই—

বলে আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। যাবার সময় অতিথিদের বললেন—আপনি একটু বসুন মিস্টার সিংহানিয়া, আমি এখুনি আসছি।

পাশের ঘরটাও বিলিতি-কেতায় সাজানো। বসলাম একটা কোচের ওপর।

মৃদুলা দেবী বসলেন না, বললেন—আমার বসবারও সময় নেই, বলো কী বলবে—

বললাম—আপনি সেই বলেছিলেন একটা কাজের জন্যে? আমি একটা যোগাড় করেছি। ভালো চাকরি। রিসেপ্‌শনিস্টের চাকরি। কিন্তু মাইনেটা বড় কম! মাত্র সাড়ে সাতশো টাকা—সব মিলিয়ে—

অতি সঙ্কোচে মাইনের কথাটা বলেছিলাম। ভেবেছিলাম সাড়ে সাতশো টাকার কথা শুনে তিনি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মুখ ঘোরাবেন। কিন্তু সে ধার দিয়েও গেলেন না তিনি।

বললেন—এখন তো আর চাকরি করবার সময় হবে না আমার:

বলে আমার দিকে তিনি কৃপার দৃষ্টিতে চাইলেন খানিকক্ষণ।

বললাম—না, আপনি আমাকে বিশেষ করে বলেছিলেন বলেই বলতে এলাম। আপনার যদি পছন্দ না হয় তো আপনি করবেন কেন?

মৃদুলা দেবী বললেন—পছন্দর কথা হচ্ছে না, হচ্ছে সময়ের কথা। আমার তো সময়ই হবে না। এই দেখ না, এখনি আবার মিস্টার সিংহানিয়ার সঙ্গে যেতে হচ্ছে ওঁদের পার্টিতে, তা ছাড়া...

আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম।

বললাম—আপনি বলেছিলেন বলেই বলতে এসেছিলাম...

মৃদুলা দেবী বললেন—হ্যাঁ, তখন বলেছিলাম তোমাকে, তা সেটা তো প্রায় এক বছর আগের কথা! তখন সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমরা। দেখ না, প্রায় দু'হাজার টাকার খদ্দরই সেদিন কিনে ফেলেছিলাম ভয়ে, গ্রেগরী সাহেবের ইংলিশ-পুড্‌ল্‌টাই বেচে দিয়েছিলাম—আহা আমার কত শখের কুকুর! যাকগে—তা তারপর দেখলাম, মিথ্যে ভয়, সাহেবরাও ভয় পেয়েই চলে গেল এখান থেকে, না গেলেও চলতো!

তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে বললেন—তা যাকগে, তুমি এখন কী করছো? এখনও সেই বাংলা নভেল লেখা চালাচ্ছো নাকি?

চুপ করেই ছিলাম এতক্ষণ। এবার বললাম—তা ছাড়া আর কী করবো—

BanglaBook.org

মৃদুলা দেবী বললেন—এই তো তোমাদের দোষ! ধুতি-পাঞ্জাবিটাও ছাড়তে পারলে না! দোষ কি তোমাদের একটা? দোষ তোমাদের হাজারটা! তাই সেদিন মিস্টার হরবন্‌স্‌কে বলেছিলাম...বাংলা বই যে লিখছো, তাতে কা'র কি উপকারটা হচ্ছে শুনি? এই যে পৃথিবীতে কত কি চেঞ্জ হচ্ছে সেদিকে একবার চোখ মেলে দেখো! হিন্দী শেখো। কত ডেলিগেশন যাচ্ছে কত জায়গায়—চায়না, আমেরিকা, রাশিয়া! চেষ্টাচরিত্র করে সে-সব দেশে একবার ঘুরে এসো! আউট্‌লুকটা ব্রড্‌ করো!

হঠাৎ উপদেশের ঝড় বয়ে গেল আমার ওপর।

আমিও অস্বস্তি বোধ করছিলাম!

মৃদুলা দেবী হঠাৎ বললেন—ঠিক আছে, আমার আবার মিস্টার সিংহানিয়ার সঙ্গে এখনি দেখা করতে হবে—আর, আর একটা কথা—বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম—

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম।

মৃদুলা দেবী বললেন—বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম, তোমার সঙ্গে খবরের কাগজের লোকদের আলাপ আছে?

হঠাৎ খবরের কাগজের প্রসঙ্গে একটু অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—আছে!

—তা হলে তো ভালোই হলো। আমি শনিবার দিন আমেরিকায় যাচ্ছি, একটা কালচারাল ডেলিগেশনের লিডার হয়ে—বিকেল ছটার সময় আমার প্লেন ছাড়বে দমদম এয়ারপোর্ট থেকে—ওই সময়ে ওদের ক্যামেরাম্যানকে পাঠিয়ে দিতে বোল! আর যদি আমার জীবনী ছাপায় তো তা-ও রেডি করে রেখেছি—সেটাও স্টাফ্‌ রিপোর্টারদের দিয়ে দিতে পারি। কেমন? মনে থাকবে তো? ভুলে যাবে না?

আসলে আমি গিয়েছিলাম মৃদুলা দেবীরই উপকারের জন্যে, কিন্তু আমার মনে হলো আমি যেন চড় খেয়ে ফিরে এলাম।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

স্ত্রীলোক

ট্রেন যখন পৌঁছলো তখন অনেক রাত। কিন্তু রাত্রেও স্টেশনে টাঙ্গা ছিল, রিক্সা ছিল, ট্যাক্সি ছিল। কুলি মজুর মুটে সবাই ছিল। কোন অসুবিধে হবার কথা নয়। দিনের ট্রেনের চেয়ে রাত্রের ট্রেনেই ভাল। তারপর ডাকবাংলোর ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল। কোনও অসুবিধে হয়নি। গভর্নমেণ্টের টুরিস্ট বুরো থেকে সব খবর নিয়েছিলাম। খাওয়া-থাকার সব বন্দোবস্ত ঠিক। ভালো মাছ পাওয়া যায়, ভালো চাল, ভাল ঘর, বাথরুম! গরম জল, বিছানা, কোনও কিছুরই বে-বন্দোবস্ত নেই।

ভোরবেলাই এসে হাজির হয়েছে ত্রিপাঠি।

ত্রিপাঠি এ-অঞ্চলের পুরোন লোক। ত্রিপাঠির পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ সবাই এই নেটিভ স্টেটেই মানুষ হয়েছে। সবাই শেষে এই মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। এখানকার মাটিতে ফসল যেমন ফলে, ফসলের রপ্তানিও তেমনি হয়। রূপ্‌সা আর ময়ূরভঞ্জের সমতলভূমির চেয়ে এখানকার ফলন ভালো। লোকে খাটতে পারে বেশি, নেটিভ স্টেটের আয়ও ছিল তাই ভালো। তখন রাজা-বাহাদুর স্কুল করে দিয়েছিলেন এখানে, কোর্ট-কাছারি করেছিলেন। রাজা-বাহাদুরের নিজের গড়া মিউজিয়াম ছিল। উড়িষ্যার মাটি খুঁড়ে সেখানে যত মূর্তি পেয়েছিলেন, সব সংগ্রহ করেছিলেন। এখানে হিন্দু যুগ, বৌদ্ধ যুগ, পাঠান যুগ, মারাঠী যুগের নিদর্শন সাজিয়ে রেখেছেন মিউজিয়ামে। অবলোকিতেশ্বরের ভাঙা মূর্তির পাশেই মন্দিরের দেবদাসীর লাস্যময়ী মূর্তির স্থান-নির্ণয় কে করেছিল কে জানে, কিন্তু দেখতে দেখতে ও-সব অসঙ্গতি আর মনে পড়ে না। এখন আবার নতুন একজন কিউরেটর এসেছেন সরকারের তরফ থেকে। এখন আবার নতুন করে মূর্তিগুলো সাজানো হচ্ছে নম্বর দিয়ে দিয়ে। এখন আবার মিউজিয়ামটা সাজানো হচ্ছে। চুন বালি পাথর ইট দিয়ে বেদীগুলো গাঁথা হচ্ছে।

মিউজিয়ামের পর হাওয়াখানা। পাহাড়ের ওপর বিরাট এক মাইল লম্বা লেক। লেকের বুকের মধ্যে দোতলা সমান হাওয়াখানা। মহারাজাবাহাদুর নিজে গিয়ে হাওয়াখানায় বসতেন, রাণীরা বসতেন, রাজমাতা বসতেন। চারিদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। রাজহংস চরছে জলের ওপর। এই হাওয়াখানাও কালক্রমে ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছিল। এখন সরকারী ইঞ্জিনীয়র লোক-লস্কর নিয়ে আবার সব মেরামত করতে শুরু করেছেন।

হাসপাতাল, কোর্ট, কাছারিবাড়ী। দুর্গামন্দির। দুর্গামন্দিরের গায়ের বিরাট অশ্বত্থ গাছটা মন্দিরটাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছিল একেবারে। চন্দনপুর নামে একদিন সমৃদ্ধ স্টেট্ ছিল তার কীর্তিগুলো লোকের মুখে মুখেই তো এতদিন চলছিল। বাংলা দেশ থেকে বাঙালী ম্যাজিস্ট্রেট, বাঙালী ডাক্তার, বাঙালী ইঞ্জিনীয়র এসে এখানে কাজকর্ম করেছেন। মহারাজাবাহাদুর বাঙালীদের ভারি ভালবাসতেন। মহারাজাবাহাদুরের সেই সমৃদ্ধির যুগে চন্দনপুরেরও নামডাক ছিল। চন্দনপুরের নিজস্ব সৈন্য ছিল, নিজস্ব পোস্টাফিস ছিল। চন্দনপুরের মহারাজার ইচ্ছে ছিল ভারতবর্ষের নেটিভ স্টেটের মধ্যে তিনি হবেন শীর্ষমণি! তা মহারাজাবাহাদুরের ক্ষমতাও ছিল প্রচুর। রণজিৎ সিং দেব বিক্রমের বাবা রঘুজিত সিং দেব বিক্রমের পরাক্রমও ছিল বিস্তর। একবার রেসিডেণ্ট্ জোন্‌স্ সাহেবকে নিজের প্যালেসের

BanglaBook.org

মধ্যে বন্দী করে রেখেছিলেন লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে। তারপর খবর গেল কলকাতায়। কলকাতা তখন ইণ্ডিয়ার রাজধানী। লর্ড বেণ্টিঙ্কের চীফ সেক্রেটারী এলেন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। এসে রঘুজিত সিং দেব বিক্রমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। শেষে কী হলো কে জানে, জোন্‌স্‌ সাহেবকে ছেড়ে দেওয়া হলো তারপর।

মহারাজাবাহাদুরের আরো বীরত্বের কাহিনী প্রচলিত ছিল সে-সময়।

সে-সময় মহারাজার নিজের নামে টাকা ছাপা হতো। টাকা, আধুলি, পয়সা। টাকার ওপরে মহারাজাবাহাদুরের নিজের মূর্তি ছাপা থাকতো! শুধু তাই-ই নয়। কস্‌মট্‌স্‌-হাউস ছিল, মহারাজাবাহাদুরের ব্যাঙ্ক ছিল, পুলিস ছিল। সব ছিল। চন্দনপুর ইণ্ডিয়ার নামকরা স্টেটের মধ্যে একটা ছিল।

ত্রিপাঠি আমায় সব দেখাচ্ছিল।

ত্রিপাঠি বললে—আগে আমরা খুব সুখে ছিলাম হুজুর, মহারাজাবাহাদুরের আমল আমি দেখিনি, কিন্তু আমরা যখন ছোট তখন মহারাজাবাহাদুর মারা গেলেন। মারা যাবার দিন আমাদের রাজ হাই স্কুলে দুপুরবেলা ছুটি হয়ে গেল—তারপর পনেরো দিন ধরে স্টেটের সব কিছু বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—

—এটা কী?

ত্রিপাঠি বললে—এটা হুজুর ফাঁসিঘর!

—ফাঁসিঘর!

জিজ্ঞেস করলাম—এখানেই ফাঁসি হতো বুঝি?

ত্রিপাঠি বললে—এই ফাঁসিঘরটার পর থেকেই স্টেটের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল হুজুর—

দেখলাম সব কিছু মেরামত হচ্ছে চন্দনপুরে। হাওয়াখানা, রাজপ্যালেস, কোর্ট-কাছারি, আদালত, হাসপাতাল সমস্ত। মিস্ত্রী খাটছে, পি-ডবলিউ-ডি'র ইঞ্জিনীয়র-ওভারসীয়র তদারক করছে। সমস্ত চন্দনপুর রাজ্যটাই নতুন করে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। চন্দনপুরের নতুন কমিশনার রাজ-প্যালেসেই কোয়ার্টার করেছেন নিজের। ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের হোম্‌ মিনিস্ট্রির তাঁবে সব কিছু চালানো হচ্ছে। রাজ-প্যালেসের ওপর ট্রাই-কলার ফ্ল্যাগ উড়ছে। কমিশনারের গাড়ি, কমিশনারের হাতী, পাল্কী সমস্ত মজুত। টুরিস্টদের জন্যে দেখবার-শোনবার বন্দোবস্ত চমৎকার। ট্রেন থেকে নেমে তিরিশ মাইল ট্যাক্সি করে তবে চন্দনপুরে এসে পেঁছানো যায়। এককালে আরো টুরিস্ট বাড়বে। আরো হোটেল হবে। বেঙ্গলের কাছাকাছি—অর্থাৎ তিনশো মাইলের মধ্যে এমন জায়গা দেখবার লোকের কখনও অভাব হবে না। পাহাড়ের ওপরে দাঁড়ালে দূরে সমতলের ধানক্ষেত, নদী, কুঁড়েঘর, গ্রাম সব দেখা যায়। এমন জায়গা দেখবার কার না লোভ হবে! তবু সবই যখন সারানো হচ্ছে, তখন ফাঁসিঘরটা কেন সারানো হচ্ছে না বুঝতে পারলাম না।

জেলের বিরাট চৌহদ্দি। এককালে তিন-মানুষ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। এখন সব পাঁচিলটাই প্রায় ভেঙে ভূমিসাৎ হয়ে গেছে। চৌহদ্দির ভেতরে উত্তর-পূর্ব কোণাকুনি ফাঁসির ঘরটা।

বললাম—এটা সারানো হচ্ছে না কেন ত্রিপাঠি?

ত্রিপাঠি বললে—এটা আর সারানো হবে না হুজুর

—কেন?

—মহারাজাবাহাদুরের মায়ের বারণ আছে।

অবাক হবারই কথা বটে! ফাঁসিঘর তৈরি হয়েছে আর সারানো হবে না! বাড়িটা দেখে তো মনে হয় নতুন তৈরি হয়েছিল। এই জেলখানা, এই প্যালেস,

BanglaBook.org

এই হাসপাতাল, কাছারি, হাওয়াখানা সব কিছুর পরে। মোটা মোটা ইট, নতুন গাঁথুনি। খিলেনগুলোতে একটাও ফাটল্ ধরেনি। তবু অনেক দিন হাত না দেওয়ার জন্যে অশ্বত্থ গাছ গজিয়েছে তারই মাথায়।

জিজ্ঞেস করলাম—তা মহারাজার মায়ের বারণ আছে কেন?

ত্রিপাঠি বললে—সে অনেক কথা হুজুর—সে মস্ত বড় কাহিনী।

বললাম বল না শুনি!

ত্রিপাঠি বললে—সে আপনাকে পরে বলবো'খন—

ঘরের দরজার ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলাম। ভেতরটা বেশ বড়। অনেক লোক ধরে। ওপরে কপিকল্। লোহার কপিকল্ বেশ মজবুত করে সিমেণ্ট দিয়ে গাঁথা। পায়ের তলায় একটা কাঠের পাটাতন। তার নিচে একটা গহ্বর। কপিকলের ওপরটাও খুব উঁচু। উঁচুতেও লোহার সিঁড়ি দিয়ে ওঠা যায়। একটা মস্ত পাকানো দড়ি পড়ে রয়েছে। বহু বছর ধরে পড়ে পড়ে দড়িটা পচে খসে খসে যাবার অবস্থা। গা'টা কেমন ঘিন্‌ঘিন্ করে উঠলো। বেলা বেশি হয়নি। রোদ উঠেছে কড়া। সূর্যটা মাথার ওপরে আসবার উপক্রম করছে। কিন্তু সেই সকাল-বেলাই সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে সারা শরীরে কেমন রোমাঞ্চ হতে লাগলো আমার। মনে হলো কত অশরীরী আত্মা এখানে যেন আত্মবিলুপ্ত-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ছট্‌ফট্ করছে। কত অগণিত প্রাণী যেন অনুতাপের আগুনে পুড়ে ফাঁসিঘরের চারপাশেই হাহাকার করে বেড়াচ্ছে। আমি যেন চর্মচক্ষে তাদের দেখতে পেলাম। আমার আর ত্রিপাঠির চারপাশে তারা যেন এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো। আমাদের কৌতূহলের নিবৃত্তির চেষ্টা করতে লাগলো। আমাদের দিকে হাত নেড়ে কী সব বলতে চেষ্টা করতে লাগলো। তাদের কত গোপন কথা, যা কাউকে বলা হয়নি, কাউকে বলবার সুযোগ পায়নি তারা, তাই-ই আমাকে বলবার জন্যে তারা আকুলি-বিকুলি করতে লাগলো। হঠাৎ যেন মনে হলো সেই মরচে-ধরা পুরোন কপিকলটা বন্‌বন্ করে ঘুরে গিয়েই থেমে গেল মাঝপথে, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট যান্ত্রিক শব্দ হলো, আর আমি ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠেছি—

ত্রিপাঠি আমার দিকে দেখে অবাক হয়ে গেছে।

এক মুহূর্তে দৌড়ে এসে ধরে ফেললে আমাকে।

বললে—কী হলো হুজুর?

বললাম—ও কিছু না—

ত্রিপাঠি বললে—তবে ওরকম করে উঠলেন কেন?

বললাম—কী রকম একটা গন্ধ নাকে গেল হঠাৎ, তাই—

ত্রিপাঠি বললে—কই গন্ধ তো আমি কিছু পাচ্ছি না হুজুর! কোথায় গন্ধ? কিসের গন্ধ?

বললাম—তুমি ব্যস্ত হয়ো না, ও কিছু না—

ত্রিপাঠি বললে—চলুন—এবার রাজ-প্যালেসের ভেতরটা দেখিয়ে আনি—

বললাম—এখন থাক্ ত্রিপাঠি, শরীরটা কেমন করছে যেন আমার—

তখনি ডাক-বাংলোয় ফিরে এলাম। সমস্ত মনটা যেন আচ্ছন্ন হয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কখন মনে নেই।

বিকেলবেলা ত্রিপাঠি এসেছিল, তখনও আমি ঘুমোচ্ছি। আগের দিন ট্রেনে পরিশ্রম গেছে, তারপর সকালের শহর-পরিক্রমা। সন্ধেবেলা যখন এল ত্রিপাঠি, তখন ডাক-বাংলোর পোর্টিকোর তলায় একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে আছি।

BanglaBook.org

সামনের বিলীয়মান সূর্য শেষ আভা দিয়ে সমস্ত চন্দনপুরকে সাজিয়ে দিয়েছে। ওদিকে রাজ-প্যালেসের গম্বুজটা তখনও লাল হয়ে আছে, আর তলার সিংহদরজা, অতিথিশালা, হাসপাতাল, কোর্ট-কাছারি, জেলখানা সমস্ত ঝাপসা। আমার মনে হলো বহুদিন আগেকার ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারের সমস্ত চাবিকাঠি যেন হঠাৎ আস্তে আস্তে নতুন যুগের দরজায় লাগিয়ে দিলে কেউ। আর সঙ্গে সঙ্গে সব রূপ বদলে গেল। মহারাজাবাহাদুর রঘুজিত সিং দেব বিক্রম একদিন রথের সময় বেরোতেন রাজপথে। সেদিন রথের উৎসবে সমস্ত চন্দনপুর উৎসব-মুখর হয়ে উঠতো। ট্যুরিস্ট-গাইডে তার আঁকানো ছবি আছে। তার বিবরণ আছে। দুর্গামন্দিরের সামনে এসে রথটা দাঁড়াতো খানিকক্ষণ। রথের ওপর থেকে রাজপুরোহিত ফুলের মালা ছিঁড়ে ছিঁড়ে জনতার মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন। প্রসাদ ছুঁড়ে দিতেন। শান্তিজল ছিটিয়ে দিতেন। চন্দনপুরের উৎসব-মুখর জীবনে সে এক মহাদিন গেছে। তখন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ছিল যথারীতি। কিন্তু স্টেটের ভেতরের কাজে মহারাজাবাহাদুরের ওপর হস্তক্ষেপ করতেন না।

রঘুজিত সিং দেব বিক্রমের পর মহারাজাবাহাদুর হলেন রণজিত সিং দেব বিক্রম। তখন বিলিতি প্রথা ঢুকলো চন্দনপুরে। চন্দনপুরের ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার, উকীল সবই বিলিতি প্রথায় মানুষ। খাস বিলিতি-শহর কলকাতা থেকে আমদানী! রণজিত সিং দেব বিক্রম যখন এতটুকু বয়সের, তখন থেকেই কলকাতা থেকে আমদানী হয়েছিল বিলিতি আয়া, বিলিতি টিউটর, বিলিতি গাড়ি, বিলিতি পোশাক-পরিচ্ছদ সব। সেই রণজিৎ সিং দেব বিক্রম লেখাপড়া করতে গেল রাইপুরের রাজ-কলেজে! লেখাপড়া শেষ করে এল চন্দনপুরে। তখনও বিলিতি মাস্টার সঙ্গে সঙ্গে। ছেলে ঘোড়ায় চড়া শিখেছে, ইংরেজী কেতায় খানা খেতে শিখেছে, ইংরেজী কথা বলতে শিখেছে। সেদিন কি রণজিত সিং দেব বিক্রম ভাবতে পেরেছিল তাকেই একদিন আবার এই চন্দনপুর, এই রাজত্ব ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে শেষ-জীবনটা সাধারণ মানুষের মত কাটাতে হবে?

হঠাৎ ত্রিপাঠির গলায় চমকে উঠলাম—

—হুজুর—!

ত্রিপাঠির গায়ে একটা দেশী-তাঁতির তৈরী শার্ট আর হাঁটু পর্যন্ত ঝুল ধুতি। সাবান-কাচা পোশাক। মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুল। চন্দনপুরের রাজসরকার শেষ হবার পর থেকেই ত্রিপাঠির অবস্থা খারাপ হতে শুরু করেছে। আগে বড় বড় সাহেব-সুবো আসতো। আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্মান, ফ্রান্স, ইটালি থেকে ট্যুরিস্টরা আসতো। তাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখাতো ত্রিপাঠি। তার কাজের শেষে মোটা টাকা মজুরি দিয়ে যেত। সঙ্গে বখশিশও দিয়ে যেত। যে কদিন থাকতো, তাদের খরচেই খাওয়া-দাওয়া চলতো ত্রিপাঠির। আর তখন সস্তা-গণ্ডার সময় ছিল চন্দনপুরে। ধান-চালের জন্যে ভাবতে হতো না বিশেষ ত্রিপাঠিকে। যাবার সময় টাইপ-করা সার্টিফিকেট দিয়ে যেত আবার। সেই সব সার্টিফিকেটগুলো জমিয়ে রেখেছে ত্রিপাঠি।

কিন্তু এখনই হয়েছে মুশকিল! এখন বেশির ভাগই আসে মিনিস্টার আর ডেপুটি মিনিস্টারের দল। সরকারী খরচে তারা যেখানে দু'দিন থাকে, তারপর আবার চলে যায়। তারপর যারা আবার ভি-আই-পি, তারা আরো সাংঘাতিক। হাকিমের চেয়ে পেয়াদা বড়। হাকিমের হুকুম তবু নড়ে, কিন্তু ভি-আই-পির হুকুম নড়ায় কার সাধ্যি!

অন্ধকার হয়ে আসছিল।

BanglaBook.org

ত্রিপাঠি হারিকেনটা পাশে রেখে বসলো। লাঠিটাও গুছিয়ে রাখলে হাতের কাছে।

বললে—হুজুর, আজকে তো আর কোথাও গেলেন না।

বললাম—না, সকালবেলা অনেক ঘোরা হয়েছে, তাই বড় ক্লান্ত ছিলাম—

ত্রিপাঠি বললে—এই রকম করে দেখাই ভালো হুজুর, হুট্ করে দেখে হুট্ করে চলে গেলে ভালো করে দেখাও হয় না।

জিজ্ঞেস করলাম—আর কী কী দেখবার জিনিস আছে এখানে?

ত্রিপাঠি বললে—চন্দনপাহাড় দেখবার আছে হুজুর—

—চন্দনপাহাড়? চন্দনপাহাড়ে কী আছে?

ত্রিপাঠি বললে—আজ্ঞে হুজুর, ওই চন্দনপাহাড়ের ওপারেই মহারাজের তয়খানা ছিল—গরমের দিনে মহারাজাবাহাদুর তো ওখানেই তয়খানাতে কাটাতেন—

খানিক পরে ত্রিপাঠি বলতে লাগলো—ওই চন্দনপাহাড়ের দিক গেলেই সেকালের সব জিনিস দেখতে পাবেন। শহর বলতে তো ওইটেই! এদিকে যা কিছু দেখছেন সব নতুন চন্দনপুর। এই বাংলো বাড়ী, এই হাকিমের কোয়ার্টার, গল্ফ খেলার ক্লাব, পোলো-দৌড়ের মাঠ, এই কাছারি-বাড়ি, এই ইস্কুল এ-সবই নতুন। এ-সবই আমাদের নতুন মহারাজাবাহাদুর বানিয়েছিলেন, এই রণজিত সিং দেব বিক্রম বাহাদুর—

জিজ্ঞেস করলাম—এ-সব নতুন করে বানালেন কেন?

ত্রিপাঠি বললে—নতুন মহারাজাবাহাদুর একটু আপ-টু-ডেট্ কিনা!

ত্রিপাঠি ছোটবেলায় ইস্কুলে লেখাপড়া করেছিল। মাঝে মাঝে তাই কথার মধ্যে ইংরেজী বেরিয়ে পড়ে।

ত্রিপাঠি আবার বললে—তা ছাড়া নতুন মহারাজাবাহাদুর যে বিলেত-ফেরত।

—রণজিত সিং দেব বিক্রম আবার বিলেত গিয়েছিলেন নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর। চন্দনপুরের রাজবংশে নতুন মহারাজাবাহাদুরই প্রথম বিলেতে গেলেন। মহারাণী একটু আপত্তি করেছিলেন। মহারাণী তো সেকেলে মানুষ!

—মহারাণী কে?

ত্রিপাঠি বললে—আজ্ঞে, মহারাজাবাহাদুরের মা-সাহেবা—

মহারাজাবাহাদুর রঘুজিত সিং দেব বিক্রমের বিধবা স্ত্রী তখন মাথার ওপর। তিনি নাকি সেকেলে মানুষ। তিনি মাথার উপর ছিলেন বলেই তখনও ব্রাহ্মণ-পুরুতদের খাতির ছিল রাজ-প্যালেসে। এদিকে সাহেব-মেমসাহেবদের ভিড়। এদিকে পোলো খেলা, গলফ্-খেলা খানা-পিনা চলছে। বিলিতি মদ আর হাওয়া-গাড়ি উড়ছে। বড়দিনের সময় মহারাজাবাহাদুর সাহেব মেমসাহেবদের নিয়ে নিষিদ্ধ খানাপিনা করছেন। কিন্তু ওদিকে মা-সাহেবার প্যালেসে তখনও পুজোর কাঁসর-ঘণ্টা, আহ্নিক, জপ-তপ, কোষা-কুষি, যেমন আগে চলতো তেমনি সব ঠিক আছে। মা-সাহেবা ভারি ধর্মশীলা। ভারি ভক্তি ধর্ম-কর্মে। মহারাজাবাহাদুর রঘুজিত সিং দেব বিক্রম মারা যাবার পর থেকেই তাঁর ধর্ম-কর্ম বেড়ে গিয়েছিল। প্রতিদিন ভোরে তাঁর মন্দিরে পুজোর ফুল যোগান দেবার নিয়ম আছে। রণজিৎ সিং দেব বিক্রম যখন এই নতুন প্যালেস্ তৈরী করলেন, তখন মা-সাহেবাকে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি রাজি হন্নি।

মা-সাহেবা বলেছিলেন—না বাবা, আমি এখানেই থাকি, এই আমার ভাল, এখানে আমার ঠাকুর আছেন—

BanglaBook.org

রণজিত সিং দেব বিক্রম বলেছিলেন—কিন্তু তুমি একলা এখানে কী করে থাকবে মা?

মা-সাহেবা বলেছিলেন—তুই কিছু ভাবিস নি, আমি থাকবো ঠিক—

—কিন্তু এখানে যে তোমাকে দেখবার কেউ থাকবে না মা-সাহেবা!

—আমার ঠাকুর আমাকে দেখবে।

রণজিত সিং দেব বিক্রম সাহেব মানুষ। বিলেতফেরত! তিনি ও-সব মানতেন না। ওই ঠাকুর-দেবতা। ও তো পুতুল। কিন্তু মা-সাহেবার সামনে ও-সব কথা বলবার সাহসও হতো না তাঁর। মা-সাহেবাকে বড় ভয় করতেন তিনি। মা-সাহেবাকে চন্দনপাহাড়ের প্যালেসে দেখে রণজিত সিং দেব বিক্রম তাঁর নতুন প্যালেসে চলে এসেছিলেন বটে, কিন্তু যেতেন একবার করে রোজ। রোজ পোলো-খেলার শেষে গাড়ি নিয়ে বেরোতেন রাণী-সাহেবার সঙ্গে। গিয়ে মা-সাহেবার চন্দনপাহাড়ের প্যালেসে গিয়ে দেখা করে আসতেন।

মা-সাহেবার প্যালেসে গিয়ে রোজ একবার করে চা না খেলে তিনি রাগ করতেন। তিনি তখন নিজের পুজো জপ্‌তপ্‌ সেরে অপেক্ষা করতেন।

ছেলে এসে পায়ের ধুলো নিত মায়ের। রাণী-সাহেবাও এসে পায়ের ধুলো নিত।

মহারাজাবাহাদুর রঘুজিত সিং দেব বিক্রমের একটা অয়েল-পেণ্টিং-এর তলায় বসে থাকতেন মা-সাহেবা। দু'পাশে ঘি-এর প্রদীপ। পুজোর প্রসাদ রেখে দিতেন রণজিত আর পুত্রবধূর জন্যে। প্রথম মা-সাহেবার পায়ের ধুলো নিয়ে তারপর প্রসাদ খেতেন। চন্দনপুরের সব খবরাখবর নিতেন। জিজ্ঞেস করতেন—দক্ষিণ-পাড়ার এবার ফলন হলো কেমন?

রণজিৎ সিং দেব বিক্রম বলতেন—এবার খুব ভাল ফলন হয়েছে, ও-পাড়ায় এবার ঘটা করে পুজো করবে ওরা—

মা-সাহেবা বলতেন—ওদের পুজোয় রাজ-তহবিল থেকে কিছু দেওয়া হচ্ছে?

—কই? ওরা তো চায়নি!

মা-সাহেবা বলতেন—না চাক, তবু পাঁচশো টাকা ওদের দেবার বন্দোবস্ত করো, তাতে দেব বিক্রম বংশের মঙ্গল হবে—

মা-সাহেবা আরো সব নানা রকম উপদেশ দিতেন, পরামর্শ দিতেন।

বলতেন—শুনলাম হাওয়াখানার ভেতরে খাবার জল নিতে দেওয়া হচ্ছে না কাউকে?

—ওরা জল বড় নষ্ট করে মা-সাহেবা, তাই আইন করে জল নেওয়া বন্ধ করতে হয়েছে।

—কিন্তু ওরা খাবার জল কোত্থেকে পাবে?

রণজিত সিং দেব বিক্রম বললেন—তার জন্যে তো টিউব-ওয়েলের বন্দোবস্ত হচ্ছে।

—যতদিন না হয়, ততদিন? ততদিন কি ওরা উপোস করবে?

রণজিত সিং দেব বিক্রম বললেন—ততদিন কুয়োর জলে কাজ চালাক্‌ ওরা,—

—কিন্তু পাত্‌কুয়োর জলে কি কুলোবে ওদের?

—একটু কষ্ট করে ওরা চালাক না, তারপর টিউব-ওয়েল তো এসেই যাচ্ছে, কলকাতায় অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে, দু'একদিনের মধ্যেই কাজ শুরু হয়ে যাবে—

এই রকম অনেক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হতো মা-সাহেবার সঙ্গে। দিনের বেলা রণজিত সিং দেব বিক্রম স্টেটের কাজ করতেন সেক্রেটারির সঙ্গে। সেক্রেটারি

BanglaBook.org

ছিল, মিনিস্টার ছিল, ডেপুটি মিনিস্টার ছিল। স্টেটের পরিচালনার জন্যে যা যা থাকা দরকার, সবই ছিল চন্দনপুরে। সবই আমদানি করেছিলেন রণজিত সিং দেব বিক্রম। মহারাজাবাহাদুরের মৃত্যুর পর চন্দনপুরে স্টেট্ এর নতুন চেহারা হয়ে গিয়েছিল। হাওয়াখানাটা নতুন করে গড়ে তুলেছিলেন রণজিত সিং দেব বিক্রম। পাব্লিকের যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। চন্দনপুরে নতুন রাজ-প্যালেস্ হয়েছিল। কলকাতা থেকে বিলিতি কন্ট্র্যাকটর এসে নতুন করে সিমেণ্ট কন্ক্রিটের বিল্ডিং করলে। চন্দনপাহাড়ের পুরোন প্যালেস্ ছিল পাথরের গাঁথা। নিচু নিচু খিলেন, ছোট ছোট দরজা। ঘরে তেমন আলো ঢোকে না। চুন-সুরকির ছাদ। কিন্তু নতুন পাড়ার নতুন প্যালেস্ হলো কন্ক্রিটের। এখানে সব বিলিতি কেতা। হল, ডাইনিং রুম, বল্ রুম্, পার্লার সমস্ত বিলিতি কায়দায়। রণজিত সিং দেব বিক্রম নিজে প্ল্যান্ পছন্দ করে প্যালেস্ করালেন। মহারাণীর জন্যে গভর্নেস এল। শহরে সিনেমা হাউস হলো। কোনও কিছু আর খুঁত রইল না কোথাও।

ত্রিপাঠি বললে—তখন আমরা ছোট হুজুর, স্টেটের ইস্কুলে পড়ি—

ত্রিপাঠিরা বন্ধু-বান্ধব মিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিস্ত্রী খাটানো দেখতো। ওই হাসপাতাল হবার সময় দেখেছে। টিউব-ওয়েল হবার সময় দেখেছে। নতুন চন্দন-পুর গড়ার সময় ত্রিপাঠি স্কুলে আসবার আর যাবার পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে! কেমন করে কোথা থেকে মার্বেল পাথর এল, সিমেণ্ট এল, ক্রেন এল, টিউব-ওয়েলের পাইপ্ এল, সব নিজের চোখে দেখেছে ত্রিপাঠি। পুরোন ভাঙা স্তূপের মধ্যে থেকে যেন নতুন স্বর্গ গড়ে উঠলো সকলের চোখের ওপর। চন্দনপুর দেখতে দূর দূর থেকে টুরিস্ট আসতে লাগলো। আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মান, ইটালী থেকে সাহেব-মেমরা এল। তাদের থাকবার খাবার ব্যবস্থার জন্যে গেস্ট-হাউসও হলো। সে এক আরব্য উপন্যাস যেন গজিয়ে উঠলো রাতারাতি চন্দনপুরের বুকে!

মহারাজাবাহাদুর রণজিত সিং দেব বিক্রম তখন অনেক টাইটেল পেয়ে গেছেন। অত মনেও রাখা যায় না সব। নামের পাশে অনেকগুলো ইংরেজী অক্ষর বসে। যারা বিদেশ থেকে চন্দনপুর দেখতে আসে তারা বাহবা দেয়। হাওয়াখানার দোতলায় উঠে শহরের ছবি তোলে ক্যামেরা দিয়ে।

বলে—বিউটিফুল সিনারি—

কেউ কেউ বলে—ইণ্ডিয়ার সুইজারল্যাণ্ড্—

লোকে যত প্রশংসা করে রণজিত সিং দেব বিক্রমের বুকটা গর্বে দশহাত হয়ে ওঠে।

ওদিকে চন্দনপাহাড়ের দিকটা তেমনি পুরোনোই ছিল তখনও। সেই বস্তি-বাড়ি, সেই পুরোনো ইটের খিলেন। সেই সরু গলি, মাটির রাস্তা, কাঁচা ড্রেন, সেদিকে টুরিস্টরা যায় না। সেদিকে তাদের যেতে দেন না মহারাজাবাহাদুর রণজিত সিং দেব বিক্রম। এদিকটা সবাই দেখুন। এদিককার সিটির বড় বড় চওড়া রাস্তা, এদিককার হাসপাতাল, স্কুল-বিল্ডিং, রাজপ্যালেস, গেস্ট-হাউস, মিণ্ট্, হাওয়াখানা সব কিছু চমৎকার। হাওয়াখানার ওপর উঠে সূর্য ওঠা দেখো, সূর্য অস্ত যাওয়াও দেখো। ফোটো তোলো ক্যামেরা দিয়ে। বিলেতের কাগজে ছাপাও। তাতে চন্দন-পুরের নাম হবে, খ্যাতি হবে, মহারাজাবাহাদুরের গৌরব বাড়বে।

কিন্তু একটা খুঁত রয়ে গেল তবু!

আমেরিকার কয়েকজন টুরিস্ট এসে সব কিছু দেখে বাহবা দিলে। কিন্তু বললে—ফাঁসিঘর কোথায়? ফাঁসিঘর? তোমাদের কন্ভিক্ট্দের ফাঁসি দেওয়া হয়

BanglaBook.org

না? যারা মার্ডার করে, খুন করে—?

এ-কথার উত্তর দেওয়া যায় না!

ত্রিপাঠি বললে—তা একদিন হঠাৎ শুনলাম, চন্দনপুরে নাকি ফাঁসিঘর হবে—

মহারাজাবাহাদুরের প্রাণে কথাটা লেগেছে। সবই আছে, শুধু একটা খুঁত রয়ে গিয়েছিল তখনও।

সার্কুলার বেরিয়ে গেল সেই দিনই চন্দনপুরের রাজ-দরবারে।

ত্রিপাঠি বললে—আমরা সেদিন ইস্কুলে যাচ্ছি হুজুর, এক দল যাচ্ছি ইস্কুলে, দেখি জেলখানার সামনে একটা জায়গায় পাথর-কাটা কল চলছে। সাহেব ইঞ্জিনীয়র এসে তদারকি করছে মাথায় টুপি দিয়ে। কুলি-মজুর খাটছে দলে দলে।

একজন মজুরকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—এখানে কী হচ্ছে গো মিস্ত্রী?

তারা বললে—ফাঁসিঘর।

ত্রিপাঠি গল্প শুরু করেছিল আমার পাশে বসে। ডাক-বাংলোর ইজিচেয়ারে বসে আমি হেলান দিয়ে আছি। আর আমার পাশে আমার গাইড্ মুরারি ত্রিপাঠি মাটিতে বসে গল্প করছে।

চারিদিকে সন্ধ্যে নেমেছে। চন্দনপুরের অন্ধকার এক রহস্যের আবরণ সৃষ্টি করেছে চারিদিক ঘিরে। ত্রিপাঠি তেল বাঁচাবে বলে হারিকেনটাও নিভিয়ে দিয়েছে। বেশ লাগছিল। দুপুরবেলা রোদে ঘুরে ঘুরে যে ক্লান্তিটা এসেছিল, লাঞ্চের পর একটু ঘুমিয়ে নিয়ে শরীর-মন দুটোই বেশ ঝরঝরে হয়েছিল।

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

ত্রিপাঠি বললে—সকালবেলা যে-ফাঁসিঘরটা দেখলেন হুজুর, ওইটে তো এখন ওইরকম দেখছেন। কিন্তু ওটা তৈরি করতে তখন একলাখ টাকা খরচ হয়েছিল হুজুর—ওরই জন্যে পাকা ফার্স্ট ক্লাস ইট এসেছিল হুজুর কলকাতা থেকে। আগাগোড়া ইট আর সিমেন্টের গাথ্‌নি।

জিজ্ঞেস করলাম—তা ওইটুকু একটা বাড়ি তৈরি করতে এক লাখ টাকা লাগলো? বলছো কি তুমি ত্রিপাঠি?

ত্রিপাঠি বললে—আমি আর কোথা থেকে জানবো হুজুর! এক লাখ টাকা আমি চোখেও কখনও দেখিনি, এক লাখ টাকা আমি কল্পনাও করতে পারি না জীবনে—আমি যা লোকের মুখে শুনেছি, তাই আপনাকে বললুম হুজুর—

তারপর বলতে লাগলো—চন্দনপাহাড়ের ইস্কুলমাস্টার ছিল পানিগ্রাহীবাবু, তিনিই বলেছিলেন একলাখ টাকা খরচ করে ফাঁসিঘর বানানো হচ্ছে—

পানিগ্রাহীবাবু ছিলেন বুড়ো মানুষ। তিনি ভূগোল পড়াতেন আমাদের। তাঁর কথা আমরা মিথ্যে ভাবতে পারি না। মাস্টারমশাই-এর কথা শুনে আমরা ভেবেছিলাম—তা হবেও বা। আমাদের কাছে লাখটাকাও যা হুজুর হাজারটাকাও তাই। লাখে-হাজারে আমাদের কাছে কোনও তফাৎ নেই। তা সেই ইস্কুলে যাবার পথে আমরা প্রথম দিন দেখলাম লরি-ভর্তি ইট নামছে। আর কুলী-মজুররা পাথর কাটছে। পাথর কাটা কি সোজা কথা। পাথর কাটতেই তো অনেক টাকা লাগবার কথা। দলে দলে মিস্ত্রী-মজুর এসেছে আর তদারকি করছে এক টুপি-পরা সাহেব।

তারপর বাড়িটা তৈরি হলো।

দেওয়াল হলো, ছাদ হলো, দরজা হলো।

আমরা ছেলেরা গিয়ে দাঁড়াই, আর মিস্ত্রী-মজুরদের কাজ দেখি।

BanglaBook.org

মিস্ত্রীদের জিজ্ঞেস করি—কোন জায়গাটায় ফাঁসি হবে গো মিস্ত্রী?

মিস্ত্রীরা ভেতরটা দেখিয়ে দেয়। বলে—ভেতরে—

আবার জিজ্ঞেস করি—কেমন করে ফাঁসি হবে?

মিস্ত্রীরা হেসে বলে—গলায় ফাঁস লাগিয়ে—

গলায় ফাঁস লাগিয়ে যে ফাঁসি দেওয়া হয়, তা আমরা জানতাম। কিন্তু কী ভাবে যে ফাঁসটা লাগাতে হয়, কী দিয়ে ফাঁস লাগানো হয়, সেটা কিসের দড়ি, কোথায় কী ভাবে মানুষটা ঝোলে তা জানতাম না। তাই আমরা সেই বয়সে খুব কৌতূহল নিয়ে ফাঁসিঘর তৈরি করা দেখতাম!

তখন আমাদের সমস্ত মনটা জুড়ে দিনরাত কেবল ওই একই চিন্তা। বন্ধুদের সঙ্গে, পাড়ার লোকের সঙ্গে কেবল ওই নিয়েই আলোচনা। ওই একই কথা সকলের মুখে। রাস্তায়, ঘাটে, দোকানে, বাজারে সব জায়গায়।

কেউ বলে—এবার জব্দ হবে সবাই, বুঝলে হে—

আর একজন বলে—ফাঁসি অমনি হলেই হলো না, ফাঁসির অনেক ল্যাটা—

—কী রকম ল্যাটা?

পাশের লোকটা বলে—ফাঁসি দেবার জন্যে মাইনে করা লোক রাখতে হবে—তাকে মাসে মাসে মাইনে দিতে হবে!

—তা দেবে মাইনে মহারাজাবাহাদুর। মহারাজা রণজিত সিং দেব বিক্রম বাহাদুরের কি টাকার অভাব আছে নাকি!

কেউ কেউ বলতো—কে ফাঁসি দেবে?

আর একজন বলতো—পয়সা দিলে ফাঁসি দেওয়ার লোক পাওয়া যায়। তারা হিন্দু নয়, ডোম—

কেউ বলতো—ডোমই হোক আর হিন্দুই হোক, ফাঁসি দিলে পরলোকে গতি হয় না—

পাশ থেকে একজন বলতো—পরলোকে গিয়ে তারও ফাঁসিতে লট্‌কাতে হবে বাবা, তখন সুদে-আসলে শোধ হবে সব—

তখন জানতে ইচ্ছে হলো আমাদের, কে ফাঁসি দেবে! কী রকম দেখতে তাকে!

কেউ কেউ বললে—তাকে কলকাতা থেকে আনানো হবে!

—তা কত মাইনে দেবে তাকে?

—পঞ্চাশ টাকা!

একজন বললে—পঞ্চাশ টাকার জন্যে ফাঁসি দেবে, বলো কি হে?

তুমুল তর্ক উঠতো শেষকালে তাই নিয়ে। পঞ্চাশ টাকা না একশো টাকা! একশো টাকার কমে ফাঁসিদারের মাইনে হয় কি না তাই নিয়ে তর্ক বেধে যেতো। সে-সময়ে চন্দনপাহাড়ের সব জায়গায় ওই একই আলোচনা। কারোর কোনও সমস্যা নেই আর। বুড়ো, ছেলে, ছোকরা সবাই এক ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত।

রাস্তায় কারোর সঙ্গে দেখা হলেই একজন জিজ্ঞেস করে—শুনেছ হে, চন্দনপুরে ফাঁসিঘর হচ্ছে?

—ও খবর তো পুরোন হয়ে গেছে!

—শুনেছি ফাঁসি দেবার লোক এসে গেছে নাকি?

লোকটা হাসে। বলে—ফাঁসি দেবার লোক এখনই আসবে কী হে! আগে ফাঁসিকলই আসুক! ফাঁসিকলই যে এখনও আসেনি!

—কবে ফাঁসিকল আসবে হে?

সেই দিনের জন্যেই সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে রইল। শোনা গেল ফাঁসিকলের

BanglaBook.org

অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। অর্ডার দেওয়া হয়েছে খাস বিলেতে। একেবারে বিলেত থেকে আসল ফাঁসিকল আসবে। বিলিতি মাল। ভেজাল থাকবে না। ফাঁসি দিতে গিয়ে হঠাৎ যে গলায় আটকে গিয়ে আধমরা হয়ে রইল আসামী, তা হবার উপায় নেই। একবার শেকলটা ধরে টানলেই পায়ের পাটাতনটা খসে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে গলায় ফাঁস লেগে যাবে।

সমস্ত চন্দনপুর তখন ফাঁসি দেখবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।

রণজিত সিং দেব বিক্রম-এর মটরগাড়িটা রাস্তা দিয়ে গেলেই, ধুলো উড়ে সকলের নাকে এসে লাগে। সঙ্গে পাশে থাকে মহারাণী! বিলিতি কোট-প্যান্ট-পরা চেহারা। মহারাজার খাস কলকাতার বিলিতি কোম্পানী থেকে তৈরী। আগেকার মহারাজাবাহাদুর কোট-প্যান্ট পরতেন না। তিনি পরতেন পাগড়ি আর সিল্কের আচকান। গলায় অনেক সময় পাকানো চাদর জড়ানো থাকতো। কপালে চন্দনের ফোঁটা লাগানো থাকতো।

ত্রিপাঠি বললে—তারপর একদিন শুনলাম হুজুর, ফাঁসিকল এসে গেছে—

আমরা ইস্কুলের ছেলেরা ছুটির পর দল বেঁধে গেলাম দেখতে। বিরাট একটা কাঠের বাক্স। চারদিকে লোহার পাত দিয়ে পেরেক আঁটা। মিস্ত্রীরা এসেছে ফাঁসি-কলের সঙ্গে। বিলেতের কোম্পানী একেবারে জাহাজে করে ফাঁসিকল পাঠিয়েছে কলকাতায়। কলকাতার জেটি-ঘাটে মাল নামিয়েছিল। সেখান থেকে রেলে করে পাঠিয়ে দিয়েছে চন্দনপুরে। চন্দনপুরে মালও এসেছে আর সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসিকল লাগিয়ে দেবার জন্যে মিস্ত্রীও এসেছে। হাতুড়ি বাটালি নিয়ে সেই ফাঁসিকলের প্যাকিং বাক্স তারা খুলতে লাগলো।

আমরা ইস্কুলের সব ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখতে লাগলাম। কখন ফাঁসিকল বেরোবে বাক্স থেকে। কখন ফাঁসিকল লাগবে তার জন্যেই আমরা দাঁড়িয়ে দেখছিলুম। অপেক্ষা করছিলুম।

একজন ছেলে একেবারে এগিয়ে গিয়ে দেখছিল।

মিস্ত্রী ধমক দিলে—এই খোকা, এখানে কী, এখানে কী দেখতে এসেছ?

সে বললে—ফাঁসিকল খোলা দেখবো—

—ফাঁসিকল দেখবে তো এখানে কী, আগে লাগানো হোক!

ছেলেটা বললে—ফাঁসিকলের চেহারাটা দেখবো—

মিস্ত্রীটা বললে—ফাঁসিকলের চেহারা দেখতে হবে না, যাও এখান থেকে সব, সরে যাও—নইলে ধরে নিয়ে যাবো—

সেদিন যে কী উত্তেজনা আমাদের, তা মিস্ত্রী কী করে বুঝবে! শুধু আমাদের নয়, চন্দনপুরের সব লোকেরই ইতিহাসে কখনও ফাঁসিকল বসেনি আগে। সুতরাং উত্তেজনা বড়দেরও কিছু কম নয়। আমাদের সঙ্গে বড়দেরও ভিড় ছিল। বুড়ো-বুড়ো লোকরাও দেখছিল দাঁড়িয়ে। তাদের কেউ কিছু বলছিল না। গম্ভীর হয়ে তারা দেখছিল শুধু চুপ করে। আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলাম আমরা, ফাঁসিকল তো এল। এখন কার ফাঁসি হবে। চন্দনপুরের কার গলায় প্রথম ফাঁসির দড়ি লট্‌কাবে!

পাড়ার লোকেরাও সেই আলোচনা করতো।

সেদিন আর আমাদের বাক্স খোলা দেখা হলো না হুজুর। বিরাট কাঠের বাক্স। একেবারে বিলেত থেকে এঁটে এসেছে। সে খোলা কি অত সহজ হুজুর। খুলতে খুলতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। আমরা বাড়ি চলে এলাম যে-যার। রাত্রে বাড়ি এসেও ঘুম হলো না ভাল। ঘুমের ঘোরে ফাঁসিকলের স্বপ্ন দেখলুম। তারপর ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই ভেবেছি কখন ইস্কুলে যাব। কখন ইস্কুলে যাবার পথে

BanglaBook.org

ফাঁসিকল দেখবো। তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে নিয়ে সবাই সেদিন আগে ইস্কুলে যাবার জন্যে তৈরী। আবার দল বেঁধে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু গিয়ে দেখি তখন শুধু কয়েকটা মোটা-মোটা কাঠ আর পেরেক আর লোহার পাতের টুকরো শুধু পড়ে আছে সেখানে। আর কিছুই নেই। বাক্স তখন ভাঙা হয়ে গেছে। ফাঁসিকল খোলা হয়ে গেছে। তখন ফাঁসিঘরের ভেতরে ফিট্ করছে মিস্ত্রীরা।

কিন্তু কাছে যাবার উপায় নেই।

চারিদিকে বাঁশের বেড়া দিয়ে দিয়েছে ভিড়ের জন্যে। পুলিস দাঁড়িয়ে আছে চারিদিকে। পাহারা দিচ্ছে তারা। কাউকে ঢুকতে দেবে না ভেতরে।

তবু ভয়ে ভয়ে বাঁশের বেড়ার বাইরেই আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। বাইরে থেকে দেখতে লাগলাম ফাঁসিঘরের ভেতরে তখন মিস্ত্রীরা ঠং ঠং করে হাতুড়ির ঘা দিচ্ছে লোহার উপর। রাজমিস্ত্রীরা সিমেণ্ট্ বালি দিয়ে লোহা গাঁথছে ইটের সঙ্গে। লোহার মিস্ত্রী রাজমিস্ত্রী কুলী-মজুর সবাই কাজ করছে। তারা সবাই ভেতরে ঢুকে কাজ করছে। বাইরে থেকে বিশেষ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু দেখা যাচ্ছে অনেক লোক কাজে ব্যস্ত। তবু কি আমাদের কৌতূহল কমে! আমরা দূর থেকে হুমকি খেয়ে তাই-ই দেখতে লাগলাম হুজুর—

ইস্কুলের লেখা-পড়া আমাদের ঘুচে গেল।

শুধু আমাদেরই নয়! চন্দরপুরের সব লোকেরই কাজকর্ম ঘুচে গেল। কেউ আর অন্য কথা কিছু বলে না। কেউ আর অন্য কথার আলোচনা করে না। সবারই ওই এক কথা। ফাঁসিঘর আর ফাঁসিঘর!

সে ক'দিন যে কী ভাবে কেটে গেল তা আর আমরা টের পেলাম না।

তা ছাড়া চন্দনপুরের লোকেদের কথা ছেড়েই দিন হুজুর, চন্দনপুর স্টেটের কর্তারাও দেখতে এলেন একে একে।

জেলর সাহেব খাস বিলিতি। ডি'মণ্টি সাহেব। কালো চেহারা হলে কী হবে, তেজ ছিল খুব। ভয় করতো লোকেরা। তিনিও দেখতে এলেন! তাঁর কোয়ার্টারের পাশেই তৈরী হয়েছিল ফাঁসিঘর। তিনিও তদারক করে গেলেন। তাঁর বউ ছিল, ডি'মণ্টি বিবি। ডি'মণ্টি বিবিও তদারক করতে এলেন জেলর সাহেবের সঙ্গে। তাঁর ছেলে-মেয়ে ছিল প্রায় দু'গণ্ডা। বছর বছর ছেলে হতো ডি'মণ্টি বিবির। তাদের কেউ কিছু বললে না। ডি'মণ্টি সাহেবকে দেখেই পুলিসরা লম্বা সেলাম করলে। ডি'মণ্টি সাহেব বিবি-ছেলে-মেয়ে নিয়ে ফাঁসিঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলেন। মিস্ত্রীদের সঙ্গে কথা বললেন। ছেলেমেয়েরাও গিয়ে সব দেখতে লাগলো। ফাঁসি-কলে হাত দিলে। কেউ কিছু বললে না।

শুধু ডি'মণ্টি সাহেব নয়। চন্দনপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও দেখতে এলেন। কলিন্স্ সাহেব। ছুঁচলো দাড়ি ছিল চিবুকের ওপর। পাকা দাড়ি। গাড়িতে করে তিনিও এলেন বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে। ফাঁসিঘরের ভেতরে ঢুকলেন। সবাই তাঁকে সেলাম করলো। সবাই তাঁকে বুঝিয়ে দিলে কী ভাবে ফাঁসি দিতে হবে! কী ভাবে ফাঁস লাগানো হবে গলায়!

এলেন চন্দনপুরের দেওয়ানজী। ব্রাহ্মণ মানুষ। তাঁরও বিরাট গাড়ি। নরহরি মহাপাত্র। তাঁদের তিন-পুরুষ ধরে চন্দনপুরের দেওয়ানি কাজ। মহারাজাবাহাদুর রণজিত সিং দেব বিক্রমের পরেই তাঁর ক্ষমতা। তাঁকে দেখেই সব ভিড় সরে গেল। তিনি রোজ দুর্গা-মন্দিরে যান পুজো দিতে। মন্দির থেকেই সোজা এলেন ফাঁসিঘর দেখতে।

সবাই এক এক করে দেখে মহারাজাবাহাদুর রণজিত দেব বিক্রমের কাছে

BanglaBook.org

রিপোর্ট দিলেন।

রেসিডেন্ট জোন্‌স্‌ সাহেব নোট দিলেন কলকাতায়। কলকাতা থেকে সে-নোট গেল বিলেতে। বিলেতের পার্লামেন্টে ওই নিয়ে কথা উঠলো। নেটিভ-স্টেটের ক্ষমতার কথা উঠলো। তখন মহারাজাবাহাদুর জবাব দিলেন—সব স্টেটেরই যখন এ ক্ষমতা আছে তখন তারই বা কেন ফাঁসি দেবার ক্ষমতা থাকবে না! হায়-দারাবাদের নিজাম বাহাদুরের এ-ক্ষমতা আছে। বরোদার গায়কোয়াড়ের এ-ক্ষমতা আছে. সুতরাং তাঁরই বা এ-ক্ষমতা থাকবে না কেন? চন্দনপুর কি ছোট? চন্দনপুর কি তাচ্ছিল্য করবার মতো? চন্দনপুরও তো উনিশশো এগারো সালের দিল্লীর দরবারে হাজির ছিল। চন্দনপুরের মহারাজাবাহাদুর যখন কলকাতায় যান তখন সাতটা তোপ্‌ পড়ে কলকাতার কেল্লায়। তাছাড়া চন্দনপুর বছরে আশিলক্ষ টাকা রেভিনিউ দেয় ব্রিটিশ সরকারকে, সেটা কি কিছুই নয়?

এ নিয়ে কলকাতায় সাহেবদের কাগজ 'ইংলিশম্যান'-এ লেখা হলো। জল গড়ালো অনেক দূর। কলকাতা থেকে বড়লাটসাহেব এলেন চন্দনপুরের দেওয়ানজী নরহরি মহাপাত্রের সঙ্গে কথা বলতে। লাটসাহেব আসার পর অনেক খানা-পিনা হলো চন্দনপুরে। আতস-বাজি পোড়ানো হলো শহরময়। মহারাজাবাহাদুর রণজিত সিং দেব বিক্রম নিজে হ্যান্ড-শেক করলেন বড়লাটসাহেবের সঙ্গে রাজ-প্যালেসের সামনে। খবরের কাগজের লোকেরা ক্যামেরা দিয়ে তাঁদের ছবি তুলে নিলে।

ত্রিপাঠি বললে—চন্দনপুরে সেই প্রথম বড়লাট বাহাদুর এলেন হুজুর—

বড়লাট বাহাদুরকে সেই প্রথম চন্দনপুরের লোক চোখ মেলে দেখলে। কী চেহারা. কী জাঁক-জমক্‌! বড়লাটের মেমবাহাদুরও এল। সঙ্গে এল তাঁর সেক্রেটারী. তাঁর বডিগার্ড। তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গ সবাই। চন্দনপুরের ইস্কুল-বাড়ির সামনে বিরাট শামিয়ানা খাটানো হলো; টিকিট হলো দু'আনা করে। আমরা সবাই গেলুম বড়লাটকে দেখতে। ইস্কুলের ছুটি ছিল তিন দিন সেই উপলক্ষে।

সেদিন বিকেল থেকে চন্দনপুর আর চন্দনপাহাড়ের লোকদের আর বিশ্রাম নেই। দলে দলে লোক চলেছে শামিয়ানার দিকে। কাতারে কাতারে লোক। মানুষের যেন স্রোত চলেছে।

শামিয়ানার ভেতর সে কি বাহার! ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে চারিদিকে। লালনীল ফানুস ঝুলছে। লাল-নীল ফানুসের ভেতর আবার ইলেকট্রিক বাতির ডুম লাগিয়ে দিয়েছে। গোরা-পল্টন্‌ ব্যান্ড্‌ বাজ্‌না বাজাচ্ছে। চন্দনপুরের মিলিটারী সৈন্য আর পুলিসরা সব সার সার বন্দুক উঁচিয়ে বড়লাট আর তাঁর মেমবাহাদুরকে অভ্যর্থনা করলে। শামিয়ানার সামনে আলো দিয়ে লিখে দেওয়া হয়েছে—'ওয়েল-কাম্‌'। আমরা গিয়ে ভেতরে বসলাম।

দেখলাম সামনের সারিতে বসে আছেন রেসিডেন্ট্‌ জোন্‌স্‌ সাহেব, দেওয়ানজী নরহরি মহাপাত্র। তার পররে সারিতে ম্যাজিস্ট্রেট কলিন্‌স্‌ সাহেব। তাঁর পেছনে অনেক বড় বড় লোক সব। ডিমণ্টি সাহেবও বসে আছেন এক জায়গায় তাঁর বিবি আর দু'গণ্ডা ছেলে-মেয়ে নিয়ে। জম্‌জমাট আসর। সব চুপচাপ। এমন সময় বড়লাট আর তাঁর মেমবাহাদুর এলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে গোরা পল্টনরা ব্যান্ড্‌ বাজনা আরম্ভ করে ছিল—'গড্‌ সেভ দি কিং'।

সেই বাজনা আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সব লোক সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠলুম।

ব্যান্ড বাজনা থামার পর আরম্ভ হলো আসর। বক্তৃতা হলো।

BanglaBook.org

দেওয়ানজী নরহরি মহাপাত্র একটা লেখা বক্তৃতা পড়তে আরম্ভ করলেন। আমরা তার কিছুই বুঝতে পারলাম না। ইংরিজী বক্তৃতা। ইংরিজী বক্তৃতার পর হাততালি দিলাম চট্-পট্ করে সবাই মিলে।

তারপর মহারাজাবাহাদুর উঠলেন। মহারাজাবাহাদুর রণজিত সিং দেব বিক্রম। মহারাজাবাহাদুরও ইংরিজীতে লেক্চার দিলেন। ইংরেজ মাস্টার রেখে লেখা-পড়া করেছেন মহারাজাবাহাদুর। তারপর রাজ-কলেজে পড়েছেন। সবই বিলিতি কায়দা। সে-লেকচারেরও কিছুই আমরা বুঝলুম না হুজুর।

তারপর অনেকেই লেক্চার দিলেন।

শেষ উঠলেন বড়লাটবাহাদুর।

তাঁর বক্তৃতাও কিছু বুঝলাম না আমরা। কিন্তু কী চমৎকার ইংরিজী হুজুর। একটা থামা নেই, একটু কাশা নেই, একটু দম ফেলা নেই। একেবারে পুরী এক্স-প্রেসের মত গড়গড় করে বলে গেলেন দু'ঘণ্টা ধরে। কিছু বুঝতে পারছিলাম না, তবু ভাল লাগছিল।

বড়লাটবাহাদুরের লেক্চার শেষ হবার পর আমরা বুঝি আর না-বুঝি পেট-ভরে হাততালি দিলাম খুব।

সভা শেষ হয়ে গেল।

গেটের বাইরে পানিগ্রাহীবাবুর সঙ্গে দেখা। পানিগ্রাহীবাবুর কথা তো আপনাকে বলেছি হুজুর। আমাদের ভূগোলের মাস্টারমশাই।

জিজ্ঞেস করলাম—স্যার, বড়লাটবাহাদুর কী বললেন অত?

পানিগ্রাহীবাবু বললেন—বড়লাটবাহাদুর ফাঁসিঘর করতে দিতে রাজি হয়েছেন—

ফাঁসিঘর করতে দিতে রাজী হয়ে গেছেন!

আমাদের যেন আর আনন্দ ধরে না। এত দিন ধরে এত টাকা খরচ করে এত মেহনত্ করে যে শেষ পর্যন্ত পণ্ডশ্রম হলো না, তাইতেই আমরা খুশী। তাহলে ফাঁসিঘর হবে! তাহলে ফাঁসি হবার অনুমতি দিয়েছেন বড়লাটবাহাদুর!

আমরা তো খুবই খুশী!

পানিগ্রাহীবাবু বললেন—তোমরা তো সবাই খুশী, কিন্তু যার ফাঁসি হবে, তার কথাটা একবার ভাবো দিকিনি? তার কষ্টটার কথা একবার মনে করো দিকিনি?

তা বটে! ফাঁসিঘর তো হলো। ফাঁসিকলও তো বসল। ফাঁসিঘর করবার অনুমতিও দিলেন বড়লাটবাহাদুর। কিন্তু তার পরে কী হবে? কার ভাগ্যে ফাঁসি ঝুলছে?

পানিগ্রাহীবাবু বললেন—তোমরা তো মজা করে ফুর্তি করছো, কিন্তু তার কথা একবার ভাবো তো, যার ফাঁসি হবে?

যাহোক, বড়লাট আর তাঁর মেমবাহাদুর তো চলে গেলেন। তাঁর বডিগার্ড, সাঙ্গপাঙ্গ, সেক্রেটারিও চলে গেলেন। আবার আমাদের ইস্কুল খুলে গেল। শামি-য়ানা-টামিয়ানা খুলে আবার সব সমান করে ফেলা হয়েছে। আবার আমরা ইস্কুলে যেতে লাগলাম। ইস্কুলে যাবার পথে রোজই ফাঁসিঘরটা দেখতুম। দরজা তালাবন্ধ। ভেতরে উঁকি মেরে দেখবার উপায় নেই। ফুল্-টল্ সব বসানো হয়ে গেছে। বাইরে থেকে শুধু ইটের বাড়ীটা দেখা যেত। তবু আমরা সেই ফাঁসি-ঘরটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতুম। দেখতুম ফাঁসিঘরটার দিকে চেয়ে চেয়ে। আর ভাবতুম—কবে যে ফাঁসি হবে, আর আমরা দেখতে পাবো ফাঁসি হওয়া!

হঠাৎ পানিগ্রাহীবাবু একদিন বললেন—ফাঁসি দেবার লোক এসে গেছে—

BanglaBook.org

—কোথায় স্যার, কোথায় এসেছে?

আমরা সবাই এক সুরে জিজ্ঞেস করলাম পানিগ্রাহীবাবুকে।

পানিগ্রাহীবাবু বললেন—চন্দনপুরে—

চন্দনপুর তো ছোট জায়গা নয়। চন্দনপুরে কোথায় যে ফাঁসি দেবার লোক এসেছে তা পানিগ্রাহীবাবু বললেন না।

আমরা যাকে পাই তাকেই জিজ্ঞেস করি। কেউই বলতে পারে না। সবাই-ই শুনেছে। সবাই-ই সবাইকে জিজ্ঞেস করে—ফাঁসি দেবার লোক এসেছে, শুনেছ হে!

সে লোকটা বলে—শুনেছি—

—কোথায়?

—তা তো জানি না।

কেউ জানে না। অথচ লোকটা এসেছে চন্দনপুরে। আমরা রাস্তায় একটা নতুন মুখ দেখতে পেলেই তার দিকে চেয়ে দেখি। একটু ভয়ঙ্কর ধরনের নতুন মানুষকে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে দেখলেই আমরা তার পেছু নেই। এই লোকটাই বোধ হয় ফাঁসি দেবার জন্যে এসেছে।

পানিগ্রাহীবাবুকে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম—তার কত মাইনে স্যার?

—কার?

—ওই যে লোকটা ফাঁসি দেবে?

পানিগ্রাহীবাবু বললেন—তিরিশ টাকা আর এক বোতল মদ—

—মদ কেন স্যার?

পানিগ্রাহীবাবু বললেন—ফাঁসি দিতে মনে কষ্ট হয় না? তাই সেই কষ্ট ভোলাবার জন্য এক বোতল মদ দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছে। এক বোতল মদ খেয়ে একেবারে নেশায় চুর হয়ে সব ভুলে যাবে—

ফাঁসি যে দেয় তার তো কষ্ট হবেই। কষ্ট হওয়াই তো স্বাভাবিক। একজন জ্যান্ত লোককে ধরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মারা কি যা-তা কথা! কে সুস্থ-শরীরে বহাল-তবিয়তে লোক খুন করতে পারে? ফাঁসি দেওয়া আর খুন করা—ও তো একই কথা। একই কাজের শামিল। অথচ ফাঁসি দিতে হবে! ফাঁসি দিতে না পারলে মহারাজাবাহাদুর রণজিত সিং দেব বিক্রমের খাতির থাকে না। হায়দারাবাদের নিজাম-বাহাদুর আর বরোদার গায়কোয়াড়ের চেয়ে ছোট হয়ে যেতে হয়। চন্দনপুরের মান-সম্ভ্রম থাকে না। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ার চন্দনপুরের খাতিরও থাকে না আর। কোর্ট আছে, কাছারি আছে, হাসপাতাল আছে, ইস্কুল-কলেজ আছে, টাঁকশাল আছে, হাওয়াখানা আছে, দেওয়ানজী আছে—আর ফাঁসিঘর থাকবে না, এটা কি একটা কথা হলো? লোকে বলবে কী? লোকে যে ছি ছি করবে। লোকে যে দুয়ো দেবে। লোকে যে ভাববে চন্দনপুর সেকেণ্ড ক্লাস স্টেট। লোকে যে ভাববে মহারাজাবাহাদুরের ক্ষমতা নেই কিছু। তার চেয়ে লজ্জার কি আছে, লজ্জার আর কী থাকতে পারে?

তা একদিন লোকটাকে পাওয়া গেল। যেমন চেহারা তেমনি তার কথাবার্তা।

জেলখানার ভেতর থাকতো বলে এতদিন তাকে দেখতে পায়নি কেউ। এতদিন কেউ চিনতো না। এতদিন তাকে নিয়ে শুধু আলোচনাই হয়েছে। চেহারা কেউ-ই দেখতে পায়নি।

সেদিন হাটে এসেছিল বাজার করতে।

প্রথমে আমরা কিছুই জানতাম না। হাটের কাছে দেখি না খুব ভিড় হয়েছে।

BanglaBook.org

জন পঞ্চাশেক লোক কাকে ঘিরে যেন কি করছে।

কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম।

দেখি কালো-মোটা মতন একজন লোক। ডোম কি চামার হবে তার ঠিক নেই। একটা ফতুয়া পরেছে গায়ে। মাথার চুল খোঁচা খোঁচা। মুখে বড় বড় বসন্তের দাগ। দাঁতগুলো বেঁকা-চোরা, উঁচু-নিচু।

একজন জিজ্ঞেস করলে—কত মাইনে দেয় তোমাকে?

লোকটা বললে—তিরিশ টাকা—

—আর মদ? মদ দেবে না এক বোতল করে?

লোকটা বললে—সে বাবু যখন ফাঁসি হবে, তখন দেবে—

সবাই অবাক হয়ে লোকটার আগা-পাশ-তলা দেখছে। যেন একটা আজব জীব এসেছে চন্দনপুরে। দেখে দেখে প্রশ্ন করেও যেন তৃপ্তি হচ্ছে না কারো। একজন বললে—তা তুমি মদ খাও?

—আজ্ঞে পেলে কেন খাবো না! আপনারা যত মদ দেবেন আমি তত খাবো, মদ খেতে আমি খুব ভালবাসি—

আর একজন জিজ্ঞেস করলে—মদ খেলে তোমার নেশা হয় না?

লোকটা হাসলো। বললে—আজ্ঞে নেশা হবার জন্যেই তো খাই—নইলে খেতে যাবো কেন?

—তা তুমি ফাঁসি কখনও দিয়েছ আগে?

লোকটা বললে—না—

—তাহলে তুমি ফাঁসি দেবে কী করে এখানে?

লোকটা বললে—ফাঁসি দিতে আমি শিখেছি—

—কী করে শিখলে?

—কলাগাছে ফাঁসি দিয়ে শিখেছি।

তারপর একটু থেমে বললে—আমার বাবাও ফাঁসি দিত। কলকাতার জেল-খানায় আমার বাবা অনেক ফাঁসি দিয়েছে—আমি দেখেছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—

বেশ আরামের চাকরি লোকটার। কোনও কাজ নেই। কবে একটা ফাঁসি হবে তার ঠিক নেই, তার জন্যে মাসে মাসে তিরিশটা টাকা মাইনে। কেবল ঘুম আর বিশ্রাম। বসে বসে খাবে-দাবে, ঘুমোবে আর বেড়াবে।

লোকটাকে ছাড়তেই আমরা তার পেছন পেছন চললাম।

লোকটা যেদিকে যায়, আমরা ছেলের দল পেছন-পেছন সেই দিকেই যাই। সে যাচ্ছিল জেলখানার দিকে, আমরাও তার পেছন-পেছন জেলখানার দিকে যাচ্ছিলাম। লোকটার যেন একটা আকর্ষণ আছে অদ্ভুত। তার দিক থেকে যেন চোখ আর ফেরানো যায় না।

খানিক পরে সে পেছন ফিরলে। পেছন ফিরে আমাদের দেখলে।

বললে—কী চাও তোমরা খোকা?

আমরা প্রথমটা একটু ভয় পেয়েছিলাম, আমরা থমকে দাঁড়ালাম।

সে এগিয়ে এল। বললে—কী চাও খোকা, তোমরা?

আমি বললাম—তোমাকে দেখছি, তুমিই বুঝি ফাঁসি দেবে?

সে বললে—হ্যাঁ, কেন?

বললাম—তোমার ভয় করবে না ফাঁসি দিতে?

লোকটা দাঁত বার করে হাসলে খুব। বললে—ভয় করবে কেন?

—না, তাই জিজ্ঞেস করছি।

BanglaBook.org

আর কী তাকে জিজ্ঞেস করবো বুঝতে পারলাম না। লোকটা আলু কিনেছে, বেগুন কিনেছে—আমরা যা যা খাই, সে-ও তাই খায়। আমরা যেমন করে কথা বলি, সেও ঠিক তেমনি করে কথা বলে।

লোকটা আর কিছু না পেয়ে জিজ্ঞেস করলে—তোমাদের বাড়ি কোথায়?

আমরা বললাম—চন্দনপাহাড়ে—

তারপর আর কোনও কথা হলো না। সে তার নিজের রাস্তায় চলতে লাগলো আবার। আবার আমরা তার পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম।

সে আবার পেছন ফিরলে। বললে—আবার আসছো কেন আমার পেছনে?

আমরা জিজ্ঞেস করলাম—তোমার নাম কী?

সে বললে—বুধুয়া—

শেষকালে বুধুয়াকে রোজ রোজ দেখতে লাগলাম। রোজ তার সঙ্গে কথা হতে লাগলো। রাস্তায় দেখা হলেই লোকেরা জিজ্ঞেস করে—কী বুধুয়া, কী খবর?

বুধুয়া খবর বলে। সে-সব খবর অতি সাধারণ! সাধারণ মানুষের মত সাধারণ খবর সব। তারও ক্ষিদে পায়, তারও অসুখ করে। তারও ভাললাগা-মন্দলাগা আছে! সে-ও হাসতে জানে কাঁদতে জানে। শেষকালে বুধুয়াকে ডেকে আর কেউ জিজ্ঞেস করে না—কী খবর, আর কেউ জিজ্ঞেস করে না—কেমন আছে সে। চন্দনপুরের দৈনন্দিন জীবনে ফাঁসিঘর আর বুধুয়া—দুটোই পুরনো, দুটোই একঘেয়ে হয়ে গেল। ফাঁসি না হলে ফাঁসিঘরের মানে কী? ফাঁসি না হলে বুধুয়ার আর খাতির কী?

কিন্তু হঠাৎ একদিন বুধুয়ার খুব খাতির বেড়ে গেল।

হঠাৎ ফাঁসিঘর নিয়ে আবার আলোচনা জমে উঠলো।

চন্দনপুরের আদালতে ফাঁসির হুকুম হয়েছে একজনের। নিবারণ মহান্তি!

নিবারণ মহান্তি হঠাৎ একদিন খুনের অপরাধে ধরা পড়লো চন্দনপাহাড়ে। চন্দনপাহাড়ের বস্তিতে নিবারণ মহান্তির বহুদিনের বাস। সবাই দেখেছে নিবারণ মহান্তিকে। নিবারণ মহান্তির বাবা-মাকে দেখেছে। নিবারণ মহান্তি চন্দনপুরের ইস্কুলেই ছোটবেলায় লেখা-পড়া করেছে। তারপর যখন বড় হয়েছে, তখন আর কিছু করেনি। তখন শুধু গুলী-গাঁজা-ভাঙ খেয়েছে। নিবারণ মহান্তির একটা মস্ত দল ছিল। নিবারণ মহান্তিই ছিল সে-দলের দলপতি। বহুদিন বহু লোক দেখেছে, নিবারণ মহান্তি অনেক রাত্রে পাহাড়ের মাথায় দলবল নিয়ে গুলী-গাঁজা খাচ্ছে। কেউ কেউ সেখানে হঠাৎ গিয়ে পড়লে নিবারণদের দেখলে পাশ কাটিয়ে চলে আসতো। শ্মশানেও যেত নিবারণ মহান্তি। সেখানেও অনেক রাত্রে গাঁজায় দম্ দিতে দেখেছে কেউ কেউ। চুরিডাকাতি করতো না বটে নিবারণ মহান্তির দল। কিন্তু খারাপ জায়গায় যাতায়াত ছিল তাদের। খারাপ বস্তিতে গিয়ে হল্লা করতো, রাত কাটাতো। নেশা করে মাত্‌লামি করতো।

বলতে গেলে নিবারণ মহান্তি ছিল চন্দনপাহাড়ের মার্কা-মারা মানুষ।

আবার সাহসও ছিল তার খুব। কারো ঘরে আগুন লাগলে নিবারণ দলবল নিয়ে আগুন নিবোতে যেত। আসলে চন্দনপুরের লোক নিবারণ মহান্তিকে ভয় করতো, ভক্তিও করতো।

যখন ডাকাতির ভয় উঠলো চন্দনপুরে, নিবারণ একলাই বুক চাপড়ে বলেছিল—কুছ্ পরোয়া নেই, আমি আছি। আমার নাম নিবারণ মহান্তি—

সত্যি সত্যিই একবার ডাকাত পড়েছিল চন্দনপুরে। বাইরে থেকে ডাকাতরা

BanglaBook.org

এসেছিল চন্দনপুরে। নিচে, চন্দনপুরের বাইরে সেবার দুর্ভিক্ষ হয়েছে খুব। তিন চার বছর অন্তর-অন্তর এদিকে দুর্ভিক্ষ হয়ই। তখন ডাকাতিটা বেড়ে যায়। তখন লোকে ভিক্ষে করে। তখন গাছের পাতা খেয়ে বাঁচে গাঁয়ের লোকেরা। কিংবা যখন ব্রাহ্মণী নদীতে বান আসে, গ্রাম-টাম সব ভেসে যায়, মড়ক লাগে দেশে, তখন চন্দনপুরের মহারাজাবাহাদুর খাজনা মুকুব করে দেয় চন্দনপুরে। তখন রাজসরকার থেকে চাল দেয় মহারাজাবাহাদুর। চন্দনপুরের লোক কখনও না-খেয়ে মরে না। চন্দনপুরে কখনও তাই দুর্ভিক্ষ হয়নি।

দুর্ভিক্ষ হয় না মা-সাহেবার জন্যে!

মা-সাহেবার কাছে আর্জি করে চন্দনপুরের লোক। চন্দনপুরের সব লোক গিয়ে মা-সাহেবার কাছে হাতজোড় করে দাঁড়ায়। বলে—আমরা আপনার অনাথা ছেলে-মেয়ে মা-সাহেবা, আমাদের রক্ষা করুন—

এমনি অনেকবার হয়েছে।

তারপরেই হুকুম বেরিয়ে যায় মহারাজাবাহাদুরের। রাজ-সরকার থেকে চাল ডাল নিয়ে আসি আমরা। দু'তিন মাস এমনি করে কাটে। তারপর আবার যখন ফলন হয় ক্ষেতে তখন সব ঠিক হয়ে গেছে। তখন সব শান্ত। কিন্তু সেই সময়টাই হয় ডাকাতির ভয়। কোথায় কখন যে হঠাৎ ডাকাতরা এসে চড়াও হবে তার ঠিক নেই। হঠাৎ রে-রে-রে-রে করতে করতে ডাকাতরা এসে হাজির হয়, আর চন্দনপুর ফাঁড়ি থেকে পুলিস-পাহারা আসতে আসতে যা ক্ষতি হবার তা হয়ে যায়।

সেবার নিবারণ মহান্তি ছিল বলেই একটা প্রাণ বেঁচে গেল।

নিবারণ মহান্তি দল-বল নিয়ে তখন শ্মশানে গাঁজা খাচ্ছে। সারা চন্দনপুর তখন ঘুমে অসাড়। এমন সময়ে ডাকাতরা চড়াও হলো। তাদের হাতে লাঠি সড়কি বল্লম ছিল। তাদের আসতে দেখেই নিবারণ মহান্তির দল গাঁজার কলকে ফেলে লাফিয়ে উঠলো। তখন আর নিবারণ মহান্তির মাথার ঠিক নেই। জ্বলন্ত চিতা থেকে কাঠ তুলে নিয়ে সে এক তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুললো। মারে কি মারে। ক'জন ডাকাত হাতে একটু আঘাত পেল। কিন্তু নিবারণ মহান্তির ব্যাপার-ট্যাপার দেখে ডাকাতির নেশা তাদের তখন কেটে গেছে।

সে-সব অনেকদিন আগের ব্যাপার।

ত্রিপাঠি বললে—তখন আমি জন্মাইনি হুজুর, আমার তখন জন্মই হয়নি—আমি শুনেছি সে-সব কথা। সে জন্যেই তো বলছিলুম, চন্দনপুরের লোক নিবারণ মহান্তিকে ভয়ও করতো ভক্তিও করতো।

তা শেষকালে সেই নিবারণ মহান্তিরই ফাঁসি হবে শুনে আমরা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলুম।

আমরা দেখতাম জেলখানা থেকে হাতকড়া বাঁধা নিবারণ মহান্তিকে আদালতে নিয়ে যাচ্ছে পুলিসরা। সেই নিবারণ মহান্তি, যার অত প্রতিপত্তি ছিল চন্দনপুরে, তার দুর্দশা দেখে আমরা মনে মনে বেশ মজা পেতুম মনে আছে। তার সেই চেহারাখানা যেন আজো মনে পড়ে। ফাঁসীর আসামী নিবারণ মহান্তির চেহারাটা দেখলে তখন মায়া হতো আমাদের। সেই তার মত দুর্দান্ত লোকের চেহারাও যে অমন চুপ্‌সে যেতে পারে তা যেন ভাবাই যায় না। ফাঁসির আসামী হলে বোধ হয় ওই রকমই হয়। চোখ বসে যায়, মাংস ঝুলে হয়, ঘাড় বেঁকে যায়। হাতকড়া-বাঁধা নিবারণ মহান্তিকে যেন চেনাই যেত না একেবারে।

রোজ সকালে যখন আদালত বসতো, তখন হাজত-ঘর থেকে তাকে বার করে

BanglaBook.org

আনতো। তারপর ইস্কুলবাড়ির সামনে দিয়ে তাকে নিয়ে যেতো। দু'জন বন্দুক-ধারী পুলিস দুপাশে, আর মধ্যিখানে নিবারণ মহান্তি। আমাদের চোখের দিকে চোখ মেলে চাইতেও পারতো না সে।

আমরা বন্ধুদের ডাকতাম—ওই দ্যাখ, শিগ্‌গির, নিবারণ মহান্তি যাচ্ছে—

আমাদের চিৎকার শুনে সব ছেলেরা দল বেঁধে ইস্কুলের বাগানে এসে দাঁড়াত।

—ওই দ্যাখ, ওর ফাঁসি হবে।

ফাঁসি হলে ওই নিবারণ মহান্তির চেহারাটা কি-রকম দেখাবে তাই নিয়ে আমরা আলোচনা করতুম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে নিবারণ মহান্তির গলাটার দিকে তাকাতাম। গলার কোন্ জায়গাটায় ফাঁসটা লাগবে তাও আলোচনা করতুম। মনে হতো গলাটায় যেন অনেকগুলো শির উঁচু হয়ে রয়েছে। ফাঁসি হলে ও-শির-গুলো চুপসে যাবে। এই চোখের মণি দুটো বেরিয়ে আসবে। সমস্ত শরীরটাও অসাড় হয়ে পড়বে। যে-হাত দিয়ে একদিন নিবারণ মহান্তি ডাকাতদের ঠেকিয়ে ছিল, সে-হাত দুটোও আর কোনও কাজে লাগবে না।

নিবারণ মহান্তিকে সেই অবস্থায় দেখে চন্দনপুরের লোকেদের দুঃখ যে হতো না তা নয়। তবে আনন্দটাই মাত্রায় বেশি হতো। আনন্দ হবার কারণও ছিল। এক লাখ টাকা খরচ করে ফাঁসিঘর ফাঁসিকল হলো সেটা তবু সার্থক হবে। তিরিশ টাকা করে মাসে বুধুয়াকে দেওয়া হচ্ছে, সেটাও এতদিনে উসুল হবে। এতদিনে জলেই যাচ্ছিল টাকাগুলো, এবার ভগবানের দয়ায় তা কাজে লাগলো।

আদালতে রোজ যায় নিবারণ মহান্তি, আদালত বন্ধ হবার পর ফিরে আসে। এমনি রোজ।

আমরা আদালতের ভেতরে যেতে পারি না। আমাদের কম বয়েসের ছেলেদের ভেতরে যাওয়ার আইন নেই। কিন্তু শুনতে পাই সব। পরশু কী হয়েছিল, কাল কী হয়েছিল, আজ কী হলো। সব খবরই আমরা মন দিয়ে শুনি।

নিবারণ মহান্তি আদালতে বলেছিল—আমি কিছু জানি না হুজুর, আমি নিরপরাধ, আমি খুন করিনি কামিনীকে—

—তা হলে কামিনীকে কে খুন করেছে?

—তা আমি জানি না হুজুর। আমি আগে কামিনীর ঘরে যেতুম, এক বছর আর তার ঘরে যাই না—

—কেন যেতে না এক বছর? তোমার সঙ্গে কি কামিনীর ঝগড়া হয়েছিল?

জীবনে সে নাকি ঠিক করেছিল সে আর গাঁজা খাবে না, গুলি খাবে না। সে নাকি ঠিক করেছিল সে এবার থেকে ভাল হয়ে যাবে। সংসারী হবে। বিয়ে করবে, সংসার করবে। আর পাঁচজন ভদ্রলোক যেমন সংসার করে, বিয়ে-থা করে, সেই রকম করে ভদ্র-জীবন কাটাবে। তাই মদ ছেড়ে দিয়েছিল এক বছর ধরে। গাঁজা-গুলি ছেড়ে দিয়েছিল এক বছর ধরে। এক বছর ধরে সে আর দলের সঙ্গে বদ নেশা করেনি। রাত্রে নিজের বাড়িতে অন্য লোকের মত ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। সকালে উঠে পুজো করেছে, বাজার করেছে, খেয়েছে। তারপর দিনের বেলায় কাজের চেষ্টায় এদিক-ওদিক ঘুরেছে।

নিবারণ মহান্তির কথা আদালতের কেউই বিশ্বাস করেনি। সেদিন ওই পর্যন্ত শুনেই আদালত বন্ধ হয়ে গেল।

আসলে নিবারণ মহান্তি তো নিজের দোষ ঢাকবার চেষ্টা করবেই।

সেদিন পানিগ্রাহীবাবু বললেন—নিবারণ মহান্তি ছাড়া পেয়ে যাবে।

জিজ্ঞেস করলাম—কেন স্যার?

BanglaBook.org

পানিগ্রাহীবাবু বললেন—আসলে ওর দলের লোকেরা রেগে গিয়ে ওকে বিপদে ফেলবার জন্যে খুন করেছে!

আমরা তো সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। তবে কি ফাঁসি হবে না? তবে কি এত লোকের সাধে এমন করে ছাই পড়বে? কী হবে তাহলে? যদি নিবারণ মহান্তির ফাঁসি না হয়? যদি সত্যিই ছাড়া পেয়ে যায় নিবারণ মহান্তি শেষ পর্যন্ত?

তাহলে এত টাকা খরচ করে ফাঁসিঘরই বা তৈরি করা কেন, আর এত টাকা দিয়ে বিলেত থেকে ফাঁসিকলই বা কেনা কেন? আর তার ওপর মাসে মাসে তিরিশ টাকা মাইনে দিয়ে ফাঁস দেওয়ার লোকই বা রাখা কেন?

খবরটা রটে যাবার পর থেকেই সমস্ত চন্দনপুর যেন মুষড়ে পড়লো।

চন্দনপাহাড়ের বিশ্বম্ভর উপাধ্যায় বললেন—আগে থেকেই তোমরা এত মুষড়ে পড়ছো কেন? আগে দেখই না, কী হয়।

সত্যিই কিন্তু পরের দিন আবার অন্য রকম খবর শুনলাম।

পানিগ্রাহীবাবু বললেন—না, নিবারণ মহান্তির ফাঁসি কেউ আটকাতে পারবে না—

—কেন স্যার?

পানিগ্রাহীবাবু বললেন—নিবারণের একপাটি জুতো পাওয়া গিয়েছিল মেয়েমানুষটার ঘরে—

আদালতেও পুলিস জুতোটা দেখালে নিবারণ মহান্তিকে—

জিজ্ঞেস করলে—এটা তোমার জুতো?

নিবারণ মহান্তি ভাল করে দেখে চিনতে পারলে। বললে—হ্যাঁ, হুজুর—আমার একপাটি পুরোনো জুতো—

—তুমি কামিনীর ঘরে এই একপাটি জুতো ফেলে এসেছিলে?

—আজ্ঞে না হুজুর।

—তাহলে কামিনীর ঘরে খাটের তলায় এ-জুতোটা কী করে পাওয়া গেল? তুমি নিশ্চয়ই কামিনীকে খুন করে পালিয়ে আসবার সময় তাড়াতাড়িতে একপাটি জুতো ফেলে এসেছিলে?

নিবারণ মহান্তি বললে—না হুজুর, এ আমার অনেকদিন আগেকার জুতো। এ-জুতো আমি এখন আর পরি না—এ আমি ফেলে দিয়েছিলুম রাস্তায়—

—আর একপাটি জুতো কোথায় গেল?

—তা জানি না হুজুর, আমি দু'পাটিই পুরোনো হয়ে গেছে বলে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলুম।

নিবারণ মহান্তির কথা বিশ্বাস করবার মত নয়। আদালতও বিশ্বাস করলে না। দু'পক্ষের উকিলে খুব কথা-কাটাকাটি চললো। নিবারণ মহান্তির উকিল বুঝিয়ে দিল যে তার মক্কেল দল ছেড়ে গিয়েছিল বলে দলের লোকেরা তাকে বিপদে ফেলবার জন্যে নিজেরা কামিনীকে খুন করে নিবারণ মহান্তির একপাটি জুতো তার ঘরে খাটের তলায় রেখে দিয়ে গেছে।

কিন্তু পুলিসের উকিলের জেরায় সে যুক্তি টিকলো না।

তারা বললে—কামিনী অন্য লোককে ঘরে ঢুকতে দিয়েছে বলে নিবারণ মহান্তির রাগ ছিল কামিনীর ওপর। তাই সে সুযোগ পেয়ে খুন করে পালিয়েছে—

যত দিন যেতে লাগলো, ততই উল্টোপাল্টা খবর শুনতে পেলাম আমরা। একবার নিবারণ মহান্তির ফাঁসি হবে শুনে আনন্দ হয়, আবার পরের দিন ফাঁসি

BanglaBook.org

হবে না শুনে মুখ শুকিয়ে যায়।

বুধুয়া তখনও বাজারে আসে।

দেখা হলেই লোকে ঘিরে ধরে। জিজ্ঞেস করে—কী গো বুধুয়া, কী হবে বলো তো? তোমার কী মত?

বুধুয়া কন্তু নির্বিকার। সে এ-সব নিয়ে কিছুই ভাবে না বলে মনে হয়। সে ঠিক বাজার করছে, রাঁধছে, খাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে, সবই করছে। তার কিছু যেন বিকার নেই। আশ্চর্য! আমরা চন্দনপুরের সমস্ত লোক যখন ভেবে ভেবে অস্থির, সে তখন বসে বসে কেবল মাইনে খাচ্ছে আর আরাম করছে!

আসলে অপরাধ যারই হোক একটা ফাঁসি হলেই হয়। নিবারণ মহান্তি কি আর কেউই হোক—তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। ফাঁসিটা মোটকথা দেখা চাই-ই আমাদের। ফাঁসিঘরটা তৈরি হলো, ফাঁসিকলটা কেনা হলো, তার একটা সদ্ব্যবহার না হলে যেন আর ভাল লাগছে না আমাদের।

আমরাও বুধুয়াকে জিজ্ঞেস করি—হ্যাঁ গো বুধুয়া, ফাঁসি হবে না? তুমি কী বলো?

বুধুয়া বলে—হয় ফাঁসি হবে, নয়তো ফাঁসি হবে না—তাতে আমার কী?

—তা তোমাকেই তো শেষ পর্যন্ত ফাঁসি দিতে হবে! আর তো কেউ নেই ফাঁসি দেবার—

—তা দিতে হুকুম হলেই দেব। আমার কী।

আশ্চর্য! লোকটার এই উদাসীনতা দেখে আমরা অবাক হয়ে যেতাম। তার যেন মোটে গা নেই। এত যে কাণ্ড চলেছে আদালতে, এত লোক যে এতদিন ধরে নিবারণ মহান্তিকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, তাতে তার যেন কিছু এসে যায় না। হঠাৎ কারো বাড়ি নেমন্তন্ন হলে যেমন লোকে সেজেগুজে খেতে যায়, বুধুয়াও যেন তেমনি হুকুম হলেই নিবারণ মহান্তিকে ফাঁসিতে লট্‌কে দিয়ে আসবে। আর তাছাড়া ফাঁসি হলেই তো ভাল। ফাঁসি হলেই তো বুধুয়া মদ পাবে এক বোতল।

আমরা বুধুয়াকে দেখতাম আর ভাবতাম—এ কেমন করে সম্ভব? এই সব কিছুর মধ্যে থেকেও সব কিছু ভুলে থাকা। আমরা অনেক সময় দেখেছি যখন দিনের বেলা আদালতে নিবারণ মহান্তির খুনের মামলা চলছে, তখন বুধুয়া তার নিজের ঘরের সামনের রোয়াকে শুয়ে অঘোরে দিবা-নিদ্রা দিচ্ছে। নিবারণ মহান্তির ফাঁসির জন্যে আমাদের মত তার যেন মাথাব্যথাই নেই।

আমরা অনেকদিন রাস্তায় বুধুয়াকে জিজ্ঞেস করেছি—আচ্ছা বুধুয়া, ফাঁসি দিতে যদি তোমার হাত ফস্‌কে যায়, তখন কী করবে!

বুধুয়া বলতো—হাত ফস্‌কে গেলে, আবার ভাল করে লট্‌কে দেব—

তার কথা শুনে আমরা হাসতুম।

সে বলতো—নতুন দড়ি, নতুন কল ফস্‌কালেই অম্‌নি হলো?

তারপর একটু থেমে বলতো—দড়িটা ধরে জোরে এমন একটা টান দেব যে বাছাধন টের পেয়ে যাবে, তখন চোখ বের করে জিভ্ উল্টে ঝুলতে থাকবে—

আমরা বলতাম—তা হ্যাঁগো, ফাঁসি দেখে তোমার ঘরে একলা শুতে ভয় করবে না!

সে বলতো—ভয় কীসের? এ তো আমার চাকরি, কেরানীবাবুরা যেমন অফিসে চাকরি করে, এ-ও আমার সেই রকম চাকরি—

তা বটে! বুধুয়ার চাকরিই তো! সে কী করবে? তার কী দোষ? সে ফাঁসি

BanglaBook.org

না দিলে অন্য অনেক দেবার লোক জুটবে। তিরিশ টাকা মাইনে পেলে ফাঁসি দিতে হয়তো অনেকেই রাজী হবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুধুয়াকে ফাঁসি দিতে হলো না হুজুর। বুধুয়ার আর কষ্ট করতে হলো না।

আমি বললাম—সে কি? বুধুয়া ফাঁসি দিলে না?

ত্রিপাঠি বললে—বুধুয়ার ভাগ্যি ভাল হুজুর, বুধুয়া অনেক পুণ্যি করেছিল হুজুর—তাই তাকে আর ফাঁসি দিতে হলো না।

গল্প শুনতে শুনতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। চন্দনপুরের আকাশে শুক-তারাটা উঠেছিল। তারপর আর তাকে দেখা গেল না। ওদিকে দূরে জেলখানার দালানটা আকাশের গায়ে ছায়ার মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুপুরবেলা ঘুমিয়েছিলাম, তাই তখন আর ঘুমের তাড়া নেই। ত্রিপাঠির গল্প শুনতে শুনতে আমি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। বললাম—কেন? বুধুয়া ফাঁসি দিলে না কেন? কী হলো তার?

ত্রিপাঠি বললে—আপনি কলকাতা থেকে তো এসেছেন? মহারাজাবাহাদুরকে দেখেছেন?

—কোথায়? তিনি এখন কলকাতায় থাকেন?

ত্রিপাঠি বললে—হ্যাঁ হুজুর, এই চন্দনপুরের যা কিছু উন্নতি, যা কিছু বড় বড় বাড়ি, সব তো মহারাজাবাহাদুরই করে গেছেন—মহারাজা রণজিত সিং দেব বিক্রম বাহাদুর! কিন্তু তিনিই কি জানতেন যে তাঁকেই একদিন আবার এই সব রাজ্য-পাট ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে ছোট বাড়িতে বাস করতে হবে?

জিজ্ঞেস করলাম—তিনি এখনও বেঁচে আছেন?

ত্রিপাঠি বললে—কী বলছেন হুজুর? বেঁচে নেই মানে? কলকাতায় ফিরে গিয়ে দেখবেন আপনাদের বালিগঞ্জ-পাড়ায় মস্ত বাড়ি করেছেন, ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া কিনেছেন—দিব্যি সুখে আছেন সেখানে—

—আর এতদিনকার সব রাজ্য-পাট ছেড়ে চলে যেতে হলো?

ত্রিপাঠি বললে—আজ্ঞে, এখন সেই রাজ-প্যালেসে কমিশনার সাহেব বাস করছেন, কত সাধের প্যালেস্ ছিল মহারাজাবাহাদুরের। কত শখ করে তৈরী করিয়েছিলেন। বিলিতি ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে প্যালেস করিয়েছিলেন নিজে থাকবেন বলে—হঠাৎ সব উল্‌টে-পালটে গেল, হঠাৎ ইংরেজরা চলে গেল, আর মহারাজা-বাহাদুরও এ-সব ছেড়ে চলে গেলেন কলকাতায়—

ত্রিপাঠির কাছেই সেই সব দিনকার গল্প শুনতে লাগলাম।

—তা হলে বুধুয়াকে আর ফাঁসি দিতে হলো না? বসে বসে মাইনে খেলে কেবল?

ত্রিপাঠি বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর—যে কমাস ছিল সে এখানে, সে কমাস কেবল বসে বসে আরাম করে পায়ের ওপর পা তুলে মাইনে নিতে লাগলো—

—তা সেই নিবারণ মহান্তি? তার তবে ফাঁসি হলো না?

ত্রিপাঠি বললে—সেই গল্পই তো আপনাকে বলছি হুজুর, নিবারণ মহান্তির এক কেলেঙ্কারি কান্ড হয়ে গেল শেষকালে।

—কী রকম?

—তবে শুনুন!

BanglaBook.org

মা-সাহেবা বিধবা হবার পর বহু বছর কোথাও বেরোন নি। তিনি কেবল তাঁর চন্দনপাহাড়ের পুরোন প্যালেসেই থাকতেন দিনরাত আর প্রজাদের নালিশ শুনতেন মাঝে মাঝে। আর সময়ে সময়ে মহারাজাবাহাদুরকে বলে দিতেন—এটা করতে হবে, ওটা করে দিতে হবে—

কোথায় জল নেই প্রজাদের, টিউব্‌ওয়েল করতে হবে।

মহারাজাবাহাদুর তাই-ই করে দিতেন।

কোথায় খেতে পাচ্ছে না চন্দনপুরের প্রজারা, তাদের খাজনা মকুব করতে হবে।

মহারাজাবাহাদুর তাই-ই করতেন।

কিন্তু সেবার মা-সাহেবা বললেন—তিনি তীর্থ করতে যাবেন। মা-সাহেবা তীর্থ করতে যাবেন, সে তো যে-সে ব্যাপার নয়! এলাহি কাণ্ড। গয়া, কাশী, মথুরা, পুষ্কর, বৃন্দাবন। আরো কত তীর্থ। এক বছর ধরে তিনি তীর্থে তীর্থে ঘুরবেন। দান-ধ্যান করবেন। পুণ্যসঞ্চয় করবেন। মহারাজাবাহাদুরের বেশির ভাগ তীর্থক্ষেত্রেই বাড়ি আছে, লোকজন আছে। সেখানে দেওয়ানজী গেলেন ব্যবস্থা করতে। সব ব্যবস্থা যখন শেষ হলো, তখন তিনি ফিরে এলেন। রেল-কোম্পানীর সঙ্গে স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি যেখানে যেখানে যাবার বাসনা করবেন স্পেশ্যাল ট্রেনও সেখানে যাবে।

আমরা সবাই ইস্টিশানে এলাম মা-সাহেবার যাওয়া দেখতে। তিনখানা কামরা। আর একখানা ইঞ্জিন। তিনখানা কামরায় মা-সাহেবার লোকজন ঝি-ঝিউড়ি সব উঠলো। মালপত্র উঠলো। চাল-ডাল-ঘি গঙ্গাজল—সব উঠলো। আর মা-সাহেবা উঠলেন একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরায়।

মহারাজাবাহাদুর আর রাণীসাহেবা এসেছিলেন তাঁকে তুলে দিতে।

মা-সাহেবা যাবার সময় সব নানা রকম উপদেশ-টুপদেশ দিয়ে দিলেন। কেমন করে স্টেট চালাতে হবে, কেমন করে প্রজাদের সুখ-সুবিধে দেখতে হবে। গাড়ি ছেড়ে দিলে, আমরা সব চিৎকার করে উঠলুম—হৈ হৈ করে উঠলুম, জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলুম—

মহারাজা রণজিত সিং দেব বিক্রম বাহাদুর আর রাণীসাহেবা গাড়ী করে রাজ-প্যালেসে ফিরে এলেন।

যখন বড়লাটবাহাদুর চন্দনপুরে এলেন, তখন মা-সাহেবা তীর্থ করছেন। তিনি বলতে গেলে ধর্ম-কর্মেই একেবারে মেতে ছিলেন বিধবা হবার পর। যে-টুকু না করলে নয়, তাই শুধু করতেন।

তারপরে কত কাণ্ড হয়ে গেছে এক বছরের মধ্যে। ফাঁসিঘর হয়েছে, ফাঁসিকল বসেছে, ফাঁসি দেবার জন্যে লোক রাখা হয়েছে, তিনি যখন গয়া, কাশী, মথুরা, পুষ্কর, বৃন্দাবন করে বেড়াচ্ছেন। ইহকালের কাজ তাঁর শেষ হয়ে গিয়েছে, পর-লোকের কাজ করছেন তিনি তখন।

বড়লাটবাহাদুর এলেন। সকলের সঙ্গে দেখা করলেন। রেসিডেণ্ট্ জোন্স সাহেবের কাছে শুনেছিলেন তিনি যে মহারাজাবাহাদুরের মা-সাহেবা বেঁচে আছেন তখনও।

জিজ্ঞেস করেছিলেন—মহারাজাবাহাদুরের মাদার কোথায়?

জোন্স সাহেব বলেছিলেন—তিনি পিল্‌গ্রিমেজ্ করতে গেছেন—এক বছর পরে ফিরবেন—

ত্রিপাঠি বললে—সেই মা-সাহেবার জন্যেই শেষ পর্যন্ত সব আটকে গেল হুজুর—

BanglaBook.org

—তার মানে? ফাঁসি হলো না?

ত্রিপাঠি বললে—আমাদেরও তো তখন সেই ভাবনাই হচ্ছিল। এত সাধের ফাঁসিঘর, শেষকালে কি কোনও কাজে লাগলো না? আপনার মত আমরাও তো কেবল সেই কথাই ভাবতাম হুজুর। আর শুধু আমরা কেন, মহারাজাবাহাদুর, দেওয়ানজী নরহরি মহাপাত্র, ম্যাজিস্ট্রেট কলিন্‌স্‌ সাহেব, জেলার ডিমণ্টি সাহেব, সবাই তো তখন কেবল সেই কথাই ভাবছে। এত টাকা খরচ হলো মহারাজাবাহাদুরের, শেষকালে কি ফাঁসি হবে না! সব মেহনত বরবাদ?

—আর নিবারণ মহান্তি?

ত্রিপাঠি বললে—সে তখন কেবল একবার আদালতে আসে সকালবেলা, আর বিকেলবেলা হাজতখানায় গিয়ে ঢোকে।

নিবারণ মহান্তির দলবলও সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালো এসে। তাদের জেরা করতে লাগলো নিবারণ মহান্তির উকীল।

উকীল জিজ্ঞেস করলে—এটা কার জুতো? তুমি চেনো এ জুতো-জোড়া?

সাক্ষী বললে—হ্যাঁ আমি চিনি, ও নিবারণ মহান্তির জুতো।

—তোমার কি রাগ ছিল নিবারণের ওপর?

সাক্ষী বললে—কেন হুজুর, নিবারণ মহান্তির ওপর আমার রাগ থাকবে কেন?

উকীল বললে—তোমাদের দলপতি তো নিবারণ মহান্তি, সে দল ছেড়ে দিলে তোমাদের তো রাগ হবারই কথা!

সাক্ষী বললে—না, নিবারণ মহান্তি দল ছেড়েছিল বটে, কিন্তু তাতে আমাদের আনন্দই হয়েছিল। তাতে আমরা খুশীই হয়েছিলাম—

আরও সাক্ষী এল।

সবাই ওই একই কথা বললে। সবাই বললে—আমরাও ঘর-সংসার করবো বলে ঠিক করেছিলাম সবাই—

উকীল জিজ্ঞেস করলে—তা কতদিন তোমাদের সঙ্গে নিবারণ মহান্তির দেখা হয়নি?

তারা বললে—নিবারণ মহান্তি দল ছেড়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু দেখা আমাদের প্রায়ই হতো—

তারপর উকীল জিজ্ঞেস করলে—কামিনী যেদিন খুন হয়, সেদিন তুমি সকালবেলা গিয়েছিলে কী করতে?

সাক্ষী বললে—আমি কামিনীর খুন হবার দিন সকালবেলা যাইনি তার বাড়িতে—সেদিন সকালবেলা আমি হাটে গিয়েছিলাম হাট করতে—

—ফেরবার পথে তার বাড়িতে ঢুকেছিলে?

—একবার শুধু গিয়েছিলাম একটা কথা বলতে!

—কী কথা?

সাক্ষী বললে—কামিনী একটা রুপোর হার চেয়েছিল আমার কাছে, তা আমি বলেছিলাম পরে দেব। সেদিন আমি সেই কথাই বলতে গিয়েছিলাম তাকে যে, হাতে টাকা এলেই তাকে হার গড়িয়ে দেব। কথাটা বলে সেখানে আমি আর দাঁড়াইনি, বলেই চলে এসেছিলাম—

—তারপর সন্ধেবেলা আবার গিয়েছিলে?

—না হুজুর, সন্ধেবেলা আমি যাইনি তার বাড়িতে! হার না নিয়ে তার কাছে যাবার সাহসই ছিল না আমার!

—কিন্তু যে খুন করলো, সে তো কামিনীর গয়নাগাঁটি কিছুই নেয়নি। কীসের

BanglaBook.org

জন্যে সে খুন করলো বলতে পারো? কী উদ্দেশ্য ছিল তার? কামিনীর ওপর কারো কি রাগ ছিল, তুমি জান?

—আজ্ঞে হুজুর, তা কী করে জানবো!

উকীল বললে—সে কি, তোমার সঙ্গে এত ভাব ছিল কামিনীর, আর তুমি জানো না!

সাক্ষী বললে—ভাব থাকলেই বা, সে আমাকে তার মনের কথা বলবে কেন? সত্যিই যে খুন করেছে সে কামিনীর ঘরের কিছুই নেয়নি। তার ঘরে কাঁসার বাসন ছিল, আলনায় তার শাড়ি ছিল, পায়ে রুপোর ভারি মল্ ছিল দু'গাছা, হাতে রুলী ছিল—সে-সব সে ছোঁয়ও নি, রাত্রে যখন সে ঘুমিয়েছে, তখন সে একলা ছিল ঘরে। আশের পাশের ঘরের মেয়েরা দেখেছে সেদিন রাত্রে কামিনী সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে দরজায় খিল দিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিল।

একজন জিজ্ঞেস করেছিল—আজ এত সকাল-সকাল ঘুমোবি কেন রে?

কামিনী বলেছিল—আজকে শরীরটা বড় খারাপ লাগছে—

তারপরে আর কেউ কিছু জানে না। তারপর অনেক রাত্রে যে-যার শুয়ে পড়েছে। যখন সকাল হয়েছে, তখন সবাই ঘুম থেকে উঠেছে, দেখে কামিনীর ঘরের দরজা তখনও বন্ধ। কামিনী একটু দেরি করেই ঘুম থেকে ওঠে বরাবর। অনেক বেলাতেও যখন দরজা খুললে না কামিনী, তখন সকলের সন্দেহ হলো। জানলা ভেঙে ভেতরে চেয়ে দেখে কামিনী খুন হয়েছে।

খুন করে দেয়াল খুঁড়ে—দেয়ালে সিঁদ কেটে পালিয়ে গিয়েছে খুনী।

তারপর সবাই পুলিসে খবর দিয়েছে। পুলিস এসে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখে—কামিনী রক্তাক্ত শরীরে পড়ে আছে তক্তপোশের ওপর। ঘরের কোন জিনিস খোয়া যায়নি। যেখানকার যা কিছু সব ঠিক জায়গায় রয়েছে। কেউ কিছু নেয়নি। এমন কি কামিনীর যা দু'একটা গয়নাগাঁটি ছিল শরীরে, তাও খোয়া যায়নি।

এ এক অবাক খুন। এমন খুন কেউ দেখেনি চন্দনপুরে। এমন খুনের কথা কেউ কখনও শোনেওনি চন্দনপুরে।

তারপর পুলিস নানা বাড়ি তলাশ করলে। নানা লোককে জেরা করলে। ঘরের মধ্যে শুধু জুতো পাওয়া গেল একজোড়া। সেই জুতো জোড়াই নিয়ে গেল পুলিস। শেষকালে অনেক জেরার পর প্রমাণ হলো যে ও জুতো-জোড়া নিবারণ মহান্তির। তারপর পুলিস নিবারণ মহান্তিকে ধরলে।

নিবারণ মহান্তি ধরা পড়ার পর আমরাই তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলুম।

যখন সব লোক ফাঁসিঘরটা দেখতে আসতো, তখন নিবারণ মহান্তিও আসতো দেখতে। সে-ও এসে জিজ্ঞেস করতো—কী করে ফাঁসি দিতে হয়, কেমন করে ফাঁসি দেয় লোকদের, কোন্ জায়গাটায় ঝোলানো হয় আসামীকে?

নিবারণ মহান্তিই বুধুয়াকে জিজ্ঞেস করেছিল—কেমন করে দড়িটা গলায় লাগাও গো?

বুধুয়া দড়িটা নিয়ে নিজের গলায় জড়িয়ে বলেছিল—এই এমনি করে।

আর আশ্চর্য, সে কি তখন জানতো যে একদিন তাকেই আবার ফাঁসির আসামী হয়ে আদালতের কাঠগড়ায় উঠতে হবে!

তা শেষ পর্যন্ত একদিন রায় বেরোলো। ম্যাজিস্ট্রেট কলিন্স্ সাহেব রায় দিলেন। আমরা সেদিন স্কুলে গিয়ে লেখা-পড়া করতে পারলুম না। আমাদের

BanglaBook.org

তখন অন্য কোনও দিকে মন গেল না। আমরা শুনেছিলুম সেদিন নিবারণ মহান্তির মামলার রায় বেরোবে!

আমরা ইস্কুলে গিয়েই পানিগ্রাহীবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম—স্যার, আজকে রায় বেরোবে নিবারণ মহান্তির?

পানিগ্রাহীবাবু বললেন—হ্যাঁ—

আবার জিজ্ঞেস করলাম—কী হবে স্যার?

পানিগ্রাহী বললেন—তা কী করে বলবো—

আমরা ঘণ্টায় ঘণ্টায় দৌড়ে যাই বাগানের দিকে। রাস্তায় কোনও লোক দেখলেই জিজ্ঞেস করি।

বলি—হ্যাঁ গো, রায় বেরিয়েছে নিবারণ মহান্তির?

সকলেই বলে—না।

আদালতের সামনে সেদিন ভীষণ ভিড়। চন্দনপুরের সব লোক এসে জড়ো হয়েছে আদালতের সামনে। পুলিস এসে পাহারা দিচ্ছে সমস্তগুলো দরজা। মনে হয়েছিল ভিড়ের ঠেলায় বোধ হয় আদালতের দরজা ভেঙে যাবে। কিন্তু চন্দনপুরের সমস্ত পুলিস পাহারা দিচ্ছিল বলে দরজা-জানালাগুলো ভাঙলো না শেষ পর্যন্ত। চন্দনপুর, চন্দনপাহাড়—চারিদিককার লোক সব জড়ো হয়েছে সেখানে। সেদিন আর চন্দনপুরের দোকানপাট কিছুই খুললো না। সব দোকানদার দোকান বন্ধ করে আদালতের সামনে এসে হাজির হয়েছে।

এ ওকে জিজ্ঞেস করে, ও একে জিজ্ঞেস করে।

বিকেলবেলা রায় বেরোল।

ত্রিপাঠিকে জিজ্ঞেস করলাম—কী রায়?

ত্রিপাঠি বললে—আজ্ঞে নিবারণ মহান্তির ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল!

বললাম—তারপর?

ত্রিপাঠি বললে—তারপরেই তো আসল মজাটা হুজুর! তারপরই হলো আসল মজা—

জিজ্ঞেস করলাম—কেন? মজা কেন? ফাঁসি হলো না? বুধুয়া ফাঁসি দিতে রাজী হলো না?

ত্রিপাঠি বললে—আজ্ঞে, বুধুয়ার কী? বুধুয়া কেন রাজী হবে না? সে বেটা তো ফাঁসি দেবার জন্যেই মাইনে খাচ্ছে মাসে মাসে তিরিশ টাকা করে—তার আর আপত্তি হবে কেন? আর আপত্তি হলে শুনছেই বা কে?

—তাহলে?

ত্রিপাঠি বললে—আজ্ঞে সেই ব্যাপারটাই তো বলছি, বুধুয়াকে আর ফাঁসি দিতেই হলো না—

—কেন?

ত্রিপাঠি বললে—তাহলে সব ব্যাপারটা শুনুন মন দিয়ে—সব ব্যাপারটাই আপনাকে খুঁটিয়ে বলি—

আমরা তো ইস্কুল থেকে বেরিয়েই খবর শুনলাম। আনন্দে তখন আমরা নাচতে শুরু করে দিয়েছি। চন্দনপুরে ফাঁসি হবে—চন্দনপুরের ফাঁসিকলে প্রথম ফাঁসি হবে এত দিনে। ফাঁসি হয় না, হয় না, করে শেষ পর্যন্ত ফাঁসি হলো—এটা কি কম কথা হুজুর—

তা নিবারণ মহান্তিকে পুলিস-পাহারা দিয়ে ধরে নিয়ে আবার পুরলো জেলখানায়। এবার আর হাজত-ঘর নয়, জেলখানা। এবার জেলখানায় ফাঁসি-সেল-এ

BanglaBook.org

তাকে রাখা হবে শুনলাম। যার ফাঁসি হবে, তাকে ফাঁসির আগের ক'দিন ফাঁসি-সেলে কাটাতে হবে। এই-ই হলো নিয়ম।

আমরা দেখলুম নিবারণ মহান্তিকে ধরে নিয়ে গেল পুলিসরা।

দেখলাম তার চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়ছে। দু'টো হাত হাত-কড়া দিয়ে বাঁধা। যেন খুব কাঁদছে মনে হলো। দেখে যে আমাদের কী আনন্দ হলো তা কী বলবো আপনাকে হুজুর! আমরা তো আগে কখনও ফাঁসির আসামী দেখিনি! শুধু আমরা কেন, চন্দনপুরের কেউই দেখেনি। ফাঁসির রায় বেরোবার পর ফাঁসির আসামীরা যে কেমন করে কাঁদে তাও আগে কখনও দেখিনি। নিবারণ মহান্তিকে নিয়ে জেলখানার দিকে গেল পুলিসরা। আমরা চন্দনপুরের সব লোক তার পেছন-পেছন গেলাম। তারপর আর তাকে দেখা গেল না। হাত-কড়া বাঁধা নিবারণ মহান্তি আমাদের চোখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বললাম—তারপর!

ত্রিপাঠি বললে—তারপর শুনলাম নিবারণ মহান্তির ফাঁসির দিন স্থির হয়ে গেছে—

রেসিডেণ্ট্ জোন্স সাহেব, জেলার ডিমণ্টি সাহেব, ম্যাজিস্ট্রেট কলিন্স্ সাহেব, দেওয়ানজী নরহরি মহাপাত্র আর স্টেটের মেডিক্যাল অফিসার, সবাই মিলে দিন স্থির করে ফেলেছেন একটা।

পানিগ্রাহীবাবু বললেন—চব্বিশে এপ্রিল—

আর বেশি দিন তখন দেরি নেই চব্বিশে এপ্রিলের।

তখন গ্রীষ্মকাল। বেজায় গরম পড়েছে। তবু সে গরমেও যেন চন্দনপুরের লোকেদের ক্লান্তি নেই। সব লোক হাটে-বাজারে সেই নিয়েই আলোচনা করতে লাগলো। কেমন করে ফাঁসি হবে। ফাঁসি হবার পর লাশটা নিয়ে কী করবে—এই সব আলোচনা।

পানিগ্রাহীবাবু বললেন—লাশটা নিয়ে পোড়ানো হবে, যেমন পোড়ানো হয় সকলের—

বুধুয়া সেদিন বাজারে এসেছিল। সবাই তাকে ঘিরে ধরলো।

জিজ্ঞেস করলে—কী গো বুধুয়া, চব্বিশে এপ্রিল তো হচ্ছে—!

বুধুয়া জিজ্ঞেস করলে—কী হচ্ছে বাবু?

সবাই বললে—ফাঁসি! কেন, জানো না?

বুধুয়া হাসলো। বললে—সে তো হবেই বাবু, আমার ফাঁসি দেওয়াই তো চাকরি, হুকুম হলেই ফাঁসি দেব—

—তা তোমার হুকুম হয়নি এখনও?

বুধুয়া বললে—হ্যাঁ বাবু, ডিমণ্টি সাহেব আমাকে হুকুম দিয়ে দিয়েছে—

সবাই বললে—তা এখন তো তোমারই কাজ তাহলে—এখন তাহলে তুমি তৈরি হও বুধুয়া—

তা তৈরি হবার অনেক কাজই আছে বুধুয়ার। লোহার কল মরচে পড়ে গেছে হয়ত কলের ভেতরে। সেই কলে তেল-টেল লাগাতে হবে।

বুধুয়া বললে—আমি তেল দিয়েছি কলে—

—আর দড়ি?

বুধুয়া বললে—দড়িতেও চর্বি লাগাচ্ছি, চর্বি মাখিয়ে মাখিয়ে দড়িটাকে পাকা করছি—প্রথম ফাঁসি তো, একটু সাবধান থাকতে হবে—

তা বটে। প্রথম ফাঁসি বলেই যা কিছু ভাবনা। নতুন ফাঁসিঘর, নতুন ফাঁসিকল,

BanglaBook.org

নতুন দড়ি। সবই নতুন। বুধুয়াও নতুন লোক। জীবনে আগে কখনও ফাঁসি দেয়নি। ভাবনা তো হবেই। ভাবনা সকলেরই। বুধুয়ার শুধু একলারই ভাবনা নয়, আমাদেরও ভাবনা। চন্দনপুর সুদ্ধু লোকের ভাবনা। মহারাজাবাহাদুরেরও ভাবনা। ডি'মণ্টি সাহেবেরও ভাবনা। ভাবনা মোট কথা, সকলেরই।

ডি'মণ্টি সাহেব এসে দেখে গেলেন একদিন। একবার ফাঁসিকলটা চালিয়ে দেখলেন।

বুধুয়াকে বললেন—সব ঠিক হ্যায় বুধুয়া?

বুধুয়া বললে—ঠিক হ্যায় হুজুর—

দেওয়ানজী নরহরি মহাপাত্রও এলেন একবার দেখতে। ফাঁসিকলটা চালিয়ে দেখলেন। শেষে ফাঁসি দেবার সময় যদি কলটা বিগড়ে যায়, তাহলেই মুশকিল। মহারাজাবাহাদুরের কাছে কারো মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।

তিনিও জিজ্ঞেস করলেন—সব ঠিক হ্যায় বুধুয়া?

বুধুয়া বললে—সব ঠিক হ্যায় হুজুর—

সবাই সরেজমিনে তদন্ত করে গেলেন। সবাই মহারাজাবাহাদুরের কাছে রিপোর্ট দিলেন—সব ঠিক আছে। কোনও গোলমাল নেই। তেল দিয়ে কল চালু রাখা আছে। দড়িতেও চর্বি মাখিয়ে মজবুত করা হয়েছে। সবই নির্বিঘ্নে সমাধা হবে। মহারাজাবাহাদুরের ভাবনা করবার কিছু দরকার নেই।

চব্বিশে এপ্রিলের আর বেশি দেরি নেই তখন।

কথা ছিল চব্বিশে এপ্রিল তারিখে সকাল ছটার সময় নিবারণ মহান্তির ফাঁসি হবে।

আমরা পানিগ্রাহীবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম—ভেতরে কাউকে ঢুকতে দেবে না স্যার?

পানিগ্রাহীবাবু বললেন—না, কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না—

আবার জিজ্ঞেস করলাম—তাহলে কে কে ভেতরে থাকবে ফাঁসির সময়?

পানিগ্রাহীবাবু বললেন—থাকবেন দেওয়ানজী নরহরি মহাপাত্র, জেলার ডি'মণ্টি সাহেব, ম্যাজিস্ট্রেট কলিন্‌স্ সাহেব, আর থাকবেন চন্দনপুরের মেডিক্যাল অফিসার—আর বুধুয়া তো থাকবেই!

বুধুয়া সেদিন বাজারে আসতেই সবাই ছেঁকে ধরলে।

সবাই বললে—কী গো বুধুয়া, এখন কেমন লাগছে? বুকটা দুর-দুর করছে না?

বুধুয়া বললে—কেন বাবু, বুক দুর-দুর করবে কেন?

সবাই বললে—না, মানে তুমি তো আগে কখনও ফাঁসি দাওনি কিনা! তাই বলছি—

বুধুয়া বললে—তা ফাঁসি না-ই বা দিলাম, ফাঁসি দেওয়া তো দেখেছি অনেক—

সবাই বললে—না, তাই বলছি, যেন ফসকে যায় না বাবা শেষকালে! নইলে বুঝতেই তো পারছো, বদনাম হয়ে যাবে চন্দনপুরের, বদনাম হয়ে যাবে মহারাজাবাহাদুরের—

একজন জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ গো, নিবারণ মহান্তিকে দেখেছ? কী করে সে এখন?

বুধুয়া বললে—আজ্ঞে, রাত্রে সে মোটে ঘুমোতে দেয় না আমাদের, যেদিন থেকে নিবারণ জেলখানায় এসেছে সেদিন থেকে কারো চোখে ঘুম নেই—

—সে কি?

BanglaBook.org

সত্যিই যে কদিন নিবারণ মহান্তি বেঁচে ছিল সে ক'দিনই চিৎকার করে সকলকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। জেলার সাহেবের পাগল হয়ে যাবার অবস্থা।

সকালবেলা কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ ফাঁসি-সেল থেকে চিৎকার উঠলো—ওরে বাবারে, ওরে বাবারে, মরে গেলাম রে—মেরে ফেললে রে বাবা—

জেলের পাহারাদার এসে জিজ্ঞেস করে—কী হলো?

নিবারণের মুখে তখন কোনও কথা নেই। কেবল হাউ-হাউ করে কাঁদে।

পাহারাদার বলে—কী, হলো কী তোমার?

নিবারণ হাত জোড় করে বলে—আমাকে ছেড়ে দাও না বাবা, তোমার পায়ে ধরছি, আমাকে ছেড়ে দাও—

পাহারাদার ধমকে ওঠে—থামো, চুপ করো, গোলমাল কোর না—

কিন্তু তা কি আর কেউ শোনে! নিবারণ মহান্তির চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়ে। বন্যা বয়ে যায় দু'চোখ দিয়ে। নিবারণ মহান্তি বলে—আমায় ছেড়ে দাও না যাদুধন, আমি যে মারা যাচ্ছি, আমার যে বড় কষ্ট হচ্ছে—

যতক্ষণ কেউ সামনে থাকে ততক্ষণ একটু চুপ করে। কিন্তু সামনে থেকে চলে গেলেই একেবারে চিৎকার করে জেলখানা কাঁপিয়ে দেয়। বলে—মেরে ফেল্লেরে বাবা, মরে গেলুম, জ্বলে গেলুম—ওরে বাবা, কে আছিস—

প্রথমে সুরটা একটু নিচু থাকে। তারপর একটু বাড়ে। তারপর সে-সুর ক্রমে সপ্তমে গিয়ে ওঠে।

জেলার ডি'মণ্টি সাহেব অফিসে কাজ করতে পারে না। অফিসের কাজ করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে—কে? ও চ্যাঁচাচ্ছে কে?

ওয়ার্ডার বলে—ও সেই ফাঁসির আসামী হুজুর—

সাহেব অতিষ্ঠ হয়ে উঠে যায় ফাঁসি-সেলের কাছে।

গিয়ে ধমক দেয় ডি'মণ্টি সাহেব। বলে—কী হচ্ছে, এত চেঁচাচ্ছ কেন?

নিবারণ মহান্তি হঠাৎ জেলার সাহেবকে সামনে দেখে থেমে যায়, বলে—হুজুর আপনি এসেছেন? এই দেখুন, আমার বুকে হাত দিয়ে দেখুন হুজুর, কী করছে এখানটায়—

—থামো!

ধমক দেয় ডি'মণ্টি সাহেব। বলে—তোমার কান্নার জ্বালায় কি কাজকর্ম কিছু করতে পারবে না লোকে? তুমি ভেবেছ কী?

নিবারণ মহান্তি বলে—হুজুর, আমার কষ্টের চেয়ে আপনাদের কাজকর্মটাই বড় হলো? আপনারা তো বরাবর কাজকর্ম করবেন, কিন্তু আমার কী হবে? আমার যে ফাঁসি হয়ে যাবে!

সাহেব বলে—তা তোমার ফাঁসি হবে, আমাদের কী? আমরা কেন কষ্ট পাবো?

নিবারণ মহান্তি হাত জোড় করে বলে—তা আমি কী করেছি হুজুর যে আমার ফাঁসি হবে?

সত্যি নিবারণ মহান্তি তখনও জানে না, কী অপরাধের জন্যে তার ফাঁসী হবে। আসলে তো সে ভাল হতে চেয়েছিল। দল ছেড়ে আবার সংসারী হতে চেয়েছিল। বিয়ে করতে চেয়েছিল। সংসার করতে চেয়েছিল। কিন্তু দলই তাকে ছাড়লে না। দলই তাকে ডোবালে শেষ পর্যন্ত! সে কী করবে? তার কি দোষ!

সারাদিন কেবল ভাবে নিবারণ মহান্তি। যত ভাবে তত চেঁচায়। তত বিরক্ত করে।

BanglaBook.org

সন্ধে হতে-না-হতে নিবারণের চিৎকারটা আরো বেড়ে যায়। তখন বাইরের গোলমালটা কমে আসে। তখন আরো ভয় করে নিবারণের। অন্ধকারে যেন নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে। তখন কান্না শুরু হয় নিবারণের। কান্না নয় আর্তনাদ। সে আর্তনাদে সমস্ত জেলখানাটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

ডিমণ্টি সাহেবেরই বেশি মুশকিল। তার কোয়ার্টারটা জেলখানার লাগোয়া। তার বিবি থাকে, তার দু'গণ্ডা ছেলে-মেয়ে থাকে কোয়ার্টারে। তারা ঘুমোতে পারে না। ঘুমের ঘোরের মধ্যে নিবারণের আর্তনাদ শুনে তারা চমকে ওঠে। কেঁদে ওঠে—

তখন জেলখানার ভেতর থেকে একটা বিকট চিৎকার উঠছে—ওরে মেরে ফেল্লেরে, মেরে ফেললে আমাকে—ওরে বাবারে—মা রে—এ-এ-এ-এ—

এক এক বার নিবারণ মহান্তির এক এক রকম চিৎকার। কখনও সরু, কখনও মোটা, কখনও কাঁপা গলা, কখনও চওড়া, কখনও চ্যাপ্টা—সে কী বিচিত্র সুর সব। অত বিচিত্র সুর একলা গলা দিয়ে যে কী করে বার করতে পারে নিবারণ. কে জানে।

আবার নিবারণকে দেখলে বোঝা যায় না যে এই লোকটার গলা দিয়েই এমন শব্দ বেরোতে পারে।

সকালবেলা অফিসে বসবার আগে ডিমণ্টি সাহেব একবার ঘুরে ঘুরে দেখা করে সব কয়েদীদের সঙ্গে। কার কি সুবিধে-অসুবিধে, কার কি কামনা-বাসনা সব জেনে যায়। প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলে।

নিবারণ মহান্তির সেল্‌টার সামনে ডিমণ্টি সাহেব এসে দাঁড়াল।

বলে—কি নিবারণ? তোমার খবর কী? কেমন আছো?

নিবারণ বলে—ভাল নেই হুজুর, বড় কষ্ট হচ্ছে—

সাহেব বলে—রাত্রে ঘুম না হলে কষ্ট তো হবেই—

—আজ্ঞে রাত্রে কী ক'রে ঘুমোই হুজুর, ঘুমোতে কি কেউ পারে? আপনিই বলুন না?

সাহেব সান্ত্বনা দেয়। বলে—তা তুমিই বা কী করবে, আর আমিই বা কী করবো—তবু চেষ্টা করো ঘুমুতে—

নিবারণ বলে—চেষ্টা করি হুজুর, কিন্তু ঘুম আসে না—শুধু গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে ইচ্ছে করে—

সাহেব আর কোন কথা না বলে চলে যাবার চেষ্টা করতেই নিবারণ ডাকে—হুজুর—

সাহেব ফিরে দাঁড়ায়, বলে—আর কিছু বলবে নিবারণ?

নিবারণ বলে—হুজুর, কোত্থেকে রোজ রাত্তিরে একটা ফুলের গন্ধ নাকে এসে লাগে—ওটা কী ফুল?

জেলখানার মধ্যে একটা হাস্‌নুহানার ঝাড় ছিল। রোজ রাত্রে জায়গাটা সুগন্ধময় করে তুলতো।

সাহেব বললে—ও হাস্‌নুহানা ফুল! কেন বলো তো?

নিবারণ বললে—হুজুর, গন্ধটা বড্ড মিষ্টি—

সাহেব বললে—কেন, মিষ্টি গন্ধ তোমার ভাল লাগে না?

নিবারণ বললে—আজ্ঞে না—গন্ধটা নাকে এলে বড় কষ্ট হয়, দম আটকে আসে—

সাহেব অবাক হয়ে গেল। যা'হোক, কয়েদীর যখন কষ্ট হচ্ছে, তখন আর

BanglaBook.org

দরকার নেই। সেই দিনই লোক দিয়ে হাস্‌নুহানার ডালগুলো সমস্ত কেটে ফেলবার হুকুম দিয়ে দিলে। হাস্‌নুহানার গাছটা অনেক দিনের। তবু, যখন নিবারণের কষ্ট হচ্ছে, দরকার কী! জায়গাটা সেই দিনই সাফ হয়ে গেল।

সাহেব ভেবেছিল সে-রাত্রে বুঝি আর চেঁচাবে না নিবারণ মহান্তি। তার কথামতই হাস্‌নুহানার গাছটা কাটা হয়ে গেছে। কিন্তু সন্ধে হবার পর থেকেই আবার বিকট আর্তনাদ! আবার সেই সরু মোটা নানান রকম গলার কাট-ফাটা চীৎকার। সেদিন ডিমণ্টি সাহেবের বিবির ঘুম হলো না। ডিমণ্টি সাহেবের ছেলে-মেয়েদের ঘুম হলো না।

পরের দিন ডিমণ্টি সাহেব আবার রোজকার মত ঘুরতে বেরিয়েছে।

নিবারণের কাছে এসে সাহেব জিজ্ঞেস করলে—কি নিবারণ? কেমন আছো?

নিবারণ বললে—আজ্ঞে হুজুর, ভাল নেই।

সাহেব জিজ্ঞেস করলে—কেন, ফুলের গন্ধ কাল পেয়েছিলে?

নিবারণ বললে—না, হুজুর—

সাহেব বললে—তা হলে অত চেঁচালে কেন কাল?

নিবারণ বললে—কষ্ট হলে কী করবো হুজুর, বলুন?

তারপর সাহেব চলে যাবার উপক্রম করতেই নিবারণ মহান্তি আবার ডাকলে—হুজুর—

সাহেব ফিরলো। বললে—কিছু বলবে?

নিবারণ বললে—হুজুর, এই দরজার ওপরের ফাঁকটা দিয়ে আকাশটা দেখা যায়—

ফাঁসি-সেলের দরজার মাথায় খুব উঁচুতে তিন ফুট লম্বা আর এক ফুট চওড়া একটা ঘুলঘুলি। ওটা ছিল ভেতরে আলো-বাতাস ঢোকবার জন্যে।

সাহেব বললে—তা আকাশ দেখা যাওয়া ভালো তো, একটু আলো-বাতাস আসবে—

নিবারণ বললে—না হুজুর, আকাশ দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়—

সাহেব অবাক হয়ে গেল। বললে—কেন?

নিবারণ বললে—আলো-বাতাস আমার আর দরকার নেই হুজুর—

—কেন, নিবারণ, আলো-বাতাস না এলে ছোট ঘরে বাঁচবে কী করে?

নিবারণ বললে—হুজুর, আমাকে তো আপনারা মেরেই ফেলবেন, তবে আর কেন বাঁচাবার চেষ্টা?

সাহেব বললে—তা তো হতে পারে না নিবারণ, এ ক'টা দিন তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে—

নিবারণ বললে—কতদিন?

সাহেব বললে—এই চব্বিশে এপ্রিল পর্যন্ত—

নিবারণ বললে—চব্বিশে এপ্রিল হতে আর কতদিন আছে হুজুর?

সাহেব হিসেব করে বললে—আর তেরো দিন—

—এখনও তেরো দিন? কিন্তু আর যে পারি না হুজুর! শিগ্‌গির শিগ্‌গির শেষ করে দিন আমাকে—

সাহেব বললে—তা তো হয় না নিবারণ, যে-তারিখে ফাঁসি হবার কথা, সেই দিনেই ফাঁসি হবে, তার আগে হতে পারে না।

নিবারণ বললে—কেন, এরকম কষ্ট কেন দিচ্ছেন হুজুর? আইনটাই বড় হলো আপনাদের কাছে?

BanglaBook.org

সাহেব এ-কথার জবাব না দিয়ে চলে গেল সেদিন। সাহেব চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার চিৎকার আরম্ভ করলে নিবারণ।

পরের দিন সকালবেলা আবার ডিমণ্টি সাহেব বেরিয়ে প্রত্যেক কয়েদীকে দেখে গেল।

নিবারণ মহান্তির কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে—কেমন আছো নিবারণ?

নিবারণ বললে—আজ্ঞে ভালো নেই হুজুর—

রোজ সেই একই প্রশ্ন, আর রোজ সেই একই উত্তর।

সাহেব আবার জিজ্ঞেস করলে—কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

নিবারণ বললে—হচ্ছে হুজুর—

—কী অসুবিধে?

সাহেব চলতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেল। বললে—বলো তোমার কী অসুবিধে?

নিবারণ বললে—আজ্ঞে, দরজার মাথায় এই ফাঁকটা দিয়ে আকাশটা দেখা যায়—

সাহেব বললে—তা আকাশ দেখা গেলেই বা, তাতে অসুবিধেটা কী?

নিবারণ বললে—আজ্ঞে, বড্ড অসুবিধে, আকাশটা দেখা যাওয়া ভাল লাগে না।

সাহেব তবু বুঝতে পারলে না ব্যাপারটা।

বললে—আকাশ দেখতে ভাল লাগে না কেন?

নিবারণ বললে—আজ্ঞে, রাত্তিরবেলা আকাশের তারাগুলো দেখা যায় যে—

সাহেব বললে—তা দেখা গেলেই বা, তাতে তোমার কী ক্ষতি?

নিবারণ বললে—তারাগুলো দেখলে বড্ড কষ্ট হয় হুজুর—বড্ড বাঁচতে ইচ্ছে করে—

সাহেব আশ্বাস দিলে। বললে—আচ্ছা তাই-ই হবে—আকাশ বন্ধ করে দেব—

তা তাই-ই হলো। সেই দিনই রাজমিস্ত্রী ডেকে দরজার মাথায় ঘুল্‌ঘুলিটা বন্ধ করে দিলে ডিমণ্টি সাহেব।

সাহেব ভেবেছিল আর বোধ হয় চিৎকার করবে না নিবারণ মহান্তি। কিন্তু সেদিনও তার চিৎকার বন্ধ হলো না। নাগাড়ে চিৎকার করতে লাগলো নিবারণ মহান্তি—ওরে বাবারে, মেরে ফেল্লেরে, মরে গেলুম রে—

দেখতে দেখতে ফাঁসির দিন এসে গেল। সে ক'টা দিন যে কী করে কাটলো ডিমণ্টি সাহেবের, তা সকলেই জানে। কতদিন ধরে ঘুম নেই। কতদিন ধরে ডিমণ্টি সাহেবের বিবি আর ছেলে-মেয়েরা ঘুমোতে পারেনি। সারা রাত সাহেবকে জেগে জেগে কাটাতে হয়েছে বিবি ছেলে-মেয়ে নিয়ে। শেষকালে সেই নির্ধারিত তারিখ এসে গেল।

পরের দিন সকাল ছ'টার সময় ফাঁসি!

রেসিডেণ্ট জোন্‌স্‌ সাহেব একবার টেলিফোন করলেন মহারাজাবাহাদুরকে।

জেজ্ঞেস করলেন—সমস্ত ঠিক আছে—এভ্‌রিথিং অল্‌রাইট্‌ উইথ্‌ দি কন্‌ভিক্‌ট্‌?

মহারাজাবাহাদুর রণজিত সিং দেব বিক্রম টেলিফোন করলেন দেওয়ান নরহরি মহাপাত্রকে—

জিজ্ঞেস করলেন—সব ঠিক আছে মহাপাত্র?

ওদিকে দেওয়ানজী নরহরি মহাপাত্র টেলিফোন করলেন ডিমণ্টি সাবেহকে। জিজ্ঞেস করলেন—সব ঠিক আছে ডিমণ্টি?

ওদিকে বুধুয়াও নিশ্চেষ্ট বসে ছিল না। সে তার কাজ করছে। রোজ একবার

BanglaBook.org

করে দড়িটাতে চর্বি মাখিয়েছে আর রোদে শুখোতে দিয়েছে। বেশ শান্ দেওয়া ধারালো চেহারা হয়েছে দড়িটার। একবার গলায় লাগিয়ে টান দিলে আর দেখতে হবে না। গলায় বসে গিঁথে যাবে খাপে খাপে।

সুতরাং সব ঠিক আছে। কারোর কোনও ভাবনা করবার দরকার নেই।

পরের দিন ভোর ছ'টার সময় ফাঁসি। সুতরাং দেওয়ান নরহরি মহাপাত্রকে একটু সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেট কলিন্স্ সাহেবকেও ভোর ভোর উঠে এসে হাজির হতে হবে। আর ডি'মণ্টি সাহেব তো আছেই। আর আছে বুধুয়া। সে তো উঠবেই। রাত তিনটের সময় উঠে সব তোড়জোড় করতে হবে। ভোরবেলো নিবারণ মহান্তিকে স্নান করাবে সে। মেডিক্যাল অফিসার এসে তার স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করবে। তারপর আসল কাজ।

বিকেল থেকেই সব বন্দোবস্ত হয়ে রইল। আয়োজন ঠিক রইল--ভালোয় ভালোয় এখন শেষরক্ষা হলেই হয়।

বললাম—তারপর?

ত্রিপাঠি বললে—তারপর সে-রাত্রে আমরা আর ঘুমোতে পারলাম না হুজুর। ভোর ছ'টায় ফাঁসি। ভোরবেলাই ঘুম থেকে উঠে গিয়ে যেতে হবে ফাঁসিঘরের সামনে। অবশ্য ফাঁসি দেখতে আমি পাব না কিন্তু বাইরেই না হয় দাঁড়িয়ে থাকবো। বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনবো ভেতরে কী হয়!

কিন্তু গিয়ে শুনলাম বুধুয়াকে কিছু করতেই হয়নি। তার আগেই সব শেষ।

বললাম—সে কি?

ত্রিপাঠি বললে—হ্যাঁ, সে এক তাজ্জব কাণ্ড হুজুর!

বললাম—কী রকম?

ত্রিপাঠি বললে—তবে গোড়া থেকে শুনুন—

সে-রাত্রে নিবারণ মহান্তি সন্ধে থেকে আর কাউকে তিষ্ঠোতে দেয়নি এমন চিৎকার করেছে। সে-চিৎকারের জ্বালায় জেলখানা সুদ্ধু লোক উদ্বাস্ত হয়ে উঠেছে একেবারে। সন্ধে থেকেই চিৎকার করছে—ওরে বাবারে, মেরে ফেল্লেরে—মারা গেলুম রে—

জেলার ডি'মণ্টি সাহেব শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে দৌড়ে এসেছে। এসেই ধমক্ দিয়েছে নিবারণকে।

বলেছে থামো, থামো বলছি—স্টপ—

নিবারণ মহান্তি তখন ডি'মণ্টি সাহেবকে দেখে তার পা দু'টো জড়িয়ে ধরতে এসেছে দূর থেকে।

বলেছে—থামতে যে পারছি না হুজুর, আমি যে থামতে পারছি না—

তবু ডি'মণ্টি সাহেব ধমক্ দিয়েছে। বলেছে—থামো বলছি, থামো শিগগির—থামো—স্টপ—

কিন্তু নিবারণের তখন শেষ অবস্থা। সে কী করে থামবে!

বললে--কখন ছ'টা বাজবে হুজুর? আর যে পারছি না আমি—

ডি'মণ্টি সাহেব বললে—যখন হবে তখন হবে, এখন চুপ করে ঘুমোও—

বলে সাহেব নিজের কোয়ার্টারে চলে গিয়েছিল। কিন্তু সন্ধে থেকে সেই যে নিবারণ মহান্তির উৎপাত শুরু হলো সে আর থামে না। যত রাত বাড়ে তত চিৎকার। সে চিৎকারে জেলখানা যেন ফেটে পড়তে লাগলো। আশ্চর্য! এতদিন নাগাড়ে চেঁচিয়েও যেন গলা এতটুকু ভাঙেনি নিবারণের। যেন গলায় দানা বেরোচ্ছে। গলা সেধে-সেধে যেন গলাটা খুলে গেছে তার।

BanglaBook.org

নানান্ সুরে তখন নিবারণ চিৎকার করছে—ওরে বাবারে, মেরে ফেল্লেরে আমায়, আমার প্রাণ বেরিয়ে গেল রে—

প্রথমটায় ডিমণ্টি সাহেব চোখ কান নাক বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করেছিল। ঘরের দরজা-জানালা-শার্শি-খড়খড়ি সব বন্ধ করে দিয়ে ঘুমের সাধনা করেছিল। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না চিৎকারের জ্বালায়। ফাঁসির আসামী যেন প্রাণ বার করে চিৎকার করতে শুরু করেছে!

একদিন নয়, দু'দিন নয়, প্রতিদিন রাত্রে ঘুম নেই, কোনও সুস্থ লোক এ সহ্য করতে পারে!

ডিমণ্টি সাহেব উঠে আলো জেবলে একবার ঘড়ি দেখলে। ঘড়িতে তখন মাত্র বারোটা বেজেছে। তারপর আবার বিছানায় শুতে চেষ্টা করলে।

মেমসাহেব জিজ্ঞেস করলে—ক'টা বাজলো?

ডিমণ্টি সাহেব বললে—এ কি, তুমি ঘুমোওনি এখনও?

মেমসাহেব বললে—ঘুম আসবে কী করে? রাসকেলটার জ্বালায় কি ঘুমোবার উপায় আছে? এতদিন না ঘুমিয়ে কেউ থাকতে পারে?

ছেলে-মেয়েরাও ঘুমোয়নি। তারাও উস্‌খুস্ করছে। ছোট দুটো কেঁদে উঠলো চিৎকারের ঠেলায়।

মেমসাহেব বললে—ইম্‌পসিবল্, অসম্ভব, আপদটাকে দূর করতে পারো না?

ডিমণ্টি সাহেব বললে—আজ তো খতম হবে—

মেমসাহেব বললে—সে তো সেই ভোর ছটায়। কিন্তু এতক্ষণ কী করে কাটাবো, এ যে অসহ্য—

ডিমণ্টি সাহেব বললে—একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো ডিয়ার, আজকেই তো শেষ!

মেমসাহেব বললে—আমি পারি না, আজ রাতটা যেন আর কাটবে না—

আবার খানিকক্ষণ ঘুমোবার চেষ্টা করলে দু'জনে। কিন্তু সে কেবল চেষ্টাই সার। কাজ কিছু হলো না।

শেষকালে ডিমণ্টি সাহেবের মাথায় খুন চেপে গেল।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো বিছানা থেকে। না, এ প্রাণ বার করে তবে ছাড়বে একেবারে। রাত তখন দু'টো। সেই অত রাত্রে ডিমণ্টি সাহেব আবার গেটের তালা খোলালো। আবার কয়েদীদের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। আবার ফাঁসি-সেলের কাছে গিয়ে ধমক দিলে।

বললে—স্টপ্ রাসকেল—চুপ করো, তোমার জ্বালায় কি কেউ ঘুমোতে পারবে না?

নিবারণ মহান্তি তখন ঘেমে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

বললে—আর কত দেরি হুজুর?

ডিমণ্টি সাহেব বললে—আর চার ঘণ্টা চুপ করে থাকো, তারপরেই ফাঁসির ব্যবস্থা হবে—

নিবারণ মহান্তি বললে—আর কেন ঝুলিয়ে রাখছেন হুজুর, ফাঁসিটা দিয়ে দিন না! আমার ফাঁসি হলে আপনারাও বাঁচেন, আমিও বাঁচি—

ডিমণ্টি সাহেব বললে—আর চার ঘণ্টা চুপ করে থাকো—আমাদের একটু ঘুমোতে দাও—প্লিজ—

নিবারণ মহান্তি বললে—আপনার দু'টি পায়ে পড়ি হুজুর, আমাকে ফাঁসি দিয়ে দিন—

BanglaBook.org

সাহেব বললে—তা কি করে হয়, ফাঁসি ওমনি দিলেই হলো? একটা আইন নেই—কানুন নেই?

নিবারণ বললে—হুজুর, দুঘণ্টার এদিক-ওদিকে কী এমন সর্বনাশ হবে?

সাহেব বললে—তা কখনও হয়? আইন মানতেই হবে—

নিবারণ বললে—হুজুর আইনটাই বড়ো হলো? আমার কষ্টটা কিছু নয়?

সাহেব বললে—তা দুঘণ্টা পরে ফাঁসি হলে তোমারই বা কী ক্ষতি?

মহান্তি বললে—আজ্ঞে দুঘণ্টা আগে হলে আইনেরই বা কী ক্ষতি? আমি যে আর পারছি না হুজুর, আমি যে এ ক'দিন মরে বেঁচে আছি—

সাহেব বললে—এতদিনই সহ্য করলে যখন, আর কয়েক ঘণ্টা সহ্য করো—তুমি একটু চুপ করো, আমরা একটু ঘুমোই। আমরা যে ঘুমোতে পারিনি এই ক'দিন, আমার ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত ঘুমোতে পারেনি তোমার চেঁচানোর ঠেলায়।

নিবারণ আবার কেঁদে ফেললে হাউ-হাউ করে। সাহেবের সামনেই কেঁদে ভাসিয়ে দিলে।

বললে—আপনাদের ঘুমটাই বড় হলো হুজুর, আমার যে প্রাণ বেরোচ্ছে, তা তো আপনারা কেউ দেখছেন না—

ডিমণ্টি সাহেব আর কথা না বাড়িয়ে চলে এল। চলে আসার সঙ্গে সঙ্গেই নিবারণ মহান্তি আবার চিৎকার শুরু করলে। আবার বলতে লাগলো—ওরে বাবারে, মেরে ফেল্লেরে, মরে গেলাম রে বাবা—

অসহ্য, অসহ্য! সাহেব এসেই টেলিফোন তুলে ধরলো। ম্যাজিস্ট্রেট কলিন্‌স্‌ সাহেবকে ডাকলে।

—স্যার, আমি তো আর থাকতে পারছি না, আর টিকতে পারছি না বাড়িতে।

—কেন?

ডিমণ্টি সাহেব বলে—লাস্ট পঁচিশ দিন ধরে আমি আর আমার হোল্‌ ফ্যামিলি রাত জেগে কাটাচ্ছি, নিবারণ আজ বড় বিরক্ত করতে আরম্ভ করেছে, একটু আগেই ফাঁসির ব্যবস্থা করা যায়?

কলিন্‌স্‌ সাহেব জিজ্ঞেস করলে—এখন ক'টা?

ডিমণ্টি সাহেব বললে—এখন রাত তিনটে—

কলিন্‌স্‌ সাহেব বললে—অল্‌ রাইট—

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও বোধ হয় ঘুমে ঢুলছিল। তাড়াতাড়ি অনুমতিটা দিয়েই আবার ঘুমোতে গেল।

তারপর ডিমণ্টি সাহেবই খবরটা দিলে। মেডিক্যাল অফিসার, দেওয়ানজী, —সবাইকে টেলিফোন করে ঘুম থেকে ওঠালে। সকলেই এল জেলখানায়। সকলেই ঘুমে ঢুলছিল। মাঝ-রাত্রে উঠতে হয়েছে সকলকেই। সকলেই বিরক্ত। তাড়াতাড়ি ফাঁসিটা দিয়ে দিতে পারলেই ল্যাঠা চুকে যায়। বাকি রাতটা আবার বাড়িতে গিয়ে ঘুমোনো যায়।

নিবারণ মহান্তির দরজাটার চাবি যখন খুললো, তখন সে নিজেও অবাক হয়ে গেছে।

বললে—কী গো, ফাঁসি হবে এখন?

পাহারাদার বললে—হ্যাঁ—সাহেব হুকুম দিয়েছে

নিবারণ বললে—কোন্‌ দিকে? কোথায় যাবো বলো না গো?

পাহারাদার বললে—এখন চান্‌ করাতে হবে তোমাকে—

নিবারণ বললে—আবার চান করার কী দরকার, ফাঁসি যখন হবে, তখন চান্‌

BanglaBook.org

করিয়ে কী হবে?

যা নিয়ম তা করতেই হবে। নিবারণ মহান্তি নিজেই দু'চার ঘটি জল ঢালে মাথায়। পাহারাদারকে কিছু করতে হলো না। পাহারাদার মাথা-গা মুছিয়ে দিতে আসছিল।

নিবারণ বললে—আর গা মুছিয়ে দিয়ে কী হবে? ফাঁসি যখন হবে তখন সর্দি লাগবার ভয় তো আর নেই গো—

পাহারাদার তা শুনবে কেন? নিয়ম-কানুন যা আছে, তা মানতেই হবে! কিন্তু তাকে কিছুই করতে হলো না। নিবারণ নিজেই গামছাটা নিয়ে গা-হাত-পা মুছে নিলে তাড়াতাড়ি।

বললে—কোথায় নিয়ে যাবে চলো না গো, আর যে দেরি সইছে না—

পাহারাদারদের সঙ্গে নিবারণ মহান্তি চলতে লাগলো। নিবারণের যেন আর দেরি সইছে না।

নিবারণ বললে—এত দেরি করছো কেন গো—চলো না শিগগির—

তারপর ফাঁসিঘরের কাছে এসে পেঁছোতেই নিবারণ মহান্তি নিজেই ভেতরে ঢুকে গেল। বললে—কী করতে হবে বলো, কোন্‌টা গলায় পরতে হবে? বড় দেরি করছো তোমরা—

বুধুয়া তৈরিই ছিল দড়ি নিয়ে!

কিন্তু নিবারণ মহান্তির তখন আর তর সইছে না। সে নিজেই দড়িটা নিয়ে নিজের গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়লো। বললে—আঃ, বাঁচলুম—

বুধুয়াকে কিছু করতেই হলো না বলতে গেলে। নিবারণ মহান্তির দেহটা তখন ঝুলছে। চোখ দু'টো বেরিয়ে এসেছে ঠিকরে, জিভটা বেরিয়ে গেছে একহাত। ডি'মণ্টি সাহেব এতক্ষণে হাফ্ ছেড়ে বাঁচলো যেন। বললে—ওঃ, বাঁচলুম!

মেডিকেল অফিসার, দেওয়ানজী সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। মহারাজাবাহাদুরের শখের জন্যে এতগুলো লোকের কী প্রাণান্তকর পরিশ্রম যে গেছে ক'মাস ধরে তার ঠিক নেই। এতদিনে শান্তি হলো।

সবাই জেলখানা থেকে বেরোচ্ছে—এমন সময় মহারাজাবাহাদুরের টেলিফোন এলো।

ডি'মণ্টি সাহেব ধরলে।

—কে?

ওপাশ থেকে মহারাজাবাহাদুর বললেন—দেওয়ান কোথায়?

দেওয়ানজী নরহরি মহাপাত্র টেলিফোন ধরতেই মহারাজাবাহাদুর বললেন—ফাঁসি হবে না, আজ ফাঁসি বন্ধ থাক—

দেওয়ানজী বললেন—অল্ রাইট ইওর ম্যাজেস্টি—

সর্বনাশ! দেওয়ানজী তাড়াতাড়ি টেলিফোনটা ছেড়ে দিলেন। মেডিকেল অফিসার, ডি'মণ্টি সাহেব সবাই অবাক। সবাই স্তম্ভিত! সবাই ভয়ে জড়সড়ো!

ডি'মণ্টি সাহেব দেওয়ানজীকে জিজ্ঞেস করলে—কেন স্যার, কী ব্যাপার হঠাৎ?

ত্রিপাঠি গল্প থামালো।

বললাম—কেন ত্রিপাঠি, কী ব্যাপার হলো হঠাৎ?

ত্রিপাঠি বললে—আজ্ঞে, মা-সাহেবা হঠাৎ সেদিন রাত্রে চন্দনপুরে এসে হাসির। তাঁর তখন আসার কথা নয় অত তাড়াতাড়ি। কিন্তু শরীর খারাপ হওয়াতে একটু আগেই এসে পড়েছেন। যখন স্পেশাল ট্রেন এসে পেঁছেছে তখন মাঝরাত। মহা-

BanglaBook.org

রাজাবাহাদুর, রাণীসাহেবা খবর পেয়েই স্টেশনে গেছেন।

মা-সাহেবা ট্রেন থেকে নেমেই জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা নাকি ফাঁসিঘর করেছ চন্দনপুরে?

মহারাজাবাহাদুর বললেন—হ্যাঁ, মা-সাহেবা—

—কেন?

মহারাজাবাহাদুর বললেন—নিজাম বাহাদুরের ফাঁসিঘর আছে, বরোদার গায়কোয়াড়ের আছে, চন্দনপুরেরই বা থাকবে না কেন?

মা-সাহেবা বললেন—আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন চন্দনপুরে ফাঁসি হতে পারবে না—

মহারাজাবাহাদুর বললেন—আজকে ভোরবেলাই যে একজন খুনীর ফাঁসি হবার কথা—সব বন্দোবস্ত যে তৈরি।

মা-সাহেবা বললেন—তা হোক, চন্দনপুরে এ-সব চলবে না—এখনি হুকুম দিয়ে বন্ধ করে দাও—

তারপর জিজ্ঞেস করলেন—কখন, কটার সময় ফাঁসি?

মহারাজাবাহাদুর বললেন—ভোর ছ'টার সময়—

মা-সাহেবা বললেন—ঠিক আছে, এখনও তো দু'ঘণ্টা সময় আছে, ফাঁসি বন্ধ করে দাও—

মহারাজাবাহাদুর তখনি টেলিফোন করে দিলেন দেওয়ানজীকে। দেওয়ানজী বাড়ি ছিলেন না, তিনি গিয়েছিলেন জেলখানায়। জেলখানাতেই মহারাজাবাহাদুর টেলিফোন করে বলে দিলেন—ফাঁসি বন্ধ থাক, ফাঁসি এখন হবে না—

—তারপর?

ত্রিপাঠি বললে—সেই-ই চন্দনপুরে প্রথম ফাঁসি হুজুর। প্রথম ফাঁসিও বটে, আবার শেষ ফাঁসিও বটে। দেখুন হুজুর, আসলে ওই মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষের জন্যেই নিবারণ মহান্তির ফাঁসিটা হলো, আবার মেয়েমানুষের জন্যেই ফাঁসিটা বন্ধও হয়ে গেল! সব ব্যাপারের গোড়াতেই হলো মেয়েমানুষ আজ্ঞে। তারপর থেকে আর কোন ফাঁসি হয়নি চন্দনপুরে। আর কোনও গণ্ডগোলও হয়নি। আসল ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ধামা-চাপা দেওয়া হয়েছিল। তারপর কী সব হয়ে গেল। কোথায় গেল সেই চন্দনপুর, কোথায় গেল সেই চন্দনপাহাড়! কোথায় গেল সেই মা-সাহেবা আর কোথায় গেল মহারাজাবাহাদুর রণজিত সিং দেব বিক্রম। এখন কলকাতায় মহারাজাবাহাদুর থাকেন। শুনেছি অনেকগুলো রেসের ঘোড়া কিনেছেন সেখানে। কেউ চেনেও না, কেউ খাতিরও করে না তেমন। এখন এখানে টুরিস্টরা আসে হুজুর। এসে এই ডাক-বাংলোতে থাকে। আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সকলকে দেখাই। সকলকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব গল্প বলি। আমেরিকানরা আসে, জার্মানরা আসে, ইংরেজরা আসে—আর আমাকে সার্টিফিকেট দিয়ে যায়।

তারপর হঠাৎ ত্রিপাঠি বললে—আপনার একটা সার্টিফিকেট চাই হুজুর—

রাত হয়েছিল অনেক। ত্রিপাঠি হ্যারিকেনটা কাছে টেনে নিয়ে পকেট থেকে একটা সাদা কাগজ বার করলে। তারপর একটা কলম আর কাগজটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—এইতে দু'লাইন সার্টিফিকেট লিখে দিন হুজুর, আমি কাছে রেখে দেব।

আমি উঠে পড়লাম। বললাম—আজ আর নয় ত্রিপাঠি, কাল সকালে এসো তুমি!

BanglaBook.org

বেনারসী

বিডন্ স্কোয়ারের পাশ দিয়ে আসছিলাম। স্কোয়ারের ভিতরে তখন যেন সভা-টভা কিছু একটা হচ্ছিল। বিকেল বেলা। ভিতরে অনেক মহিলাদের ভিড়। সবাই ঘোমটা দিয়ে বসেছে। কে একজন বুঝি তখন বক্তৃতা দিচ্ছে জোরে জোরে। পার্কের বাইরেও বেশ ভিড়। যারা বাইরে দাঁড়িয়ে, তারা বক্তৃতা শুনুক, আর না-শুনুক, বেশ হাসাহাসি করছে মনে হল। পার্কের ভিতরে যত ভিড়, পার্কের বাইরেও তার চেয়ে কম ভিড় নয়। বেশ কিছু পরিমাণে লোক দল বেঁধে এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে সেই দিকে আর নিজেদের মধ্যে বেশ হাসাহাসি করছে।

একটু কৌতূহল হল।

পাশে একলা একজন ছোকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছিল। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এ কাদের মীটিং মশাই?

ছোকরা হেসে ফেললে। তবু তাৎপর্য বুঝলাম না।

বললাম মেয়েদের কিসের মীটিং? এরা কারা?

ছোকরা হেসে ফেললে। তারপর আমার আপাদ-মস্তক চেয়ে দেখে কী ভাবলে কে জানে। বললে,সতী-লক্ষ্মীদের মশাই—

বুঝতে পারলাম না ঠিক।

জিজ্ঞেস করলাম, সতী-লক্ষ্মীদের?

—হ্যাঁ মশাই, সতী-লক্ষ্মী, সাক্ষাৎ সতী-লক্ষ্মী সব রামবাগানের সতী-লক্ষ্মীদের—

আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না সেখানে। হন্ হন্ করে চলেই যাচ্ছিলাম। খানিকদূর গেছি। তখনও বিড্ন-স্কোয়ারের রেলিংটা পার হই নি। ভিতরেও তখন বক্তৃতা হচ্ছে পুরো দমে। মাইক্রোফোন লাগিয়ে যেমন পুরো দস্তুর সভা হয় তেমনি হচ্ছে। কানে আসছে কিছু কিছু কথা।

হঠাৎ দেখলাম এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। দাঁড়িয়েছেন ছাতির উপর ভর দিয়ে।

যেতে যেতে তাঁর মুখের উপর দৃষ্টি পড়তেই কেমন থমকে দাঁড়ালাম। যেন চেনা-চেনা মনে হল।

মুখুজ্জে মশাই না?

আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তখনও ভদ্রলোকের খেয়াল নেই। মুখে দাড়ি-গোঁফ গজিয়েছে বেশ। অনেক দিন কামান নি। সেইরকম কোট। হাতে ছাতি।

বললাম, মুখুজ্জে মশাই না?

মুখুজ্জে মশাই প্রথমটা যেন আমায় চিনতে পারলেন না ঠিক। কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর যেন আমাকে দেখে চমকে উঠলেন।

আবার বললাম, মুখুজ্জে মশাই না?

মুখুজ্জে মশাই হ্যাঁ না বলে চলে যাচ্ছিলেন। যেন পালিয়েই যাচ্ছিলেন। আমি কোটের হাতাটা ধরে ফেললাম।

মুখুজ্জে মশাই যেন তবু চিনতে পারলেন না আমাকে।

বললেন, আপনি কে? আমি ঠিক.....

বললাম, আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি ডাক্তারবাবুর ভাই।

BanglaBook.org

—কোন্ ডাক্তারবাবু? আমি তো ডাক্তারবাবুকে.....

আম্‌ত আম্‌তা করতে করতে মুখুজ্জে মশাই আমার হাত ছাড়িয়ে হয়ত সরে যাবার চেষ্টা করছিলেন। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম পথ আটকে। মুখুজ্জে মশাই তখন উল্টোদিকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন।

বললাম. এত বছর পরে দেখা, আপনাকে কিন্তু আমি ঠিক চিনতে পেরেছি—

—কিন্তু আমি তো চিনতে পারছি না ভাই!

বললাম. কিন্তু আপনাকে আমি আজ আর ছাড়ছি না—। জেনকিন্‌স্ সাহেব তারপরে আপনাকে অনেক খুঁজলে, প্রেমলানী সাহেব আপনার জন্যে বিলাসপুরে লোক পাঠালে, কাট্‌নি-ট্রেনের ভেন্ডারদের বলে দেওয়া হল। আপনার ঘরের দরজায় তালাচাবি বন্ধ করে দিয়েছিলেন আপনি—সব জিনিসপত্র জেনকিন্‌স্ সাহেব লিস্ট করে রেলের স্টোর্সে রেখে দিলে—

মুখুজ্জে মশাই আমার দিকে চেয়ে যেন কিছু বলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছু যেন মুখ দিয়ে বেরল না তাঁর!

বললাম. বেনারসীকে চেনেন আপনি?

মুখুজ্জে মশাইয়ের মুখ যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সেই মুখুজ্জে মশাই, আমার সঙ্গে দেখা হলেই পকেট থেকে পান বার করতেন। বলতেন. পান খাবে নাকি ভায়া?

পান খাওয়াটা একটা নেশা ছিল মুখুজ্জে মশাইয়ের। শুধু মুখুজ্জে মশাই নয়, মুখুজ্জেগিন্নীরও। মস্ত বড় একটা পান সাজবার ডাবর ছিল। তার মধ্যে ভিজে ন্যাকড়ায় জড়ান থাকত পানগুলো। আর একটা পানের মশলা রাখবার জায়গা। প্রায় ত্রিশটি বাটি একসঙ্গে আঁটা। কোনোটাতে লবঙ্গ, কোনোটাতে এলাচ, কোনো-টাতে সুপুরি, এইরকম। মুখুজ্জেগিন্নীর মুখে সব সময় পান থাকত। সব সময় পানটা মুখের মধ্যে ফুলে থাকত। কাজ করতে করতেও পান, ঘুমোতে ঘুমোতেও পান চাই তাঁর। মুখুজ্জে মশাই রবিবার ছুটি হলেই কাট্‌নি চলে যেতেন। যার যা জিনিস দরকার মুখুজ্জে মশাইকে বললেই এনে দিতেন।

যাবার আগে মুখুজ্জে মশাই আসতেন আমাদের বাড়িতে।

বলতেন, ডাক্তারবাবু ও ডাক্তারবাবু—

আমি বাইরে আসতেই মুখুজ্জে মশাই বলতেন, তোমাদের কী আনতে হবে বল ভায়া. আমি কাট্‌নি যাচ্ছি—গুড় আনতে হবে কিনা জিজ্ঞেস করতো? শুনলাম কাট্‌নিতে খেজুরের গুড় উঠেছে—

আর শুধু কি গুড়? কারোর গুড়, কারোর শাড়ি, কারোর পটল, কারোর গম ভাঙাতে হবে। অনেক রকম কাজ কাট্‌নিতে। অনুপপুরে বলতে গেলে কিছুই পাওয়া যেত না। হপ্তায় একদিন হাট হত অনুপপুরে। স্টেশনের পিছন দিকে বস্তির ধারে ফাঁকা মাঠটাতে বাজার বসত। সেদিন অফিস ছুটি। সারা অনুপপুরের কলোনীটা সেদিন চুপচাপ। ফোরম্যান প্রেমলানী সাহেবের কারখানা বন্ধ। সাত দিনের মত আলু, পেঁয়াজ, শাক-সব্জি সেই হাট থেকে কিনে রাখতে হবে। বিলাসপুর থেকে সোজা একজোড়া রেল-লাইন চলে গেছে কাট্‌নির দিকে। জব্বল-পুর যেতে চাও কি বোম্বাই যেতে চাও তো ওই কাট্‌নিতে গিয়ে ট্রেন বদলাতে হবে। আর ওই বিলাসপুর আর কাট্‌নির মধ্যিখানে অনুপপুর। চারিদিকে ধু ধু করছে ব্ল্যাক কটন সয়েল। কালো রঙ, গ্রীষ্মকালে ফুটিফাটা থাকে। তারপর জুন মাসের মাঝামাঝি যখন প্রথম মন্‌সুন শুরু হবে, বৃষ্টির জল পড়তে না পড়তে সেই ফাঁক থেকে সব সাপ বেরিয়ে আসবে। ক্রেট সাপ। কালো কালো সরু লম্বা

চেহারার সাপগুলো। তখন সব সাপগুলো ঘরের মধ্যে এসে ঢুকবে। উঠোনে বারান্দায় রান্নাঘরে, বিছানার মধ্যে পর্যন্ত এসে ঢুকবে। অফিস থেকে কার্বলিক এসিড্ দিয়ে যায় বাড়িতে বাড়িতে। বাড়ির চারিদিকে কার্বলিক এসিড ছড়িয়ে দিয়ে যায় অফিসের মেথররা। তবু সাপ আসে।

আবার জিজ্ঞেস করলাম, বেনারসীকে চেনেন না আপনি?

সে কী কান্ড! সি-পির গরম তখন, দুপুরবেলা লু ছোটে। রাত্রে ঘুম হয় না কারও। ইলেকট্রিক আলো নেই, ইলেকট্রিক পাখা নেই। সব খড়ের চালের ঘর নদীর ধার ঘেঁষে। শোন নদী দেখতে চওড়া এক ফুটের মতন। জল আছে কি না আছে। কন্ট্রাক্টার হুকুম সিং-এর লোক এপার থেকে ওপারে যায় হাঁটুর কাপড় তুলে। পাথুরে মাটি। নদীর তলাতেও পাথর। এলোমেলো এবড়ো-খেবড়ো জায়গা। সেই নিয়েই অনুপপুরের কলোনী। কিছু বাঙালী, কিছু হিন্দুস্থানী। সবাই কনস্ট্রাকশানের চাকরিতে এসে জুটেছে অনুপপুরে। মাঝে মাঝে উঁচু উঁচু জমি, তার উপর সব কয়েকটা সিমেন্টের দেওয়াল, পাকা উঠোন আর খড়ের চালের বাড়ি। আবার মাঝখানে কিছু কিছু খাদ। খাদের ভিতর জঙ্গল। সেখানে সাপ-খোপ বিছে। আবার তারপরই উঁচু জমি। জমির উপর কয়েকটা বাড়ি। যখন লু ছোটে দুপুরবেলা তখন কেউ বাড়ির বাইরে বেরতে পারে না। হু হু করে হাওয়া বয় পশ্চিম থেকে। চালের খড়গুলো উড়ে উড়ে উঠে পড়ে। রাস্তার উপর কয়লার গুঁড়ো ছড়ানো থাকে, সে গুঁড়োগুলো উড়ে উড়ে ঘরের বন্ধ জানলা দরজায় এসে লাগে। উঠোন ঘর দোর বিছানা বালিশ সব ধুলোয় ধুলো। প্রেমলানী সাহেবের কারখানায় যারা কাজ করে তারা নাকে কাপড় বেঁধে রাখে। ফারনেস্ জ্বলে হু হু করে। কাঠ চেরাই হয় ইলেকট্রিক করাতে। লোহা গরম করে পেটাই হয়। সেই শব্দ সমস্ত কলোনীর লোকের কানে তালা লাগিয়ে দেয়।

সকাল আটটায় জেনকিন্স্ সাহেবের অফিস খোলে।

তখন বাবুরা ওই কয়লার গুঁড়ো ছড়ানো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জেন-কিন্স্ সাহেবের অফিসে গিয়ে ঢোকে। বারোটার সময় খেতে আসে সবাই। তারপর আবার দেড়টার সময় অফিস। খড়ের চালের ভিতর জেনকিন্স্ সাহেব ঘেরা-ঘরের মধ্যে কাজ করে। আর চারপাশের মস্ত ঘরটায় বাবুরা বসে। মুখুজ্জে মশাই লম্বা টেবিলের উপর কাগজ পেতে স্কেল পেন্সিল নিয়ে ড্রাফট্সম্যানের কাজ করেন—আর মাঝে মাঝে পকেট থেকে ডিবে বার করে পান খান।

কাজ করতে করতে নটু ঘোষ বলে, ও মুখুজ্জে মশাই, পান কই?

মুখুজ্জে মশাই বলেন, পকেট থেকে তুলে নিন দাদা, হাত জোড়া—

—মুখুজ্জেগিন্নীর হাতে মধু আছে দাদা, এমন পান—বলে নটু ঘোষ দুটো পান তুলে নিয়ে আবার ডিবেটা পকেটে পুরে দেয়।

খেতে বসে প্রেমলানী সাহেব বউকে জিজ্ঞেস করেন, এ বাঙালী ভাজি কে দিলে—

প্রেমলানী সাহেবের বউ বলে, ওই মুখার্জিবাবুর বহু—

আলু আসুক, পেঁয়াজ আসুক, কপি কড়াইশুটি যা-ই আসুক কাট্নি থেকে, মুখুজ্জেগিন্নী নানারকম তরকারি রান্না করে আজ এর বাড়ি কাল ওর বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। সামান্য নিরিমিষ তরকারি তাই-ই এমন চমৎকার রাঁধে, সবাই বাহবা দেয়। এমন রান্না কেউ কোনও বাড়ির বউ রাঁধতে পারে না। ছেলেপুলে হয় নি। বাঁজা মেয়েমানুষ। ওই স্বামীটি আর নিজে।

মুখুজ্জেগিন্নী বলত, সারাদিন কি করি দিদি, কাজ তো আর নেই, তাই বসে

BanglaBook.org

বসে রাঁধি—

গিন্নীরা বলত, তোমার রান্না খেয়ে তো কর্তাদের জিভ বদলে গেছে ভাই। মুস্কিল হয়েছে, আর বাড়ির রান্না পছন্দ হয় না—

মুখুজ্জেগিন্নী হাসত। বলত, তা কর্তা বদলাবার উপায় তো আর নেই দিদি, থাকলে না-হয় চেষ্টা করে দেখতাম—

অম্বিকা মজুমদার অনুপপুরের স্টেশন মাস্টার। নিজে কলোনীর লোক না হলেও কলোনীর লোকের সঙ্গে খুব ভাব। হাসপাতালের লাগোয়া খেলার মাঠে টেনিস খেলতে আসেন। ডাক্তারবাবু, প্রেমলানী সাহেব, নটু ঘোষ, হুকুম সিং সবাই খেলে। কলোনীর তাসের আড্ডায় রাত বারোটা পর্যন্ত তাস খেলে সেই এক মাইল রাস্তা হেঁটে আবার স্টেশনের কোয়ার্টারে ফিরে যান। তাঁর ছেলের অন্নপ্রাশনে সকলের নিমন্ত্রণ হল। কাট্‌নি থেকে ফুলকপি আর কড়াইশুঁটি এনে দিয়েছিলেন মুখুজ্জে মশাই। বলতে গেলে বাজারটা তিনিই করে দিয়েছিলেন। অন্তত তিনশো টাকার বাজার দুশো টাকার মধ্যে করে দিয়েছিলেন। জেনকিন্‌স্‌ সাহেবও এসেছিলেন খেতে। চপ্‌, কাটলেট, পাঁটার মাংসের কালিয়া। তারপর দই রসগোল্লা—

জেনকিন্‌স্‌ সাহেব কাটলেট খেয়ে বললেন, বাঃ, ভেরি গুড কাটলেট, আট-বছর এরকম খাই নি. কে রেঁধেছে?

মজুমদারবাবু বললেন, মিসেস মুখার্জি।

সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, মিসেস মুখার্জি কে?

—আমাদের ড্রাফট্‌সম্যান মিস্টার মুখার্জির ওয়াইফ—

সাহেব বললেন, আই সী, মাই কন্‌গ্র্যাচুলেশনস্‌ টু হার—

মজুমদারবাবু ভিতরে গিয়ে বললেন। মুখুজ্জেগিন্নী সোজা বাইরে চলে এল। একেবারে সাহেবের সামনে এসে নমস্কার করলে। কোনও আড়স্টতা নেই। বেশ স্বচ্ছন্দ ভাব। একটা শান্তিপুরে ডুরে-শাড়ি দিয়ে সমস্ত শরীরটাকে ঢেকে নিয়েছে। মুখে একটু সলাজ হাসি। কপালের সামনে একটা গোল টিপ্‌।

সাহেব হেসে দাঁড়িয়ে উঠলেন, আপ্‌ কী কাটলেট বহুত্‌ আচ্ছা হুয়া—

বলেই সাহেব হেসে বললেন। সবাই-ই হাসল। সাহেবের হিন্দী বলা কেউ শোনে নি।

মুখুজ্জেগিন্নী খাওয়ার পর একটা পান এনে দিলে।

বললে, এটা খান সাহেব, এটাও আমাদের হাতের তৈরি।

নটু ঘোষের স্ত্রী বললে, তোমার সাহস বলিহারি ভাই, ওই লাল-মুখো সাহেবের সামনে গেলে কী করে? আমাদের তো ভয় করে দেখলেই!

তারপর বাবুরা খেতে বসল। প্রেমলানী সাহেব মুখে দিয়েই বাহবা বাহবা করে উঠলেন। বললেন, মিসেস মুখার্জি খুব ভালো কুক আছেন—

নটু ঘোষকেও বলতে হল—না মুখুজ্জে মশাই, মুখুজ্জেগিন্নীর বাহাদুরি আছে—

মজুমদারবাবু বললেন, আমি তো চপ্‌ কাটলেট করতেই চাই নি প্রথমে, ও-সব আমাদের বাড়ির কেই বা করতে জানে, আর সে-সব কারিগরই বা এখানে কোথায়—তা মুখুজ্জেগিন্নী নিজে থেকেই বললেন, ভাল মাংস এনে দেবেন'খন. আমি চপ কাটলেট করে দেব—

বহুদিন বন জঙ্গলের মধ্যে বাস করে করে শহরের কথা সবাই-ই ভুলে গেছে। জেনকিন্‌স্‌ সাহেব খাস বিলেত থেকে এই ইঞ্জিনীয়রের চাকরি নিয়ে এখানে

BanglaBook.org

এই বন-জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছে। রেফ্রিজারেটর, বরফ, ফ্যান্, লাইট, টেলিফোন, রেডিয়োর দেশ থেকে একেবারে সি-পির জঙ্গলে। না পাওয়া যায় মাটন্, না পাওয়া যায় আইসক্রীম। সন্ধ্যা হতে-না-হতে ভন্ ভন্ করে মশা। তারপর সাপ, কেঁচো, মাকড়সা, কেন্নো, পিঁপড়ে, উইপোকা, সবই আছে। সাহেব গরমের চোখে গায়ের জামা খুলে ফেলে এক-এক সময়ে। হাত দিয়ে চুলকোয় খ্যাশ্ খ্যাশ্ করে। রদ্দুরে মাথার টাক জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যায়।

প্রেমলানী সাহেবও শহরের লোক। সিন্ধের হায়দ্রাবাদে বাড়ি। করাচীতে কোন্ চাকরি করত একটা। সে অফিস বুঝি উঠে যায় হঠাৎ। তারপর খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এইখানে চাকরির দরখাস্ত করেছিলেন।

নটু ঘোষ বাঙলা দেশে চাকরি খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুতেই চাকরি পান না। অনেকদিন বাড়ির অন্ন ধ্বংস করতে হয়েছিল বসে বসে। শেষে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এই চাকরির জন্যে দরখাস্ত করে চাকরিটা পান।

এমনি সকলেই।

সাধ করে কেউ এখানে আসে নি। স্টোর্সের বড়বাবু কলকাতায় পঞ্চান্ন বছর চাকরি করে রিটায়ার করেছিলেন। বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে শেষ-জীবনটা কাটাতে পারতেন। সাত্ত্বিক মানুষ। স্বপাক আহার করেন। কারও হাতের ছোঁয়া খান না। বিয়ে থা করেন নি। বেশ ছিলেন। সুদের সামান্য টাকা দিয়ে নিজের জীবনটা চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ ব্যাঙ্কটা ফেল মারল।

বলেন, আমি জীবনে কাউকে ঠকাই নি নটবাবু—সেই আমিই শেষকালে কিনা ঠকলুম—

নটু ঘোষ বললেন, ভগবানের মার আইনের বার—কথাতেই আছে যে ভূধরবাবু!

ভূধরবাবু পান খান না, নস্যি নেন না। সিনেমা দেখার বাতিক নেই। বিয়ে করেন নি সুতরাং সে বালাইও নেই। শুধু ধর্ম-কর্ম করার একটু অসুবিধে হয়।

বলেন, কী দেশে যে এলুম, না-আছে একটা ঠাকুর দেবতা না আছে একটা মন্দির—

বরাবর তাঁর গঙ্গাস্নান করা অভ্যাস। বাড়ির কাছে গঙ্গা ছিল। সেখানে ঘাটে বসে আহ্নিক করতেন। নিজের কোষাকুষি আসন সব নিয়ে যেতেন। আর সমস্ত ঘাটটা ঝাঁটা দিয়ে ধুতেন নিজের হাতে। সাহেব কোম্পানির চাকরি। কাপড়ের নিচে সার্টটা ঢুকিয়ে দিয়ে উপরে কোট চড়াতেন। সাহেবদের মহলে সৎ বলে সুনাম ছিল।

ছোট অফিস। ভূধরবাবু ছিলেন সব। ভেবেছিলেন শেষ জীবনটা এক রকম কেটে যাবে তাঁর। তারপর হঠাৎ ব্যাঙ্কটি ফেল হয়ে গেল। ভেবেছিলেন টাকাগুলো কোনও আশ্রমে দিয়ে শেষ জীবনটা ধর্মে কর্মে কাটাবেন। ধর্মই ছিল তার আসল নেশা।

বলতেন, চাকরি করি সাহেবের কাছে, তাই ওদের গুডমর্নিং বলতে হয়, কিন্তু ও-বেটারা কি মানুষ!

নটু ঘোষ বলতেন, তা মানুষ নয় তো কী! দেখছেন তো সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এদেশে এসেছে আমাদের মাথার ওপর বসে রাজত্ব করছে কী করে শুনি?

ভূধরবাবু বলতেন, ম্লেচ্ছ সব, জাত-ধর্ম যাদের নেই তারা আবার মানুষ! আমি তো রোজ অফিস থেকে এসে চান করে ফেলতুম মশাই—

—বলেন কী?

BanglaBook.org

ভূধরবাবু বলতেন, এখনও চান করে ফেলি। এই যে অফিসে কাজ করছি, এখান থেকে গিয়েই এই জামা-কাপড় ছেড়ে গামছা পরব, পরে নিজের হাতে সব জলকাচা করে ফেলব—

অম্বিকাবাবুর বাড়িতে তাঁরও নিমন্ত্রণ ছিল।

ভূধরবাবু বললেন, আমাকে মাপ করবেন মশাই, আমি স্বপাক ছাড়া আহার করি না—

মজুমদারবাবু বললেন, আমার বাড়িতে রান্না-বান্না সবই মখুজ্জেগিন্নী করবেন, ব্রাহ্মণ ছাড়া আমি অন্য কাউকে ছুঁতেই দেব না। পরিবেষণও করবেন তাঁরাই—

তবু ভূধরবাবু যান নি খেতে।

নটু ঘোষ বললেন, আপনি কাল গেলেন না, আঃ কী কাটলেটই করেছিলেন মুখুজ্জেগিন্নী কী বলব বড়বাবু, জেনকিন্‌স্‌ সাহেব খেয়ে একেবারে—

ভূধরবাবু বললেন, ও-সব তামসিক আহার, ওতে কেবল মনের জড়তা বাড়ে বই তো নয়!

নটু ঘোষ বললেন, জড়তা বাড়ুক আর যা-ই হক মশাই, অনেকদিন পরে খেয়ে একটু বাঁচলুম, এমন কাটলেট কলকাতাতেও খাই নি—

সেই কবে ভূধরবাবু চাকরির একটা দরখাস্ত করেছিলেন! তখন ভাবেন নি যে এইরকম দেশ। এসে তাজ্জব হয়ে গেছেন। নদীতে যান বটে চান করতে, কিন্তু এতটুকু জল। তাতে না ভেজে কাপড়, না ভেজে মাথা। সেই এক-পা জলে দাঁড়িয়েই একটু নমঃ নমঃ করেই ইষ্টমন্ত্রটা জপ করে নেন। মন প্রসন্ন হয় না। অনুপপুরে কাটিয়ে দিলেন ক'টা বছর, তার মধ্যে একটা দিনও জপ আহ্নিক করে তৃপ্তি পান না। হাটবারে মুখুজ্জে মশাই এসে জিজ্ঞেস করেন—কিছু আনতে হবে বড়বাবু, কাট্‌নি যাচ্ছি—

ভূধরবাবু বলেন, আলুটা ফুরিয়ে গিয়েছিল, আনলে হত—

মুখুজ্জে মশাই বললেন, তা দিন না আমি তো যাচ্ছিই, একসঙ্গে এনে দেব—জেনকিন্‌স্‌ সাহেবের জন্যে মুরগীর ডিমও আনব দু-ডজন—

ভূধরবাবু আঁতকে উঠলেন।

—তবে থাক মুখুজ্জে মশাই, ওই মুরগীর ডিমের ছোঁয়া জিনিস আমার দরকার নেই— আমি না-খেয়ে উপোষ করব, মরব, তবু আপনার মত জাত দিতে পারব না। চাকরি করতে এসেছি বলে জাত খোয়াতে পারব না—

তা মুখুজ্জে মশাইয়ের তাতে বিশেষ রাগ-বিরাগ ছিল না। মুখুজ্জে মশাই হাসতেন। বাজারের থলিটা নিয়ে যেতেন প্রেমলানী সাহেবের বাড়ি।

—কিছু আনতে হবে নাকি সাহেব।

—তুমি যাচ্ছ মিস্টার মুখার্জি, আমার কিছু গম ভাঙিয়ে আনতে হবে, পারবে?

মুখুজ্জে মশাই বলতেন, পারব না কেন? আমি তো সকলের জিনিসই আনছি। জেনকিন্‌স্‌ সাহেব, এই ঘোষ বাবু, সকলেই আনতে দিয়েছে—ডাক্তারবাবুর বিশ সের আলু আনব আর আপনার গমটা ভাঙিয়ে আনতে পারব না!

প্রথম-প্রথম অনুপপুরে কিছু ছিল না। ডাক্তারবাবুই ওখানকার প্রথম লোক। তখন এ-সব ঘর-বাড়ি কিছুই হয় নি। প্রথমে তাঁবুতে থাকতে হত। ইস্টিশানের ধারে ধারে তাঁবু সাজানো ছিল সার সার। তখন প্রেমলানী সাহেবও আসে নি, নটু ঘোষও না। দেড়শো কেরানীর কেউই আসে নি। অফিসের কেউই আসে নি

BanglaBook.org

এক ডাক্তারবাবু আর জেনকিন্‌স্‌ সাহেব ছাড়া। ওষুধ এল খড়্গপুর থেকে দু বাক্স ভর্তি। সেই দু বাক্স ওষুধের উপর নির্ভর। অবশ্য হুকুম সিং আগেই এসেছে। নদীর ওপারে দোতালা বাড়িতে নিজের থাকবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কাঠের দোতলা আর টিনের চাল। আর কুলি মজুররা এসেছে। কুলী-মজুররা বন-জঙ্গল পরিষ্কার করেছে। ঘর-বাড়ি করেছে। রাস্তা করেছে। হাসপাতাল করেছে। তারপর একে একে অফিস চালু হয়েছে। হুকুম সিং-এর তিনজন কুলীকে সাপে কামড়েছিল। ক্রেট সাপ।

হুকুম সিং বলত, কী জঙ্গল ছিল এখানে—বাঘ আসত রাত্তির বেলা—

হুকুম সিং বাঘও মেরেছিল দুটো। বাঘ নদীর বরাবর জল খেতে আসত রাত্তির বেলা। নিজের বাড়ির দোতলা থেকে রাইফেল দিয়ে দুটো বাঘ দুদিন মেরেছিল। তখন আমরা আসি নি। জেনকিন্‌স্‌ সাহেবও আসেন নি।

তা কন্‌স্ট্রাকশনের চাকরিতে এ-সব ভয় করলে চলবে না।

নতুন লাইন পাতা হচ্ছে। অনুপপুর থেকে এক জোড়া রেল-লাইন সোজা উত্তর দিকে চলে গেছে। অনুপপুরের পর দুর্বাসীন। তারপর ইস্টিশানের নাম হবে বিজুরি। তারপর মনেন্দ্রগড়। তারপর শেষ স্টেশনের নাম হবে চিরিমিরি। বড় বড় শাল গাছ। দু হাত বাড়িয়ে বেড় দিয়ে ধরা যায় না। শাল আর মহুয়া। গাছগুলো সব মাথা ছাড়িয়ে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। ওপর দিকে চোখ তুললে আকাশই দেখা যায় না জায়গায় জায়গায়। কুলীরা কাজ শেষ করে রাত্রে ছাউনীতে এসে শোয়। মাঝরাত্রে বাঘ আর ভাল্লুক এসে ঘোরাঘুরি করে ছাউনির চারপাশে। থাবার দাগ দেখা যায় সকালবেলা।

বিজুরি থেকে 'তার' আসে 'ডাক' আসে। নেই, 'ডাক' খোলে ডেস্‌প্যাচ বাবু।

ডেস্‌প্যাচ বাবু মধুসূদন হাজরা। 'ডাক' খুলেই বলে, ওহে, আজ তিন-জনকেই বাঘে নিয়েছে, জানলে হে—

ভূধরবাবু বলেন, আমাদেরও কোন্‌দিন নেবে—

নটু ঘোষ বলেন, অনুপপুরে বাঘ আসতে পারবে না। এত বন্দুক, আলো—বাঘের বুঝি ভয় নেই ভেবেছেন?

মুখুজ্জে মশাই কোনও কথাতেই কথা বলেন না। একমনে লম্বা উঁচু টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সেট্‌স্কোয়ার আর স্কেল দিয়ে কাগজের উপর পেন্সিলের দাগ টেনে যান। আর মাঝে মাঝে পকেট থেকে ডিবে বার করে পান খান।

নটু ঘোষ বলেন, দাও হে মুখুজ্জে তোমার পান দাও একটা, হিসেবটা মিলতে চাইছে না মোটে—

মনে আছে মুখুজ্জে মশাইকে আমি প্রথমে দেখি নি। টেনিস খেলতে আসত যারা তাদেরই ভালো করে চিনতাম। স্টেসন মাস্টার অম্বিকাবাবু ধুতি পরে খেলতেন। হুকুম সিং চোস্ত পায়জামা পরত। ফোরম্যান প্রেমলানী সাহেব তো পাকা সাহেব। আর জেনকিন্‌স্‌ সাহেব পরত হাফ প্যান্ট। আর চিনতাম ওভার-শিয়ার নগেন সরকারকে। নগেন সরকারের বিয়ে হয় নি। ভদ্রলোক ওভারশিয়ার মানুষ। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করত। সন্ধ্যাবেলা সেই বন-জঙ্গলের মধ্যে যখন সব চুপ-চাপ, যখন কারখানার করাত-চলার ঘড়-ঘড় শব্দও বন্ধ হয়ে গেছে, হুকুম সিংএর কুলীদের ডিনামাইট ফাটানোর শব্দও বন্ধ হয়ে গেছে, তখন দূর থেকে ওভারশিয়ারের ঘর থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসত।

বর্ষাকালের আকাশ তখন কালো মেঘে জমাট বেঁধে আছে। এক হাত দূরের লোককে দেখা যায় না, তখন নগেন সরকার গাইছে—

BanglaBook.org

নীল আকাশের অসীম ছেয়ে
ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো—

নগেন সরকার বলিষ্ঠ লোক। হাতের পায়ের বুকের মাস্‌ল ছিল মজবুত। লোহা পিটনো শরীর। হাফ প্যাণ্ট পরে কারখানার কাজ দেখত। ভারি কড়া ওভারশিয়ার। ফোরম্যান প্রেমলানী সাহেবের খুব প্রিয় লোক। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করাত।

নটু ঘোষ বলতেন, কাল অনেক রাত পর্যন্ত গান গাইছিলেন যে সরকার মশাই—

নগেন সরকার বলত, তা কী করব বলুন, আপনারা তো সবাই বউ নিয়ে বেশ লেপ চাপা দিয়ে ঘুমোবেন, আমি কী করি বলুন?

—তা বিয়ে করতে বারণ করেছে কে আপনাকে? বিয়ে করলেই হয়!

নগেন সরকার হাসত। বলত, আপনি একটা পাত্রী ঠিক করে দিন না, আমি বিয়ে করছি—

মুখুজ্জেগিন্নী বলত, তা পাত্রী ঠিক করব একটা তোমার জন্যে ভাই?

—করুন না, মুখুজ্জেগিন্নী, কিন্তু আপনার মত দেখতে হওয়া চাই—

মুখুজ্জেগিন্নী হাসত।

বলত, বল গে যাও তোমার মুখুজ্জে মশাইকে, তাঁর তো মনই পাই না—

নগেন সরকার বলত, আপনাকে যার পছন্দ হয় না তার কপালে ধিক্ মুখুজ্জেগিন্নী!

—তোমার মুখে ফুল-চন্নন পড়ুক ভাই।

মুখুজ্জেগিন্নী হেসে গড়িয়ে পড়ত। কাঁধের আঁচলটা ভালো করে সরিয়ে দিয়ে বলত, এখন তো বলছ খুব, শেষে মুখুজ্জে মশাইয়ের মত একঘেয়ে লেগে যাবে—দেখবে।

নগেন সরকার বলত, তা পরীক্ষা করেই দেখুন না মুখুজ্জেগিন্নী—

—আর হয় না ভাই! মুখুজ্জে মশাইয়ের কষ্ট হবে।

—ও, তাই বলুন, আপনিই ছাড়তে পারবেন না, তাই বলুন—

মুখুজ্জেগিন্নীও হাসত।

সামনে দাঁড়িয়ে নগেন সরকারও হাসত খুব হো হো করে।

মুখুজ্জে মশাইকে আমি প্রথম দেখি আমাদের বাড়িতেই। ছুটিতে দাদার কাছে গেছি। বেড়াতে।

বাইরে থেকে ডাক শুনতেই বেরিয়ে এলাম—ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু—

দেখি হাতে অনেকগুলো থলি। টিনের খালি বাক্স। জুতো-পরা, মাথার চুলটায় টেড়ি কাটা। পান খাচ্ছেন মুখ ভর্তি করে।

আমাকে দেখেই কেমন থমকে দাঁড়ালেন।

বললেন, কে তুমি?

বললাম, আমি ডাক্তারবাবুর ভাই, ছুটিতে বেড়াতে এসেছি—

—ও, তা বেশ বেশ! কী কর? নাম কী?

বললাম সব।

আবার বললেন, বেশ বেশ! জায়গাটা ভালো খুব। দেখবে খুব মোটা হয়ে যাবে দু দিনেই, আমি এই এমনি রোগা ছিলাম জান—

বলে হাতের ছাতাটা উঁচু করে দেখিয়ে দিলেন। দেখিয়েই হেসে ফেললেন।

আমিও হাসলাম। বললাম, আপনি এখানে কাজ করেন বুঝি?

BanglaBook.org

—হ্যাঁ, ড্রাফট্‌সম্যানের চাকরি করি। দু'শ টাকায় আমার সব খরচা চলেও একশো স'য়াশো টাকা বেঁচে যায় ভায়া—

আমি কী বলব!

মুখুজ্জে মশাই বলতে লাগলেন, কিন্তু কলকাতাতে? তিনশো টাকাতেও সংসার চালাতে নাকে দড়ি লাগাতে হত—কী বল, ঠিক বলি নি?

তারপর মুখ নিচু করে বললেন, তা এখানে খরচ তো কিছু নেই?

কেন? খরচ নেই কেন?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, আরে খরচ করব কী করে? পাওয়া যায় নাকি কিছু? আর সংসারে তো দুটি প্রাণী আমরা, আমি আর গিন্নী—

তারপর বলতে লাগলেন—এই কাট্‌নিতে যাচ্ছি, একেবারে এক হপ্তার আলু বেগুন নিয়ে আসব, আর খরচ যা কিছু সবতো মাছে। ওই মাগুরমাছ কিনে জীইয়ে রেখে দিই—কত খাবে খাও না—

এমন সময় দাদা এল।

—এই যে ডাক্তারবাবু, আপনার কী আনতে হবে বলুন।

দাদা বললে, পাঁউরুটি আনতে পারবেন মুখুজ্জে মশাই?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, আপনি হাসালেন, জেনকিন্‌স্‌ সাহেবের ডিম আনছি, প্রেমলানী সাহেবের গম ভাঙিয়ে আনছি বিশ সের, নটু ঘোষের গিন্নীর শাড়ি, মজুমদারবাবুর ছেলের জুতো—

দাদা হেসে ফেললে। বললে, আর বলতে হবে না মুখুজ্জে মশাই—

কাজটা মুখুজ্জে মশাই নিজেই একদিন যেচে নিয়েছিলেন। কোম্পানী থেকে রেলের পাশ দিত একটা বাজার করবার জন্যে। কিন্তু কে যায়? বিশ্বাসী লোক পাওয়া দুষ্কর। শেষে মুখুজ্জে মশাই নিজেই বললেন—আমি যেতে পারি, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে—

সেই থেকেই শুরু হয়েছিল।

মুখুজ্জেগিন্নীকে জিজ্ঞেস করলে বলত, আসলে তা নয়, উনি একটু ভাল-মন্দ খেতে ভালবাসেন—

বলতাম, আপনি যেমন রাঁধেন, ও-রকম রান্না পেলে সবাই-ই ভাল-মন্দ খেতে ভালবাসবে—

মুখুজ্জেগিন্নী বলত, রান্না করার মধ্যে আর কী বাহাদুরি আছে—

নটু ঘোষের বউ বলত, তোমার কাছে শুকতুনি রান্না করতে শিখতে যাব ভাই একদিন—

মুখুজ্জেগিন্নী বলত, ওমা, আপনাকে আমি আবার রান্না শেখাব কি দিদি?

—না ভাই, সেদিন তোমার রান্না খেয়ে ওঁর কী সুখ্যাতি—

—ওমা, কবে?

—ওই যে সেদিন তুমি শুক্‌তুনি করে পাঠিয়েছিলে না, সে-খেয়ে উনি ভুলতে পারছেন না একেবারে, রোজ বলেন ওইরকম শুক্‌তুনি করতে।

মুখুজ্জেগিন্নীর সংসারের বিশেষ কাজ আর কী! মুখুজ্জে মশাই অফিস চলে গেলেই সব শেষ। তিনি খেতে আসেন দুপুরবেলা।

মুখুজ্জে মশাই খেতে খেতে বলেন, হ্যাঁ গো নটু ঘোষ বলছিল, তুমি নাকি তরকারি পাঠিয়ে দিয়েছিলে ওদের বাড়িতে—

মুখুজ্জেগিন্নী বলে, কিছু বলছিল বুঝি? সেদিন বেশি হয়েছিল তাই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম—

BanglaBook.org

মুখুজ্জে মশাই বললেন, সেইরকম মাংসের কাটলেট কর না গো একদিন, সবাই তোমার মাংসের কাটলেট খেয়ে সুখ্যাতি করছিল—

বাড়িগুলো সকলেরই ছোট। অন্তত একই মাপের। অনুপপুর থেকে ট্রেন-গুলো যখন বিলাসপুরের দিকে যায়, ছোট ছোট চালাগুলো দেখতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট বাড়ি বটে, কিন্তু বেশ সাজানো। হুকুম সিং কন্ট্রাক্টার বেশ ফিতে মেপে সাইজ করে বাড়িগুলো তৈরি করে দিয়েছে। জল আনতে হয় নদী থেকে ভারী করে। চার-ভারী জল চার পয়সা। প্রেমলানী সাহেবের বউ বাগান করেছিল বাড়ির সামনে। ফোরম্যান সাহেবের পয়সা বেশি। নানারকম গাছপালা করেছিল। বড় বড় গোলাপ ফুটিয়েছিল বাগানে। সেই ফুল মাঝে মাঝে জেনকিন্‌স্‌ সাহেবকে পাঠিয়ে দিত।

সাহেব সেই ফুল টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখত।

কিন্তু সেদিন লাল বড় বড় ফুল সাজানো দেখে সাহেব বললে, কোন্‌ দিয়া?

এত বড় ফুল তো কোনদিন আসে নি। বড় বড় পাপড়ি। পাপড়িগুলো ফেটে ফেটে যেন ভেঙে পড়ছে।

—কোন্‌ দিয়া বয়?

বয় বললে, হুজুর ড্রাফট্‌সম্যানবাবুকা আওরাৎ!

তা মুখুজ্জেগিন্নীর সাহসও কম নয়। জেনকিন্‌স্‌ সাহেব রোজ বিকেল-বেলা বেড়াতে বেরত। এত হাতে ছড়ি, আর এক হাতে চেনে বাঁধা কুকুর। কুকুরটা ভারি শয়তান।

মুখুজ্জেগিন্নী তখন ঘোষগিন্নীর সঙ্গে গল্প করে ফিরছিল। রাস্তার মাঝা-মাঝি আসতেই সামনে সাহেবের সঙ্গে মুখোমুখি। সাহেব চলেই যাচ্ছিল শিস্‌ দিতে দিতে—

মুখুজ্জেগিন্নী দাঁড়িয়ে পড়ল।

হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে বললে, নমস্কার সাহেব—

সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কে?

মুখুজ্জেগিন্নী হাসতে লাগল। বললে, আমায় চিনতে পারছ না সাহেব, সেই কাটলেট খাইয়েছিলুম?

সাহেব কাটলেটের কথায় চিনতে পারলে।

বললে, তুমিই ফুল দিয়েছিলে কাল?

—হ্যাঁ সাহেব, কেমন ফুল বল?

—ভেরি গুড্‌, ভেরি বিগ্‌ সাইজ, তোমার ফুল আমার খুব পছন্দ—

বলে যে-সাহেব কখনও হাসে না সেই সাহেবই খুব হাসতে লাগল। আরও কাছে সরে আসছিল বুঝি হ্যান্ড্‌ শেক করতে।

মুখুজ্জেগিন্নী দু পা সরে এল। হাসতে হাসতে বললে, আসি সাহেব, নমস্কার—

সাহেবও দু হাত উঁচু করে নমস্কার করলে।

সেদিন প্রেমলানী সাহেব বউয়ের কাছে সেই গল্প করতে করতে মুখুজ্জেগিন্নী হেসে গড়িয়ে পড়ল।

বললে, কী জ্বালা দিদি, সাহেব আবার হাত বাড়িয়ে দেয়—আমি আবার বাড়ি এসে কাপড় কেচে ফেলে তবে বাঁচি—

BanglaBook.org

—কেন, কাপড় কাচলে কেন বহিন?

কাচব না? ওদের কি জাত জন্ম আছে? গরু খায়, শুয়োর খায় বেটারা।

সেদিন ভূধরবাবুও অবাক হয়ে গেলেন।

মুখুজ্জে মশাই এসে বললেন, সত্যনারায়ণের সিন্নী হবে, যাবেন কিন্তু বড়বাবু—

—সত্যনারায়ণের সিন্নী? বলেন কি? আপনার বাড়িতে?

হ্যাঁ, হয় তো প্রত্যেকবার, তা বলতে পারি নে সকলকে কি না।

ভূধরবাবু আরও অবাক হয়ে গেলেন।

—প্রত্যেকবারই করেন? পুরুত পান কোথায়?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, কাট্‌নি থেকে আনি।

—কাট্‌নি থেকে পুরুত আনেন?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, তা আনতে হয় বইকি! এখানে তো আর ও-সব পাওয়া যায় না।

ভূধরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তা খরচ তো অনেক পড়ে আপনার? কত খরচ পড়ে?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, পুরুতকে দক্ষিণে দিই সোয়া পাঁচ টাকা—

—সোয়া পাঁচ টাকা?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, সোয়া পাঁচ টাকা না দিলে আসবে কেন কাট্‌নি থেকে। এখানে এলে দুটো দিন তো নষ্ট? তারপর এখানে থাকা খাওয়া আছে, নৈবিদ্যি আছে—

কাট্‌নি থেকে পুরুত এনে সত্যনারায়ণের পুজো করা শুনে—ভূধরবাবু যে-ভূধরবাবু—তিনিও অবাক হয়ে গেলেন।

বললেন, তা আপনার গিন্নীর তো খুব ধর্মকর্মে মন আছে?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, বুঝতেই তো পারছেন, হিন্দু আমরা, ও-সব তো ছাড়তে পারি নে! আমার গিন্নী বলে—বিদেশে চাকরি করতে এসেছি বলে তো হিন্দুত্ব খোয়াই নি—

ভূধরবাবু বললেন, নিশ্চয়ই যাব মুখুজ্জে মশাই, এ-সব কাজে আমি আছি, আমিও তো তাই বলি। বিদেশে ম্লেচ্ছদের কাছে কাজ করতে এসেছি বলে কি একেবারে জাত দিয়ে দিয়েছি! বড় ভালো লাগল কথাগুলো! আজকালকার দিনে এমন মহিলাও যে আছেন এ-ও এক আশার কথা—

তা সিন্নীটাও খুব ভালো হয়েছিল খেতে।

আমি দেখেছি মুখুজ্জেগিন্নীর সিন্নী তৈরি।

সেদিন সকাল থেকে সারাদিনই মুখুজ্জেগিন্নীর উপোস। নদীতে ভোর বেলা চান করে এসেছে। তখন কোনও লোক ওঠে নি অনুপপুরে। রাত্রি তখন প্রায় চারটে।

নটু ঘোষের বউ শুনছিল। বললে, একলা তোমার অত রাত্তিরে ভয় করছিল না ভাই?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, ঠাকুরের নামে গেছি আর এসেছি—ভয় করবে কেন?

তারপর সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত সারাদিন উপোস করে পুজো করে প্রসাদ মুখে দিয়েছে।

নটু ঘোষ বললেন, তোমার গিন্নী তো খুব হে?

ভূধরবাবু বললেন, সব মেয়েরা যদি মুখুজ্জেগিন্নীর মত হত ভাবনা কিসের

BanglaBook.org

ভাই আমাদের দেশের।

ওভারশিয়ার নগেন সরকার ছিল। বললে, হারমোনিয়ামটা আনলে আমি একটা শ্যামাসঙ্গীত গাইতে পারতাম—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আমার হারমোনিয়াম আছে ঠাকুরপো, দেব?

—আপনার হারমোনিয়াম? আপনিও বুঝি গান গাইতে পারেন মুখুজ্জেগিন্নী?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, একটু একটু পারি ঠাকুরপো, তা সে তোমাদের শোনবার মত নয়—

নগেন সরকার চেপে ধরল।

বললে, তা হলে একটা গাইতে হবে মুখুজ্জেগিন্নী, সে বললে শুনছি না—

ভূধরবাবু কিছু বলছিলেন না। নটু ঘোষ বললেন, মুখুজ্জেগিন্নীর কি গানটানও আসে নাকি?

সবাই-ই অবাক হয়ে গেছে। এমন ধর্মশীলা মহিলা, এত ভক্তি, এমন চমৎকার রান্না করতে পারে, সে আবার গানও গাইতে পারে!

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, তুমি আগে গাও একটা, শুনি?

প্রেমলানী সাহেবের বউ, নটু ঘোষের স্ত্রী—তারাও অবাক হয়ে গেছে। বলে কী! গানও জানে নাকি! নটু ঘোষের স্ত্রী বললেন, তোমার ভাই অশেষ গুণ!

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, না দিদি, তেমন গান জানি না, ওই শুনে শুনে যেটুকু শিখেছি তাই আর কী—

হারমোনিয়াম বার করে দিলে মুখুজ্জেগিন্নী। অনেক দিন ব্যবহার হয় নি। বাক্সের ওপর ধুলো জমে আছে।

ওভারশিয়ার নগেন সরকার বললে, বাঃ, এ যে ডবল-রীডের হারমোনিয়াম দেখছি, আবার স্কেল চেঞ্জিং—অনেক দাম এর।

নটু ঘোষের স্ত্রী বললেন, তোমার কর্তার বুঝি গানের শখ আছে ভাই?

মুখুজ্জেগিন্নী হাসল।

বললে, না দিদি, ওঁর আবার গানের শখ! উনি কেবল খেতে জানেন আর বাজার করতে জানেন—

—তবে হারমোনিয়াম তুমি কিনেছিলে কেন?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, সে কি আজকে কিনেছি? সে কোন্ যুগে! বিয়ের আগে কিনেছিলাম, মা কিনে দিয়েছিল।

নগেন সরকার কী গাইলে কে জানে। কেউ বিশেষ শুনল না। নটু ঘোষ হাই তুলতে লাগলেন। প্রেমলানী সাহেব বাড়িতে ছেলেমেয়ে রেখে এসেছেন। তাঁরও যাবার তাড়া ছিল। ভূধরবাবুও যাই-যাই করছিলেন।

এক সময়ে নগেন সরকার থামাল।

তারপর হারমোনিয়ামটা মুখুজ্জেগিন্নীর দিকে ঠেলে দিয়ে বললে, এবার আপনি গান মুখুজ্জেগিন্নী—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আমি কী গাইব, সংসারে ঢুকে ও-সব পাট তো চুকে গিয়েছে অনেক দিন, ভুলেও গেছি কথাগুলো—

বলে হারমোনিয়ামটা নিয়ে প্যাঁ পোঁ করলে খানিকক্ষণ। পা দুটো একদিকে জড়ো করে বসে এক হাতে বেলো করতে করতে গান ধরল—

শ্যামা মা কি আমার কালো—

ভূধরবাবু খাড়া হয়ে বসলেন।

নটু ঘোষের এতক্ষণ ঘুম পাচ্ছিল। তিনিও সজাগ হয়ে উঠলেন।

BanglaBook.org

প্রেমলানী সাহেব সমানেই ঝুঁকে পড়ে চোখ বুজে মাথা নিচু করে রইলেন। চারদিকে সবাই নিস্তব্ধ। গানের সুরে যেন ভাবের জোয়ার লাগল সকলের মনে। আমি বসেছিলাম একেবারে মুখুজ্জেগিন্নীর সামনে। মুখুজ্জেগিন্নী ঠিক আমার মুখোমুখি বসে গাইছিল। মুখুজ্জেগিন্নীর কপালে একটা সিঁদুরের টিপ। চুল-গুলো এলো করে পিঠের উপর ছড়িয়ে দেওয়া সারাদিন তার উপোস গেছে। উপোসের পর তার মুখে কেমন যেন একটা করুণ প্রসন্নতা জড়িয়ে ছিল। তসরের লালপাড় শাড়িটা সারা শরীরটায় জড়ানো, মাথায় একটু স্বল্প ঘোমটা। মুখুজ্জে-গিন্নী গাইছিল—আর আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম।

সে যে কী গান!

ভূধরবাবু ভাবের ঝোঁকে গানের মধ্যেই যেন এক-একবার ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠছিলেন। প্রেমলানী সাহেব তখনও চোখ বুজে মাথা নিচু করে সামনের দিকে ঝুঁকে আছেন। নটু ঘোষ ভেবে যেন কোনও কিছুর কূল-কিনারা পাচ্ছিলেন না। তিনি অবাক হয়ে শুধু চেয়ে ছিলেন মুখুজ্জেগিন্নীর মুখের দিকে হাঁ করে। প্রেমলানী সাহেবের বউ নটু ঘোষের স্ত্রী—দুজনেরই মাথা থেকে ঘোমটা খসে গেছে। মনে আছে অনুপপুরের সেই কলোনীর চালা-ঘরের সিমেণ্ট বাঁধানো উঠোনে আমরা সব কটি প্রাণী যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম খানিকক্ষণের জন্যে।

কখন যে গান থেমে গেছে বুঝতে পারে নি কেউ।

নটু ঘোষ বললেন, বাঃ, চমৎকার—

প্রেমলানী সাহেব বলে উঠলেন, ওয়াণ্ডারফুল—মার্ভেলাস্—

নগেন সরকার বললে, মুখুজ্জেগিন্নী, আপনি এমন ভালো গাইতে পারেন আর আমাদের কিনা এতদিন বঞ্চিত রেখেছিলেন—ঈস্—

ভূধরবাবু এতক্ষণ কিছু বলেন নি।

এবার যেন তাঁর ঘুম ভাঙল। বললেন, মা—মা—

তারপর বললেন, সাক্ষাৎ ভগবৎ-কৃপা না থাকলে এমন কণ্ঠ কারও হয় না হে নগেন সরকার, ইনি সাক্ষাৎ মা আমাদের—

মুখুজ্জেগিন্নী লজ্জায় পড়ল।

বললে, কী যে বলেন আপনি বড়বাবু, ওসব বলে আমায় লজ্জা দেবেন না আপনি, মায়ের নাম করতে কি আর কণ্ঠ লাগে!

নটু ঘোষের বউ সামনে সরে এসে হাতটা জড়িয়ে ধরলেন মুখুজ্জেগিন্নীর।

বললেন, তোমার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছে ভাই—

মুখুজ্জেগিন্নী তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললে, ছি ছি, ও-কথা বললে আমার পাপ হয় দিদি—বলে নটু ঘোষের স্ত্রীর পায়ের ধুলো নিতে গেল।

ভূধরবাবুর বললেন, তোমার কুষ্ঠি আছে মুখুজ্জে মশাই?

মুখুজ্জে মশাই এতক্ষণ এক কোণে চুপ করে বসে ছিলেন। কোনও কথাতেই কান দিচ্ছিলেন না যেন।

বললেন, কুষ্ঠি তো আমার নেই বড়বাবু—

নটু ঘোষ লাফিয়ে উঠলেন।

বললেন, কেন কেন? আপনি কুষ্ঠি দেখতে জানেন নাকি বড়বাবু?

ভূধরবাবু বললেন, না, দেখতাম মুখুজ্জে মশাইয়ের জায়া-স্থানে কোন গ্রহ আছে, বৃহস্পতি স্বক্ষেত্রে না থাকলে কপালে এমন বউ পায় না কেউ—

সত্যিই মুখুজ্জে মশাইয়ের পত্নীভাগ্য ভালো। শুধু রাঁধতে পারে কিম্বা গান গাইতে পারে বলেই নয়, মুখুজ্জেগিন্নীর অনেক গুণ। গুণের যেন শেষ ছিল না

BanglaBook.org

মুখুজ্জেগিন্নীর। বাড়িতে গিয়ে দেখতাম মুখুজ্জে মশাই অফিস চলে যাবার পর মুখুজ্জেগিন্নী ঘর গুছচ্ছে। মুখুজ্জে মশাইয়ের জামা-কাপড় সব আলনায় সাজিয়ে রেখে ঘর-দোর ঝাঁট দিচ্ছে। অথচ সকালবেলাই ঝি এসে ঝাঁট দিয়ে গেছে।

বলতাম, এ কি মুখুজ্জেগিন্নী, নিজে ঝাঁটা দিচ্ছ যে?

মুখুজ্জেগিন্নী বলত, ঝি-র যেমন কাজের ছিরি, নিজে ঝাঁট না দিলে কি চলে? আমি নোংরা দেখতে পারি না মোটে—

অথচ নিজের বাড়ির কাজটুকু করলেই চলে না। খাওয়া-দাওয়ার পর যখন মুখুজ্জে মশাই অফিস চলে যেতেন, তখন এক ফাঁকে মুখুজ্জেগিন্নী বেরিয়ে পড়ত। ঝাঁ-ঝাঁ করছে রদ্দুর। সেই রদ্দুরের মধ্যেই মুখুজ্জেগিন্নী মাথায় আঁচলটা আড়াল দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। একেবারে প্রেমলানী সাহেবের অন্দরমহলে গিয়ে ডাকত, কই গো, সাহেব-বউ কোথায়?

প্রেমলানী সাহেবের বউ তখন হয়ত দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানার উপর ঘুমে নেতিয়ে পড়েছে। মোটা-সোটা মানুষ।

মুখুজ্জেগিন্নীর ডাকে উঠে পড়ে সাহেব-বউ।

মুখুজ্জেগিন্নী বলে, এই একটু ঘুম ভাঙাতে এলুম সাহেব-বউয়ের—

—এস বহিন, এস এস।

মুখুজ্জেগিন্নী বলল, এই এত ঘুমোও বলেই এত মোটা হয়ে যাচ্ছ তুমি দিদি, আর দুদিন বাদে প্রেমলানী সাহেব তোমায় জড়িয়ে ধরতে পারবে না।

সাহেব-বউ হাসতে লাগলেন। মুখুজ্জেগিন্নীও হাসতে লাগল খিল্‌খিল্‌ করে।

সাহেব-বউ বললেন, আর প্রেমলানী সাহেব এখন তো বুড়ো হয়ে গেছে বহিন।

মুখুজ্জেগিন্নী বলল, ওই বুড়ো বয়সেই তো রস বেশি সাহেব-বউ, এই বয়সেই তো দুধটি মরে ক্ষীরটি হয়। পিরীত জমে ভালো—

সাহেব-বউ বুঝতে পারে না। বাংলাই অতি কষ্টে বলে।

বললে, পিরীত কী?

মুখুজ্জেগিন্নী বলে, পিরীতের কথা তুমি বুঝবে না সাহেব-বউ, পিরীতি করম পিরীতি ধরম, পিরীতি জীবন-সার, বুঝলে কিছু?

—না বহিন, বুঝলাম না। আমাকে বাংলাটা শিখিয়ে দাও না, তোমায় কতদিন ধরে বলছি।

মুখুজ্জেগিন্নী হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে দেয়। বলে, সে পরে শেখাব, এখন তোমার কাছে অন্য কাজে এসেছি সাহেব-বউ, তোমার সাহেব কেমন আছে?

প্রেমলানী সাহেবের আবার কী হল? সাহেব-বউ ঠিক বুঝতে পারলে না।

—তুমি দেখছি ভাতারের কিছ্‌ছু খবর রাখ না সাহেব-বউ। শোন—

বলে আঁচলের গেরো খুলে কী-একটা শেকড় বার করে বললে, এই এইটে বেশ ভালো করে জলে ধুয়ে শিলে বেটে নিয়ে কাল সকালে সাহেবকে খাইয়ে দিও তো—সেদিন সাহেবের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। তোমার সাহেবের তো আবার লজ্জা খুব, আমাকে দেখে আবার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন।

বললাম, কেমন আছেন সাহেব?

তোমার সাহেব বললে, কোমরে ব্যথা বড়, কদিন ঘুম হচ্ছে না ভালো—

তা এই শেকড়টা খেলে ঘুম হবে ভালো, কোমরের ব্যথা সেরে যাবে।

তারপর সাহেব-বউয়ের কানের কাছে মুখ এনে বললে, কিন্তু একটা কথা আছে সাহেব-বউ, এই শিকড়টা যদ্দিন ধারণ করবে, তোমরা দু জনে এক বিছানায় শুতে

BanglaBook.org

পারবে না—কেমন, মনে থাকবে তো? মন কেমন করবে না তো?

সাহেব-বউ খিল্‌খিল্‌ করে হাসতে লাগল কথা শুনে। মুখুজ্জেগিন্নীও কথাটা বলে হেসে উঠল।

—যাই সাহেব-বউ, আমার আবার তাড়া আছে।

নটু ঘোষের বউ আবার পোয়াতি হয়েছে। মুখুজ্জেগিন্নী নটু ঘোষের বাড়ি হয়ে তারপর ফিরে যাবে।

নটু ঘোষের বাড়িতে তখন ঝি এসে গেছে। সদর-দরজা খোলা।

মুখুজ্জেগিন্নী ঢুকেই বললে, দিদি কোথায়?

ভিতর থেকে আওয়াজ এল, এই যে এস ভাই—এস—

নটু ঘোষের ছেলেমেয়ে অনেক। বড় মেয়েরই বয়স ষোল। তারপর তেরো, বারো এগারো। এমনি পর পর। এতদিন কলকাতাতে হয়েছে। কিছু ভয় ছিল না। এখানে এই বন-জঙ্গলের দেশে কোথায় দাই, কোথায় ডাক্তার, কোথায়ই বা ওষুধ। একটা নতুন ধরনের ওষুধ চাইলেই হেডঅফিসে লিখতে হয়। তিন মাস পরে তার উত্তর আসে, ওষুধ আসতে দেরি হয় আরও কিছু দিন। ততদিন রোগী মরে ভূত হয়ে যায়। প্রথম-প্রথম নাকি আরও মরত। হেডঅফিসে চিঠি লিখেও কিছু ফল হয়নি। ওষুধের জন্যে হাসপাতালের সামনে ভিড় হয়ে থাকত সকাল থেকে। শুধু কলোনীর লোক নয়, কোম্পানীর লোকই নয়, বাইরের লোকও আসত প্রচুর। গাঁয়ের চাষাভূষো তারা। দশ-মাইল বিশ-মাইল দূর থেকে তারা চাল-চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে আসত। আর রোগও কি সব একরকমের! বিশ্রী বিশ্রী রোগ। একবার গায়ে একটা ঘা হলে আর সারতে চাইত না।

জেনকিন্‌স্‌ সাহেব বিলিতী মানুষ। বউ আছে কি নেই তার ঠিক নেই। থাকলেও সাত সমুদ্র তের নদীর পারে পড়ে আছে। এখানে একলা-একলা আঙুল কামড়ে পড়ে থাকতে আসে নি। রাত্রে সাহেবের চাপরাশি গাঁয়ে চলে যায়। একজন-না-একজনকে তার ধরে আনা চাই।

তা জেনকিন্‌স্‌ সাহেব লোক ভালো। মাথা-পিছু রাত পিছু পাঁচ টাকা করে দেয়। তেমন খুশী করতে পারলে পাঁচ টাকা কেন, পনেরো টাকাও দিয়ে ফেলে কাউকে কাউকে।

তারপর যখন রোগ বাড়ে তখন ডাক্তারকে ডাকে।

বলে, ডাক্তার একটা ওষুধ দাও—পেন্‌ হচ্ছে আবার—

ওষুধে একটু কমে, কিন্তু দুদিন বাদে আবার বাড়ে।

ভূধরবাবু বলেন, ম্লেচ্ছ, ম্লেচ্ছ একেবারে, সাধ করে কি চান করে ফেলি রোজ—

নটু ঘোষ জিজ্ঞেস করেন, আর মাইনের টাকা?

ভূধরবাবু বলেন, এই তো যাচ্ছি মাইনে নিয়ে, এগুলো নিয়ে চৌবাচ্চার জলে ফেলে দেব—

তারপর বললেন, বাড়ির খবর কী ঘোষমশাই?

নটু ঘোষ বলেন, ও আর আমি ভাবছি না, ও মুখুজ্জেগিন্নী আছেন, তিনিই দেখছেন—

তা সত্যিই নটু ঘোষ মশাইকে ভাবতেই হল না শেষ পর্যন্ত। নটু ঘোষের বড় বড় মেয়েরা পর্যন্ত পারল না।

বড় মেয়ে শেফালী বললে, কাকীমা এবার আপনি বাড়ি যান, কাকাবাবু একলা আছেন—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, সে-সব তোমায় ভাবতে হবে না, তুমি এক কাজ কর

BanglaBook.org

দিকি, বলু টুলুকে চান করিয়ে দিয়ে ভাত খেয়ে নাও, আমার কাজ এগিয়ে থাক—

মুখুজ্জে মশাই সে কদিন রেঁধে খেয়ে কাটিয়ে দিলেন। আলুভাতে আর ভাত। বাড়ির একটা চাবি রইল মুখুজ্জে মশাইয়ের কাছে আর একটা মুখুজ্জে-গিন্নীর কাছে। সেই যে সোমবার রাত চারটেয় উঠে মুখুজ্জেগিন্নী গেল আর দেখা নেই। যাবার সময় শুধু বলে গিয়েছিল—ঘরদোর খুলে রেখে যেন চলে যেয়ো না—আমি চললুম—

তারপর সোজা নটু ঘোষের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে মুখুজ্জেগিন্নী। সাত ছেলে-মেয়ের মা বটে, কিন্তু বিদেশ-বিভুঁই-এ বড় ভয় পেয়েছিল নটু ঘোষের স্ত্রী। ডাক্তার আছে, কিন্তু ডাক্তারের উপর ভরসা কী! সেই ভয়েই বোধ হয় অর্ধেক শুকিয়ে গিয়েছিল।

নটু ঘোষের বউ বলেছিল, কী হবে ভাই? কে দেখবে?

মুখুজ্জেগিন্নী বলেছিল, চাকরটাকে দিয়ে একবার ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েই যেন আমাকে একটা খবর দেয়, আমি জানলার ধারে শুই, যত রাত্তিরই হক আমায় একবার ডাক দিলেই চলে আসব দিদি, তুমি কিচ্ছু ভয় পেয়ো না—

কলোনীর ব্যাপার। ঠিক লাগোয়া বাড়ি নয়। এখানে একটা, তারপর একটা খাদ পেরিয়ে আর একটা। এ-বাড়ির কথা ও-বাড়িতে শোনা যায় না। রাত্তিরবেলা সমস্ত কলোনীটা খাঁ খাঁ করে চারদিকে। সাপখোপ আছে, বাঘ আছে, ভালুক আছে। আরও কত কী আছে, কত কী থাকতে পারে। দুপুরবেলাটা বেশ। নদীর এপার থেকে ওপার দেখা যায়। কালো রুক্ষ মাটি। ফুটিফাটা হয়ে আছে। হুকুম সিংএর দোতলা কাঠের বাড়িটা ওপারে পাহাড়ের গায়ে যেন হেলান দিয়ে আছে। তারপর কেবল জঙ্গল, কেবল জঙ্গল। উত্তর দিকে নদীর ধার ঘেঁসে একটা পাহাড়। সকাল থেকেই সেই পাহাড়ে পাথর ভাঙার কাজ শুরু হয়। গর্ত খুঁড়ে কুলীরা তার মধ্যে ডিনামাইট পুঁতে দেয়। দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায় দূরে। তারপর দড়াম করে একটা বিকট শব্দ হয়। পাথর ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কলোনী থেকে সেই দৃশ্য দেখে নটু ঘোষের ছেলেমেয়েরা। কিন্তু রাতটাই ত ভয় করে বেশি। তখন বিলাসপুর থেকে একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছুটে আসে। ট্রেনটা রেলের পুলটার উপর উঠলেই কেমন একটা ভয়ানক গুম্ গুম্ শব্দ হয়। নটু ঘোষের বউ তখন ভয়ে আধমরা হয়ে যায় যেন।

ভোর বেলাই মুখুজ্জেগিন্নী গিয়ে হাজির হয়েছে।

নটু ঘোষ সামনে পায়চারি করছিল। বললে ভাঁড়ার ঘরের চাবিটা কোথায় দিন, আর ডাক্তার ডাকতে গেছে তো?

নটু ঘোষ বললেন, হ্যাঁ—

তারপর সেই যে মুখুজ্জেগিন্নী ঢুকলো ও-বাড়িতে, বেরল সেই তিন দিন পরে। দিন নেই রাত নেই পোয়াতীর কাছে বসে সেবা করা। আমরা দেখা যতবার গেছে, মুখুজ্জেগিন্নীর সেবা দেখে অবাক হয়ে গেছে। এবার ছেলে হয়েছিল একটা। কিন্তু মরা ছেলে! নটু ঘোষের বউ মরে যেত বোধ হয়। ব্যথাও খুব পেয়েছিল। চাপ চাপ রক্ত বেরিয়েছিল। আর রক্তও কি একটুখানি! সেই রক্ত পরিষ্কার করা, পোয়াতীকে খাওয়ানো, ছেলে-মেয়েদের দেখা।

নটু ঘোষ পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

বললেন, খুব করলে যা হক মুখুজ্জেগিন্নী!

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, কী আর করতে পারলাম দাদা, ছেলেটাকেই বাঁচাতে পারলাম না—

BanglaBook.org

নটু ঘোষ বললেন, তা আর কী হবে, মানুষটা যে বেঁচে উঠেছে, ওই-ই যথেষ্ট—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আপনি আজকে অফিস যান—

—আমি অফিসে গেলে, দেখবে কে?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আমি তো আছি, আমি দেখব—

নটু ঘোষ বললেন, মুখুজ্জে মশাইয়ের হয়ত খুব কষ্ট হচ্ছে একলা রেঁধে খেতে—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, তা হোক আপনি ওঁকে বলে দেবেন, আরও দু দিন আমি যেতে পারব না বাড়িতে, একটু চালিয়ে নেন যেন—

সাহেব-বউও এসে একদিন দেখে গেল। নটু ঘোষের বউ তখন সেরে উঠেছে।

নটু ঘোষের বউ বললে, মুখুজ্জেগিন্নীর জন্যেই আমি বেঁচে গেলাম ভাই এ-যাত্রা, নইলে আমার তো হয়েই গিয়েছিল—

রাস্তায় ওভারশিয়ার নগেন সরকারের সঙ্গে দেখা।

বললে, বলিহারি আপনাকে, মুখুজ্জেগিন্নী।

মুখুজ্জেগিন্নী হাসলে। বললে, কেন ঠাকুরপো, আমি আবার কী করেছি?

নগেন সরকার বললে, মানুষ নন আপনি, সত্যি—

—ওমা, ঠাকুরপো কি যে বলে, মানুষ নই তো কী, রাক্ষুসী?

—আমাদের কারখানায় তাই কথা হচ্ছিল আপনাকে নিয়ে—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, কারখানায় তো আপনাদের তাহলে খুব কাজ-কর্ম হয়?

—না, ঠাট্টা নয় মুখুজ্জেগিন্নী, ডাক্তারবাবুও বলছিলেন এমন সেবা হাসপাতালের নার্সরাও পারবে না।

ভূধরবাবু বললেন, ওহে ক্যারেক্টারটাই সব, জান, কাটলেটই খাক আর চপই খাক। ক্যারেক্টার যদি ভালো হয় তো কোনও কাজই মানুষের অসাধ্য নয়, ওঁর ক্যারেক্টারটাই যে খাঁটি—

নগেন সরকার পরদিন সোজা বাড়ি এসে হাজির।

বাইরে থেকেই ডাকলে মুখুজ্জেগিন্নী, ও মুখুজ্জেগিন্নী—

ভিতর থেকে মুখুজ্জেগিন্নী বললে, কে? ঠাকুরপো? এস ভাই এস।

বলতে বলতে সামনে এসে বললে, কী হলো ঠাকুরপো? কী মনে করে? কারখানা নেই?

নগেন সরকার ভিতরে এসে ঘরে বসল। বললে, ছুটি নিয়েছি আজ।

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, তোমার হাতে আবার কী ঠাকুরপো?

—এই প্রসাদ এনেছিলাম, হনুমানজীর মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। হনুমানজীর মন্দির অনুপপুর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে, গরুর গাড়ি করে যেতে হয়।

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, ওমা ঠাকুরপোর দেখছি আজকাল ভক্তি-টক্তি হয়েছে খুব।

—না মুখুজ্জেগিন্নী, চাকরিতে কিছু মাইনে বাড়লো কি না, তাই।

—কত বাড়ালো শুনি!

নগেন সরকার বললে, পঞ্চাশ টাকা। তা ভাবলাম প্রথমেই মুখুজ্জেগিন্নীকে

BanglaBook.org

প্রসাদটা দিয়ে আসি, আপনাকে দিয়ে খেলে যদি পুণ্যি হয়. পুণ্যাত্মা আপনি।

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, দাঁড়াও ভাই ঠাকুরপো, বাসি কাপড়টা ছেড়ে আসি—

বলে ভিতরে গিয়ে মুখুজ্জেগিন্নী একখানা তসরের শাড়ি পরে এসে দু হাত জোড় করে প্রসাদটা নিয়ে মাথায় ঠেকালে। তারপর ভিতরে রেখে এল।

এসে বললে, এবার একটা বিয়ে করে ফেল ঠাকুরপো, মাইনেও তো বাড়লো এবার—

নগেন সরকার বললে, তেমন মেয়ে কোথায়? একটা ভালো দেখে মেয়ে খুঁজে দিন না—

—ওমা, হাসালে তুমি ঠাকুরপো, বাংলা দেশে নাকি মেয়ের অভাব!

নগেন সরকার বললে, তা আপনার মত একজন মেয়ে খুঁজে দিন না, আমি এক্ষুনি বিয়ে করছি—

মুখুজ্জেগিন্নী হেসে ফেললে খিল্‌খিল্‌ করে। নগেন সরকারও হাসতে লাগল।

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আমাকে বুঝি ঠাকুরপোর খুব মনে ধরেছে ভাই?

নগেন সরকার বললে তা আপনার মত মেয়ে পেলে কার না মনে ধরে?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, কই, তোমাদের মুখুজ্জে মশাইয়ের তো মন পেলুম না এখনও—

নগেন সরকার বললে, তা কি আর না ধরেছে! মুখুজ্জে মশাই নিজের মুখে বললেও বিশ্বাস করব না আমি—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আমি তো ভাই তোমাদের মুখুজ্জে মশাইকে তাই জিজ্ঞেস করেছিলুম, বললুম এত যে এখানকার সবাই আমার প্রশংসা করে, তোমার মুখে তো কখনও প্রশংসা শুনি না আমার।

—তা কি বললেন?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, ও মানুষের কথা ছেড়ে দাও ভাই, উনি কারও সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, নিজের বাজার করা আর খাওয়া হলেই নিশ্চিন্দি। এই যে আমি এতদিন নটু ঘোষবাবুর বাড়ি পড়ে ছিলাম, তাতেও ওঁর রাগ বিরাগ কিছু নেই।

নগেন সরকার বললে, আমরা তো তাই বলাবলি করি আপনার সম্বন্ধে—

—কী বলাবলি কর?

নগেন সরকার বললে, স্টোর্সের বড়বাবুকে চেনেন তো, ভূধরবাবু? তিনি তাই বলছিলেন—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, ও, ওই যে মাথায় টিকি আছে—

—হ্যাঁ, উনি ভারি সাত্ত্বিক লোক, রোজ নদীতে গিয়ে ভোরবেলা স্নান করে জপ-আহ্নিক সেরে তবে সংসারের কাজ করেন—! আর শুধু কি ভূধরবাবু? আমাদের জেনকিন্‌স্‌ সাহেবও তো আপনার প্রশংসা করেন—

—সে তো আমার হাতে কাট্‌লেট খেয়ে।

—না মুখুজ্জেগিন্নী, নটু ঘোষের বউকে আপনি এই যে ক'দিন সেবা করলেন না, এ-ও সাহেবের কানে গেছে। এবার সাহেব বলেছে হাসপাতালে একটা নার্স আসবে, হেডঅফিসে চিঠি চলে গেছে।

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, তা যা—ই বল ঠাকুরপো, তোমাদের সাহেব লোকটা ভালো নয় বাপু—

—কেন? কী করলে সাহেব?

মুখুজ্জেগিন্নী বললেন, ওই যে রোজ গাঁয়ের মেয়ে ধরে এনে এনে রাত্তিরে

BanglaBook.org

ঘরে পোরা, এটা কি ভালো? এটা তোমরা আপত্তি করতে পার না?

নগেন সরকার বললে, ও আর কী করবে বলুন, বিদেশ থেকে এসেছে, এখানে মেম-সাহেবটাহেব কিছু নেই, কী করে কাটায় বলুন?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, তা মেয়েমানুষ না হলে চলে না? এই যে ভূধরবাবু রয়েছেন, তুমি রয়েছ, তোমরা কটা মেয়ে মানুষ এনে বাড়িতে পোর শুনি? তোমাদের দিন কাটে না?

নগেন সরকার বললে, আমাদের কথা আলাদা মুখুজ্জেগিন্নী, আমরা হচ্ছি গরিব ওভারশিয়ার কেরানী এই সব, আমাদের যে খারাপ হবার যোগ্যতাটুকুও নেই—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আচ্ছা ঠাকুরপো, এই যে তুমি, পুজো দিতে গেলে সেই চল্লিশ মাইল দূরে কোথায়, তোমরা নিজেরা নিজেদের জন্যে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে পার না?

মন্দির? সে যে অনেক টাকা মুখুজ্জেগিন্নী?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, ওই তো তোমাদের মুরোদ, একটা ভালো কাজ বললেই তোমাদের টাকার অভাব পড়ে—সবাই এক মাসে পাঁচ টাকা করে দিতে পার না?

নগেন সরকার বললে, পাঁচ টাকায় কী হবে?-

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, মাথা পিছু পাঁচ টাকা দিলে মন্দির হবে না একটা?

তখনি হিসেব করে দেখিয়ে দিলে মুখুজ্জেগিন্নী। পাঁচ টাকা করে দিলেই এমনিতে তিনশো টাকা ওঠে। তারপর কন্‌ট্রাকটার হুকুম সিং আছে, ফোরম্যান্ প্রেমলানী সাহেব আছে, ডাক্তারবাবু আছে, তারপর জেনকিন্‌স্ সাহেব তো আছেই।

হিসেব করে দেখা গেল তিনহাজার টাকা উঠছে।

সেদিন অনুপপুরে সেই মন্দির প্রতিষ্ঠার কথাটা আজও মনে আছে। সে কী উৎসাহ! সবাই হিন্দু। ছেলে-মেয়ে-বউ নিয়েই বেশির ভাগ লোকের সংসার। বাড়ি ঘর-ডাক্তার-জল সবই ব্যবস্থা করছে কোম্পানী। তা হলে ওটাও ওই রকম দরকারী। মন্দির হলে হিন্দু মাত্রেরই সুবিধে। ঠাকুর-দেবতার মন্দির কার না দরকার। কথাটা নটু ঘোষবাবুও স্বীকার করলেন।

বললেন, কথাটা মন্দ তোলেন নি মুখুজ্জেগিন্নী, এই তো আমার গিন্নী সেদিন নীলের উপোস করলেন, তা শিবলিঙ্গ নেই যে শিবের মাথায় জল দেবেন—

প্রেমলানী সাহেব কথাটা শুনে বললেন, ভেরি গুড্ আইডিয়া, আমি দেব পঞ্চাশ টাকা আর কারখানা থেকে পাথর আর সিমেন্টটা ফ্রি দিয়ে দেব—

হেডঅফিসেও চিঠি লিখে দেওয়া হল। জেনকিন্‌স্ সাহেব তাতে সই করে কড়া সুপারিশ করে দিলেন।

নটু ঘোষের বউ বললে, ধন্যি মায়ের দুধ খেয়েছিলে তুমি ভাই, উনি তো ধন্য ধন্য করছিলেন তোমাকে—

প্রেমলানী সাহেবের বউ বললে, তোমার চেষ্টাতেই হল বোহন—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আগে হক সাহেব-বউ, তখন বোল—

যারা ছোকরা কেরানী, অনুপপুরে মেস্ করে থাকত, তারাও বললে—মুখুজ্জেগিন্নী বাহাদুর মেয়ে ভাই—

স্টোর্সের বড়বাবু ভূধরবাবু বললেন, বুঝলে হে, আমি তোমাদের বলেছিলুম, পৃথিবীতে আসল জিনিস হল ক্যারেক্‌টার, ক্যারেক্‌টারটি খাঁটি হলে ও টাকা-ফাকা যা বল, ও-সব কিছুই না—মুখুজ্জেগিন্নীর ক্যারেক্‌টারটা যে খাঁটি।

BanglaBook.org

মুখুজ্জেগিন্নীর ক্যারেক্টার সম্বন্ধে প্রথম-প্রথম ছোকরা কেরানীদের কিছু সন্দেহ হয়েছিল সত্যি। মুখুজ্জে মশাই যখন স্টেশনে প্রথম নামলেন বউ নিয়ে, স্টেশন মাস্টার অম্বিকা মজুমদার দেখেছিলেন।

এ--এস-এম কাঞ্জিলালবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, লোকটি কে হে? কী বলছিল তোমাকে?

কাঞ্জিলালবাবু বললেন, কনস্ট্রাক্শানের লোক, এখানে চাকরি নিয়ে এসেছে—

—সঙ্গে বউ বুঝি?

তা দেখে সকলেরই সন্দেহ হত প্রথম প্রথম। ছোকরারা মুখুজ্জে মশাইয়ের পাশে মুখুজ্জেগিন্নীকে দেখে মুখ টিপে টিপে হাসতো একটু। মুখুজ্জেগিন্নী ঠিক যেন মুখুজ্জে মশাইয়ের উল্টোটা। মুখুজ্জেগিন্নীর চাওয়া, হাঁটা, পান খাওয়া, কথা বলা সবই কেমন যেন চটপটে, রঙ মেশানো। আবার মুখুজ্জে মশাই তেমনি নিরীহ গোবেচারা মানুষ। জামা-কাপড় সাদা-সিধে। সরল অমায়িক মানুষ। আর মুখুজ্জেগিন্নী বেশ ফিট্‌ফাট্।

নটু ঘোষের বউও কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রথমে।

মজুমদারগিন্নীকে বলেছিল, হ্যাঁ গা, তেরো নম্বর খুলিতে কারা এসেছে দেখেছ দিদি?

মজুমদারগিন্নী বলেছিল, দেখি নি, কেন?

নটু ঘোষের বউ বলেছিল, একদিন যাবে দেখতে?

মজুমদারগিন্নীর শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয় নি। ইস্টিশান থেকে অনেক দূর। সব দিন আসা যায় না। নটু ঘোষের বউ মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিল একদিন এমনি। মুখুজ্জেগিন্নী সেই প্রথম দিনই আপন করে নিয়েছিল।

বলেছিল, নতুন এলুম দিদি, বিদেশ-বিভুঁই, উনিও একটু ভয়-কাতুরে মানুষ, আপনারা দেখবেন একটু—

—তা আমরাও তো নতুন ভাই, কে আর পুরনো এখেনে।

সেই থেকে সূত্রপাত, তারপর ভাব হয়ে গেল দুজনে। তারপরে আর ভাব থাকতে বাকি থাকল না কারও সঙ্গে। যে-ছোকরারা প্রথম-প্রথম দূর থেকে নিঃশব্দে টিট্‌কারী দিত, তারাই শেষকালে মুখুজ্জেগিন্নী বলতে অজ্ঞান।

নেপাল যখন-তখন আসত। বলত, মুখুজ্জেগিন্নী চা খাব।

মুখুজ্জেগিন্নী বলত, হ্যাঁ রে তুই আর আসিস না যে?

নেপাল বলত, কলকাতায় গিয়েছিলাম, হেডঅফিসে—বেস্পতিবারে এসেছি—

ওমা, বেস্পতিবারে এসেছিস্ আর আজ শনিবার, এতদিনের মধ্যে একদিনও আসতে নেই? একেবারে ভুলে গেলি মুখুজ্জেগিন্নীকে!

শুধু নেপাল নয়। নেপাল আছে, অরুণ আছে, বিমল আছে।

হঠাৎ হয়ত একদিন অরুণ দৌড়তে দৌড়তে এসে বলে, মুখুজ্জেগিন্নী, একটু তরকারি দাও তো?

—শুধু তরকারি? শুধু তরকারি কী করবি রে?

অরুণ বলে, নেপালটা রেঁধেছিল, নুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে সব, এখন খেতে পারি না—দাও তোমার কী তরকারি আছে, দাও, নইলে খাওয়া হবে না আজ—

মুখুজ্জেগিন্নী হাসতে হাসতে বলে, কী কাণ্ড দেখ দিকিনি, আমি না থাকলে তোদের তো আজ খাওয়াই হত না—

অনেকখানি ডাল আর আলুর সঙ্গে মাগুর মাছের তরকারি।

দেখে তে অরুণ অবাক। বললে, ও বাবা, এতখানি তরকারি দিলে কেন?

BanglaBook.org

আমরা তো দু জন!

মুখুজ্জেগিন্নী বলেছিল, তা হক, তোরা খা—

—এ কী, সবটাই যে আমাদের দিয়ে দিলে, তা তোমরা খাবে কী? মুখুজ্জে মশাই তো অফিস থেকে এসে এখন খাবে?

—তা হক, তুই নিয়ে যা।

এক-একদিন তাস খেলা হত। জুড়ি হত মুখুজ্জেগিন্নী আর নেপাল এক-দিকে আর ওদিকে অরুণ আর বিমল। খেলতে খেলতে ঝগড়া হত। আবার ভাবও হত। হাসির বন্যা ছুটে যেত ঘরময়। মুখুজ্জেগিন্নী বলত, না, নেপালটাকে নিয়ে আর খেলব না এবার থেকে, অরুণ তুই আমার সঙ্গে খেলবি কাল থেকে—

নেপাল বলত, বা রে, আমি কী করে জানব তোমার হাতে হরতনের টেক্কা আছে?

মুখুজ্জেগিন্নী বলত, তুই একটা হাঁদা, দেখছিস আমি নওলা দিয়ে চুপ করে রইলুম, তোর ত তখুনি বোঝা উচিত ছিল।

খেলার সময় হঠাৎ হয়ত মুখুজ্জে মশাই হাজির হন।

বলেন, খেলছ তোমরা, খেল—খেল—

তারপর মুখুজ্জেগিন্নীর দিকে চেয়ে বলেন, ওগো, তিনটে টাকা দাও তো গো?

মুখুজ্জেগিন্নী বলত, আবার টাকা কী হবে!

মুখুজ্জে মশাই বলতেন, সবাই খেতে চেয়েছে অফিসে—

—কেন? খেতে চেয়েছে কেন?

মুখুজ্জে মশাই বলতেন, ওই যে এ-মাসে পাঁচ টাকা মাইনে বেড়েছে আমার, তাই মিষ্টি খেতে চেয়েছে সবাই, বলেছি বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে এসে খাওয়াব—

মুখুজ্জেগিন্নীর তখন খেলার দিকে লোভ। রুইতনের সাহেবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দান দিতে হবে। মুখ তোলবার সময় নেই।

বললে, চাবি নিয়ে বাক্স খুলে নাও—

এবার এই নেপালরাই এগিয়ে এল। বললে, আমরাই তোমার মন্দিরের চাঁদা তুলে দেব—মুখুজ্জেগিন্নী, কত টাকা লাগবে বল?

চাঁদা নিয়ে প্রথমটা একটু গোলযোগ হয়েছিল। সবাই পাঁচ টাকা করে দিতে পারবে না। বিশেষ করে যারা কম মাইনে পায়। তাও সবাই নয়। দু একজন।

তারা বললে, মন্দির করে লাভ কী? তার চেয়ে থিয়েটার হক না। "সাজাহান" কিংবা "মেবার পতন" হক দু নাইট, ড্রেসার, পেণ্টার কলকাতা থেকে এনে ওই টাকাতে বেশ ভালো করে থিয়েটার করা যাক আর যদি কিছু বাড়তি থাকে তো ফিস্ট্ হক, সবাই মিলে পেটভরে মাংস আর পোলাও খাওয়া যাবে একদিন—

নটু ঘোষ বললেন, যত সব ছেলে-ছোকরাদের কাণ্ড, আমি ওতে এক পয়সা দেব না চাঁদা—

প্রেমলানী সাহেব বললেন, কেন? টেম্প্‌ল্ হবে না কেন?

কর্তারা বললে, কয়েকজন বেঁকে বসেছে, তারা বলছে মন্দিরের বদলে থিয়েটার হবে—

প্রেমলানী সাহেব বললেন, থিয়েটার? থিয়েটারও মন্দ না, তবে থিয়েটারই হক—

কিন্তু স্টোর্সের বড়বাবু ভূধরবাবু বললেন, জমি হবে না, বাঙালীদের ইউনিটি নেই কোথাও, আমি তখুনি বলেছিলাম—ক্যারেক্টার না থাকলে ও-সব একতা-টেকতা সব হাওয়ায় উড়ে যায়, দরকার নেই, দাও ভাই আমার পাঁচটা টাকা আমায়

BanglaBook.org

ফেরত দিয়ে দাও—

প্রায় ভেঙে যায় যায় অবস্থা।

হঠাৎ খবরটা কানে যেতেই, বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল মুখুজ্জেগিন্নী।

ছুটির দিন সেটা। নগেন সরকার বাড়িতে বসে হারমোনিয়াম নিয়ে গলা সাধছিল। জানলা খোলা। বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকলে, ঠাকুরপো—

নগেন সরকার মুখুজ্জেগিন্নীকে দেখেই গান থামিয়ে দিয়েছে। বললে, মুখুজ্জে-গিন্নী, আপনি?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, কে বলছে মন্দির হবে না?

নগেন সরকার মুখুজ্জেগিন্নীর চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেল।

বললে, কয়েকজন বলছে...

—তাঁরা কে? নাম কী তাঁদের?

নগেন সরকার বললে, নাম...

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আমি বলছি হবে—কোম্পানী থেকে টাকা দিক-বা-না-দিক, কেউ বাধা দিক-বা-না-দিক, মন্দির হবেই—

নগেন সরকার কিছু কথা বলতে পারলে না মুখুজ্জেগিন্নীর সামনে গিয়ে।

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, তুমি আছ কি না বল আমার সঙ্গে?

নগেন সরকার বললে, আমি আছি মুখুজ্জেগিন্নী—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, তা হলে এই নাও—

বলে বাঁ হাতের একগাছা সোনার চুড়ি ডান হাত দিয়ে জোর করে খুলে ফেলল।

বললে, কেউ না দেয়, আমার দেওয়া রইল, দরকার হলে সব চুড়িগুলোও দিয়ে দেবে, নাও, তোমার কাছে রাখ—

তারপর সেইদিনই মুখুজ্জেগিন্নী আর নগেন সরকার কলোনীর সকলের বাড়ি বাড়ি গেল। সকলের কাছে গিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে বললে। তাদেরও বক্তব্য শুনলে। নেপাল অরুণ বিমল ওরাও জুটল সঙ্গে।

নেপালরা বললে, কিছু ভয় নেই মুখুজ্জেগিন্নী, আমরা তোমার সব টাকা যোগাড় করে দেব—

সেইদিন থেকেই শোরগোল পড়ে গেল কলোনীতে। নেপালরা ট্রেনের সময় স্টেশনে গিয়ে চাঁদা চায়। কেউ দেয়, কেউ দেয় না। এক পয়সা দু পয়সা থেকে শুরু করে এক টাকা দু টাকা পর্যন্ত দেয় কেউ কেউ। প্রথম দিনেই কুড়ি টাকা বারো আনা উঠল, তারপর দিন তেইশ টাকা দু পয়সা।

মুখুজ্জেগিন্নীর কথা শুনে প্রেমলানী সাহেবের বউও নিজের হাতের একগাছা সোনার চুড়ি খুলে দিলে। নটু ঘোষের বউ সোনার চুড়ি দিতে পারলে না। তার অনেক মেয়ে। বিয়ে দিতে হবে। তা-ও কুড়ি টাকা চাঁদা দিলে।

জেনকিন্‌স্‌ সাহেব দিলেন পাঁচশো টাকা নিজের পকেট থেকে।

হেডঅফিস থেকেও অনুমতি দিয়ে চিঠি এসে গেল। জমি দিতে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। দাদাকেও কিছু দিতে হল। মুখুজ্জেগিন্নী নিজে এসে বলে গেল যে ডাক্তারবাবু আসছে শনিবার দিন কিন্তু আপনাকে বিকেলবেলা যেতে হবে, ওই দিন ভিত খোঁড়া হবে—

আজ এতদিন পরে এই বিড্‌ন্‌ স্কোয়ারের সামনে মুখুজ্জে মশাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আবার সেই সব কথাগুলো মনে পড়তে লাগল। সেই কলোনীর মাঠের

BanglaBook.org

ধারে হাসপাতালের ঠিক পিছনে। কী ভিড় সেদিন সেখানে। কেউ আর বাদ যায় নি সেদিন। ওদিকে বিজুরি, মনেন্দ্রগড়, চিরিমিরি থেকেও লোক এসে গেল। কন্‌ট্রাক্‌টার হুকুম সিং নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব তদারক করতে লাগলেন।

মুখুজ্জেগিন্নী ঘুরে ঘুরে সকলকে সবিনয়ে বলতে লাগল, আপনারা এসেছেন, আমরা যা উৎসাহ পেলাম—

নটু ঘোষ পরিচয় করিয়ে দিলেন সবার সঙ্গে।

বললেন, এই ইনিই হচ্ছেন আমাদের মুখুজ্জেগিন্নী, মিসেস মুখার্জি—বলতে গেলে এঁরই চেষ্টাতে এ মন্দির হল—

মুখুজ্জেগিন্নীর সেদিন সকাল থেকে খাওয়া-দাওয়া নেই। সব চুকেবুকে গেলে মুখুজ্জেগিন্নী বাড়িতে এলেন যখন, তখন অনেক রাত।

নেপালরাও এসেছিল। মুখুজ্জেগিন্নী বললে, কাল সক্কালবেলা আসবি তোরা—আমার কাছে টাকা-কড়ি রইল, আজকের হিসেবটা লিখে নেব খাতায়—

হিসেবটা ছিল খুব কড়াকড়ি। এক পয়সার হিসেব নিয়েও মুখুজ্জেগিন্নী একঘণ্টা কাটিয়ে দিত।

বলত, মন্দিরের টাকা, এর প্রত্যেকটি পয়সার হিসেব দিতে হবে আমাকে তখন গোলমাল হলে কে জবাবদিহি করবে?

রোজ রাত্রে মেঝের উপর শতরঞ্জি পেতে টাকা-পয়সা ছড়িয়ে হিসেব হয়। নগেন সরকার আসে। নেপাল আসে। অরুণ বিমলও আসে।

মুখুজ্জেগিন্নী বলে, কাল যে আটা কেনা হল ঠাকুরপো, সে-হিসেবটা দিলে না তো? তোমাকে যে পাঁচ টাকার নোট দিলাম, তার থেকে তুমি আমায় ফেরত দিয়েছ তিন টাকা সাড়ে তের আনা, বাকি এক টাকা দশ পয়সার কী-কী কিনলে?

নগেন সরকার বললে, পুরুত মশাইকে দিয়েছি তিন পয়সা বিড়ি খেতে, সেটা লিখেছ?

এই রকম কত হিসেব কড়া ক্রান্তি পাই পয়সাটা পর্যন্ত। হিসেব না মিললে মুখুজ্জেগিন্নীর যেন মাথা ঘুরে যায়।

যখন সব হিসেব মিলিয়ে মুখুজ্জেগিন্নী শুতে যায় তখন অনুপপুর কলোনীতে অন্ধকার নিশুতি। মুখুজ্জে মশাইয়ের এক ঘুম হয়ে গেছে। আবার ভোরবেলা যখন মুখুজ্জে মশাই ঘুম থেকে উঠেছে তখন দেখেছে মুখুজ্জেগিন্নী অনেক আগেই উঠে স্নান করে রান্না চড়িয়ে দিয়েছে।

বলতাম, এত সকালে যে? এত সকালেই রান্না চড়িয়েছ মুখুজ্জেগিন্নী?

মুখুজ্জেগিন্নী বলত, এখন রান্না না চড়ালে কখন চড়াব, এখনই তো মিস্ত্রীদের হিসেব নিয়ে হুকুম সিং-এর কাছে যেতে হবে একবার—

হুকুম সিং কুলী মজুরের দামটা নিজে দেবে বলেছে। পুরো দমে তখন কাজ চলছে। মন্দির শুধু নয়, মন্দিরের সামনে একটু ঢাকা বসবার জায়গাও হচ্ছে। ওখানে দরকার হলে গীতাপাঠও হবে, চণ্ডীপাঠও হবে, দরকার হলে কীর্তনও হতে পারে।

রেল লাইনের কনস্ট্রাক্‌শানের কাজ। আট দশ বছর চলবে এ-সব। তারপরে হয়ত এখানে শহর গড়ে উঠবে। অনুপপুর জংশন স্টেশন হবে। কয়লা-খনির আশে-পাশে যেমন কল-কারখানা গড়ে ওঠে তেমনি সব গড়ে উঠবে। কলকাতার লোক আসবে, দিল্লীর লোক, মাদ্রাজের লোক, বোম্বাই-এর লোক আসবে। তখন সবাই এই মন্দির দেখে জিজ্ঞেস করবে, এ মন্দির কারা তৈরি করেছিল?

তখন নাম হবে এই আজকের কলোনীর লোকদের। এই ক জন হিন্দু, তারা

BanglaBook.org

নিজেদের সামান্য আয় থেকে পয়সা বাঁচিয়ে চাঁদা দিয়েছিল মন্দিরের জন্যে।

প্রেমলানী সাহেব বললেন, মন্দিরটা প্রতিষ্ঠা বলতে গেলে যখন মিসেস মুখার্জির চেষ্টাতেই একরকম হল ; ওঁর নামেই ট্যাব্‌লেট্‌ লাগানো হক— মিস্টার ঘোষ, আপনার, কী মত ?

নটু ঘোষ বললেন, আরে মশাই, আমার স্ত্রী তো মরতেই বসেছিল, মুখুজ্জে-গিন্নী না থাকলে, এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে তো উইডোয়ার হয়ে যেতাম—মেয়েরা মুখুজ্জেগিন্নীকে কাকী বলে ডাকে, জানেন।

নগেন সরকার বললে, এ মন্দিরের কথা প্রথম মুখুজ্জেগিন্নীই তুলেছিলেন আমার কাছে—সুতরাং, সমস্ত ক্রেডিট তাঁরই—

শেষ পর্যন্ত মুখুজ্জেগিন্নীর কানে গেল কথাটা।

তিনি বললেন, ছি ছি, আমার নাম যদি থাকে তো আমি এই মন্দিরের ব্যাপারে আর নেই আজ থেকে, এই বলে দিলাম।

নগেন সরকার বললে, কিন্তু আপনিই তো সব মুখুজ্জেগিন্নী—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, তুমি বলছ কি ঠাকুরপো, আমি কি একলা এ-সব করতে পারতুম তোমরা না থাকলে ?

নেপাল বললে, আচ্ছা মুখুজ্জেগিন্নী, তুমি তাহলে সেক্রেটারী হও এই মন্দির কমিটির—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আমি কিছুই হব না, হতে চাইও না, আমি শুধু রোজ ঠাকুরের মাথায় জল দিয়ে আসব, প্রণাম করে আসব। আর আমার নাম নিয়ে কী হবে বল্‌ না! আমি মেয়েমানুষ—তোরাই কেউ সেক্রেটারী হ, প্রেসিডেণ্ট যা-কিছু হ—

শেষে একদিন মন্দির তৈরি শেষ হল।

সবাই বললে, উদ্বোধনের দিন একটা মিটিং ডাকা হক—

কথা ছিল সামান্য করে হবে অনুষ্ঠানটা কিন্তু হতে হতে শেষ পর্যন্ত আয়োজন হয়ে গেল অনেক। হুকুম সিং সামনে চাঁদোয়া খাটিয়ে দিলে বিনা পয়সায়।

মুখুজ্জে মশাই কাট্‌নিতে চলে গেলেন খাবার কিনতে। রেওয়ার ঠাকুর সাহেব প্রেসিডেণ্ট হতে রাজি হয়ে গেলেন। সব যোগাড়যন্ত্র শেষ। মুখুজ্জে মশাই-ই নিমন্ত্রণের চিঠি ছাপিয়ে আনলেন কাট্‌নি থেকে। ভদ্রলোক মন্দিরের জন্যে এক-বার কাট্‌নি যান আবার আসেন। ফিরে এসেই আবার পরের ট্রেনে কাট্‌নি যেতে হয়।

নগেন সরকার বললে, আপনার খুব খাটুনি হচ্ছে মুখুজ্জে মশাই—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, না না ঠাকুরপো, বাজার করতে ওঁর কোনও কষ্ট নেই—

তারপর মুখুজ্জে মশাইকে বললে, সব আনলে, কিন্তু পনেরোটা কাচের গেলাস চাই যে—

মুখুজ্জে মশাই বললেন, পনেরোটা কাচের গ্লাস ? দেখি নিয়ে আসি তাহলে—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, কোত্থেকে নিয়ে আসবে ?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, এর বাড়ি দুটো, ওর বাড়ি পাঁচটা, এমনি করে যোগাড় করে নিয়ে আসি—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, তা ছাড়া আর কী করবে ? আর দেখ, যদি কয়েকটা ট্রে কোথাও পাও নিয়ে এস তো, হুকুম সিংকে আমার নাম করে গিয়ে বল দিকিন— ওঁর কাছে থাকতে পারে—

এমনি সারাদিন খাটুনি গেল মুখুজ্জে মশাইয়ের। মুখুজ্জেগিন্নীরও কাজের

BanglaBook.org

কামাই নেই। ভোর বেলা রান্নাটা সেরে নিয়েই এখানে-ওখানে ঘুরতে লেগেছে। আর শুধু ওঁরাই নয়। নগেন সরকারও খাটছে। নেপাল, অরুণ, বিমল, তারাও খাটছে কদিন ধরে।

হঠাৎ নেপাল এসে বলে, মুখুজ্জেগিন্নী, ফুলের মালা আনতে হবে, মালার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে—

অরুণ বললে, কয়েকটা প্লেট আর কাচের গেলাসও তো দরকার—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, সে তোদের ভাবতে হবে না, মুখুজ্জে মশাইকে দিয়ে সব যোগাড় করে রেখেছি—

বিকেল বেলা সভা আরম্ভ।

আমরা সবাই যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি। দাদা সকাল সকাল হাসপাতাল থেকে এসে গেছে। মুখুজ্জেগিন্নী বলে গেছে নিজে এসে, আপনাকে যেতে হবে কিন্তু ডাক্তারবাবু—

দাদা বলেছিল, আমার যে হাসপাতাল আছে—

মুখুজ্জেগিন্নী বলেছিল, আপনার হাসপাতালের পাশেই তো, আজকে রুগী-দের না-হয় একটু সকাল সকাল দেখে নেবেন—

দাদা কথা দিয়েছিল যাবে।

হঠাৎ সকাল বেলার ট্রেনে প্রশান্তবাবু এসে হাজির। প্রশান্ত দত্ত। দাদার বন্ধু। ইন্সিওরেন্সের লোক। আজ দিল্লী, কাল বোম্বাই, পরশু কলকাতা করতে হয় প্রশান্তবাবুকে। মাঝে মাঝে দাদার কাছে এসে পড়ে। একদিন দু দিন থাকে, তারপর আবার চলে যায়।

দাদা বললে, ভালোই হয়েছে, আজ আমাদের এখানে একটা সভা আছে—

—কিসের সভা?

দাদা বললে, একসঙ্গে যাব চল্, আমাদের এখানকার কলোনীতে মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে একটা আজ—যেতেই হবে, না-গেলে চলবে না—একটুখানি গিয়েই চলে আসব।

তা সত্যিই বিরাট আয়োজন হয়েছিল। কোথা থেকে পদ্মফুল এনেছিল নেপালরা। ধূপ ধুনো জ্বলছে। হুকুম সিং বসে আছে সামনে। তার পাশে ইঞ্জিনীয়ার জেনকিন্স্ সাহেব, প্রেমলানী সাহেব। সামনে একটা উঁচু বেদী মতন করেছে বেঞ্চি সাজিয়ে। রেওয়ার ঠাকুর সাহেব গলায় মালা দিয়ে সভাপতির চেয়ারে বসে আছে। এদিকে মেয়েদের বসবার জায়গা।

প্রশান্তবাবুর বোধহয় এ-সব ভালো লাগছিল না।

বললে, দূর, এসব কী শুনব! যত সব বাজে কাজ, চল্ ওঠ—

দাদা বললে, একটু শোন্ না, বিদেশে আছি, এ-সব ব্যাপারে না থাকলে বদনাম হয়—

প্রশান্তবাবু একটু সাহেব-ঘেঁসা লোক। বললে, এ-সব মন্দির-টন্দিরের ব্যাপারে আমি নেই ভাই, তোর ইচ্ছে হয় তুই শোন্, আমি চললাম—

নগেন সরকার বক্তৃতা দিলে একটা। ওভারশিয়ার মানুষ। লিখে এনেছিল বক্তৃতাটা।

বললে, আজকে আমাদের এই মন্দির প্রতিষ্ঠার পিছনে যে-মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম আর নিষ্ঠা নিরলসভাবে কাজ করে এসেছে, তাঁকেই প্রথমে আমি ভক্তি-ভরে আমার প্রণাম জানাই, তিনি না থাকলে এ সম্ভব হত না। তাঁর নাম শ্রীমতী মুখার্জি। তাঁকে আপনারা সকলেই চেনেন। তিনি আমাদের কন্সট্রাকশনের

BanglaBook.org

ড্রাফটস্‌ম্যান্‌ মিস্টার মুখার্জির স্ত্রী।...

জেনকিন্‌স্‌ সাহেব বক্তৃতা দিলেন।

তিনি বললেন, ক্রিশ্চিয়ানদের পক্ষে যেমন চার্চ, তেমনি হিন্দুদের পক্ষে টেম্পল তাদের ধর্মের অংগ—মিসেস মুখার্জি যখন এই টেম্পলের প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে যান আমি তা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। আমাদের হেডঅফিস থেকেও যাতে কিছু টাকা পাওয়া যায় আমি তারও ব্যবস্থা করে দিই—

মুখুজ্জেগিন্নী লিস্ট দেখে বললে, ঠাকুরপো, এবারে তোমায় গান গাইতে হবে—

নগেন সরকার বললে, আমি গান গাইব? কী বলছেন আপনি?

—তা হক, তোমার পর শেফালি গাইবে, তারপর দীপালি।

ডান হাতে একটা কাগজ নিয়ে কার পর কী হবে তারই ব্যবস্থা করছিল মুখুজ্জেগিন্নী।

নেপাল বলে, চায়ের জল চড়িয়ে দিই তাহলে?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, এখন না, একটু পরে—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, প্রত্যেক ডিশে দুটো করে সিঙ্গাড়া আর দুটো করে রসগোল্লা দিবি, আর প্রেসিডেন্টের জন্যে তো রাজভোগ আছে দুটো—

অরুণ বললে, প্রেসিডেন্টকে তাহলে কি আলাদা খেতে দেব—?

নগেন সরকার তাড়াতাড়ি কাছে মুখ এনে বললে, মুখুজ্জেগিন্নী, ঠাকুর সাহেব এক গেলাস ঠাণ্ডা জল চাইছে, সোডা আছে। সোডা দেব?

অরুণ এসে বললে, এবার কে গাইবে মুখুজ্জেগিন্নী? দীপালির গান হয়ে গেছে। ভূধরবাবু বললেন আপনাকে একটা গান গাইতে, শ্যামাসঙ্গীত।

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, না, না, আমার গান গাইবার সময় নেই, শেফালি আর একটা গান গাক্‌—আমি শেফালিকে বলে দিচ্ছি, শেফালিকে ডাক তো—

মুখুজ্জেগিন্নী সেদিন একটা গরদের লালপাড় শাড়ি পরেছে। চুলগুলো এলো খোঁপা করে বেঁধেছে। কপালের উপরে দুটো ভুরুর মাঝখানে একটা সিঁদুরের টিপও দিয়েছে মোটা করে। চমৎকার দেখাচ্ছিল মুখুজ্জেগিন্নীকে। একা আড়াল থেকে সব নজর রেখেছে। কোথাও কোনও গোলমাল হলে, অব্যবস্থা হলে, তার কাছে খবর আসে। একজনকে দিয়েছে আলোর ভার, একজনকে খাবারের। আর একজনকে অতিথি-আপ্যায়নের ভার দিয়েছে। কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা নেই। কোনও দিকে ত্রুটী নেই। বেশ নিঃশব্দে নির্বিঘ্নে সভার কাজ এগিয়ে চলেছে।

ভূধরবাবু ভিতরে এলেন। আজ তিনি তসরের কাপড়, তসরের চাদর পরেছেন। মাথার টিকিটা বেশ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

ভিতরে ঢুকে তিনি বললেন, আমার মা কই, মা জননী কই গো?

একজন তাড়াতাড়ি মুখুজ্জেগিন্নীর কাছে এসে বললে, মুখুজ্জেগিন্নী, বড়-বাবু আপনাকে একবার ডাকছেন—

মুখুজ্জেগিন্নী তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে এল।

ভূধরবাবু তখনও ডাকছেন, মা, ও মা, মা-জননী কই আমার?

মুখুজ্জেগিন্নী ভূধরবাবুর পায়ের ধুলো নিলে নিচু হয়ে।

বললে, আপনি আমাকে অপরাধী করবেন না বড়বাবু—

ভূধরবাবু বললেন, না মা, তুমি কি সামান্য মানুষ! তুমি মহাশক্তি, যে যাই বলুক মা, আমার চোখ-কানকে তো কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না—

মুখুজ্জেগিন্নী লজ্জায় নুয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

বললে, ছি ছি, আমি যে কত অপরাধ করেছি—আর লজ্জা দেবেন না আপনি আমাকে—

ভূধরবাবু তবু বলতে লাগলেন, না না, আমি তোমার সন্তান, অবোধ সন্তান মা, সন্তানের একটা অনুরোধ রাখবে না তুমি মা হয়ে?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, সে কি কথা বাবা, বলুন আমি কী করতে পারি?

ভূধরবাবু বললেন, একটা গান তোমার শুনব মা—আজকে। আর আপত্তি করতে পারবে না মা, বল গাইবে?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, কিন্তু আমার যে অনেক কাজ এদিকে বাবা, আমি গানের দিকে গেলে এদিকটা কে সামলাবে?

ভূধরবাবু বললেন, যিনি সামলাবার তিনিই সামলাবেন মা, তুমি আমি তো নিমিত্ত মাত্র...

ভূধরবাবু বললেন, আর তা ছাড়া ঠাকুর-দেবতার স্থানে যে-সব গান এতক্ষণ গাইলে ওরা, সে কি গান? একটা গানেও ভগবানের নাম নেই!

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, কিন্তু সে-সব গান কি সকলের ভাল লাগবে!

ভূধরবাবু বললেন, ভগবানের নাম ভালো লাগবে না? তুমি আমার মা হয়ে কী বলছ মা?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, কোন্ গানটা গাইব আপনি বলুন—

ভূধরবাবু বললেন, কেন, মা তোমার সেই গানটা গাও না—'শ্যামা মা কি আমার কালো'

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আচ্ছা বাবা, আপনি বসুন গিয়ে, আমি গাইছি—

ভূধরবাবু চলে গেলেন। মুখুজ্জেগিন্নী বললে, তোমরা একটু এদিকটা দেখ, উনি ধরেছেন, গাইতে হবে—

সবাই লাফিয়ে উঠল। বললে, মুখুজ্জেগিন্নী, আপনি গাইবেন সত্যি!

—না গেয়ে কী করি বল, উনি পিতৃতুল্য লোক, ওঁর কথা এড়াতে পারি?

মনে আছে সেদিন সারা সভায় সে কী আলোড়ন। প্রথম যখন ওভারশিয়ার নগেন সরকার ঘোষণা করলে মুখুজ্জেগিন্নীর গানের কথা, চারদিকে হাততালি পড়ল পটাপট্ করে।

নগেন সরকার বললে, এবার আমাদের এই মন্দিরের যিনি প্রাণ, যিনি এর মূলে সেই শ্রীমতী মুখার্জি আপনাদের একটি শ্যামাসঙ্গীত গেয়ে শোনাবেন—

প্রশান্তবাবু বললে—কে রে?

দাদা বললে, আমাদের এখানে ড্রাফট্স্ম্যান আছে, তারই বউ—খুব ভালো গান করে শুনেছি—

—এই মন্দির বুঝি তাঁরই করা?

দাদা বললে, হ্যাঁ, শুধু মন্দির নয়, সব কাজেই তিনি আছেন, সকলের বিপদে আপদে উনি দেখেন সকলকে। খুব মিশুক, সবাই ওঁকে খুব ভালবাসে—

আস্তে আস্তে পর্দা সরে গেল। মুখুজ্জেগিন্নী এসে সামনে দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে সকলকে প্রণাম করলে। পাশে তবলা নিয়ে বসে ছিল নেপাল। মুখুজ্জেগিন্নী সেদিকে না চেয়ে চোখ বুজে গান ধরলে—

শ্যামা মা কি আমার কালো—

সমস্ত সভা নিস্তব্ধ। যেন আলপিন পড়লেও শুনতে পাওয়া যাবে।

প্রশান্তবাবু বললে, আরে, এ যে বেনারসী—

ভূধরবাবু ভাবাবেগে একবার চিৎকার করে উঠলেন—মা-মা-মা—

BanglaBook.org

সেই ভাবাবেগে সভার সমস্ত লোক যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। যেমন সুন্দর কণ্ঠ, তেমনি সুর, আর তেমনি ভক্তি—

ভূধরবাবু বললেন, আহা, এই না হলে গান, গান যাকে বলে।

পাশে নটু ঘোষ বসেছিলেন।

তিনি বললেন, আহা, মনে খাঁটি ভক্তি না থাকলে এমন গান বেরয় না বড়-বাবু!

ভূধরবাবু বললেন, আর খাঁটি ক্যারেক্টারও চাই—আমি 'মা' বলে কি ডাকি সাধে!

প্রশান্তবাবু আবার বললে, আরে, এ বেনারসী না হয়ে যায় না—

দাদা বললে, থাম্, চুপ কর তুই এখন, গানটা ভালো লাগছে বেশ।

—আরে বেনারসী শ্যামাসঙ্গীত গাইছে এখানে, এর কত ঠুংরি শুনেছি! ঠুংরিটাও ভালো গাইত ও—

—কোন্ বেনারসী?

প্রশান্তবাবু বললে, একটা বেনারসীকেই তো আমি চিনি বাবা, সব বেনা-রসীকে আমি চিনব কেমন করে!

দাদা বললে, এতো আমাদের ড্রাফটস্ম্যান মুখার্জির বউ, আমরা সবাই একে মুখুজ্জেগিন্নী বলে ডাকি!

প্রশান্তবাবু বললে, তুই থাম্, আমি বাজি রাখতে পারি এ বেনারসী, দুর্গা-চরণ মিত্তির স্ট্রীটের তেরো নম্বর ঘরের মেয়েমানুষ—

—বলছিস্ কী তুই?

ভূধরবাবু বললেন, একটু চুপ করুন—

সামনে থেকে কে একজন বললেন, চুপ করুন একটু—বড় গোলমাল হচ্ছে—

প্রশান্তবাবু চুপ করে গেল—

গান থামতেই প্রশান্তবাবু চীৎকার করে বললে, একটা ঠুংরি শুনব—

হঠাৎ দেখলাম মুখুজ্জেগিন্নী যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে উঠল। মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল হঠাৎ। একেবারে সঙ্গে সঙ্গে উঠে ভিতরে যেতেই পর্দা টেনে দিলে।

বাইরে একটা হৈ হৈ উঠল।

ভূধরবাবু বললেন, মা কী গান শোনালে, আহা—আহা—

নটু ঘোষ বললেন, মনে খাঁটি ভক্তি আছে কি না, তাই ভাব দিয়ে গেয়েছে—আর একটা শুনতে ইচ্ছে করছে—ওহে আর একটা গাইতে বল না মুখুজ্জে-গিন্নীকে।

একজন ছেলে ভিতরে গেল।

কিন্তু ভিতরেও তখন বেশ হৈ চৈ চলেছে। নেপাল, অরুণ, বিমল সবাই ঘিরে রয়েছে মুখুজ্জেগিন্নীকে। বলছে, আর একটা গাইলে না কেন মুখুজ্জেগিন্নী?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আমার মাথাটা খুব ঘুরছে রে, আমি আর থাকতে পারছি না।

হঠাৎ কে যেন ডাকলে, বেনারসী!

সবাই পিছন ফিরলে।

প্রশান্তবাবু সামনে গিয়ে হাসতে লাগল এবার।

বললে, বাঃ, এখানে কবে এলে বেনারসী! কপালনী সাহেব আবার বায়না ধরেছিল তোমার ঘরে যাবে বলে। বাড়িউলী বললে, বেনারসী থাকে না এখানে, তা এখানে চলে এসেছ তুমি? আমাদের তো বল নি কিছু?

BanglaBook.org

মুখুজ্জেগিন্নী যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। যেন সহ্য করতে পারছে না কিছু।

নেপাল বললে, আপনি কে? কোত্থেকে আসছেন আপনি?

প্রশান্তবাবু বললে, বেনারসীর সঙ্গে কথা বলছি আমি, আমার চেনা কিনা!

অরুণ বললে, মুখুজ্জেগিন্নীর শরীরটা খুব খারাপ, আপনি পরে কথা বলবেন—

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, এক গ্লাস জল দে তো—

প্রশান্তবাবু আর কিছু কথা না বলে হাসতে হাসতে বাইরে চলে গেল। নেপাল জিজ্ঞেস করলে, ও ভদ্রলোক কে মুখুজ্জেগিন্নী? তোমার চেনা?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, মুখুজ্জে মশাইকে ডেকে দে তো, বাড়ির চাবি ওঁর কাছে, এখুনি বাড়ি চলে যাব—মাথাটা ঘুরছে খুব।

মুখুজ্জেগিন্নী চলে যাবে শুনলে ভয় পাবারই কথা! মুখুজ্জেগিন্নী চলে গেলে সব যে পণ্ড। মুখুজ্জেগিন্নী ছাড়া এত কাজ হবে কী করে? এখনও ঠাকুর সাহেবের বক্তৃতা বাকি। সকলকে খাওয়ানো আছে। মুখুজ্জেগিন্নী না থাকলে কোথায় কী ত্রুটি ঘটে যাবে কে জানে।

বাইরেও তখন খুব গোলমাল।

নেপাল বললে, এবার কার বক্তৃতা হবে মুখুজ্জেগিন্নী?

মুখুজ্জেগিন্নী বললে, আমি চললাম, তোরা যা পারিস করিস ভাই—

মুখুজ্জে মশাই এসেছিল। ভিতরে। মুখুজ্জেগিন্নী বললে, চল—

মুখুজ্জে নির্বিরোধী মানুষ। তিনিও বললেন, চল—

বাইরে ভূধরবাবু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে করে শেষকালে বললেন, ওহে, মুখুজ্জেগিন্নীকে আর একখানা শ্যামাসঙ্গীত গাইতে বল না—

নটু ঘোষ বললেন, শুনছি তিনি নেই, চলে গেছেন নাকি—

—কেন? চলে গেলেন কেন?

আর একজন কে বললে, তিনি তো মুখুজ্জেগিন্নী নন, তিনি বেনারসী—

একজন বললে, বেনারসী মানে?

বেনারসী মানে বেনারসী দেবী!

—বলছেন কী?

—আজ্ঞে ঠিকই বলছি!

প্রশান্তবাবু বললে, আরে মশাই, দুর্গাচরণ মিত্তির স্ট্রীটে গেছেন? গেলে বেনারসীকে চিনতেন! তার ঘরে একবার গেলে আর ভুলতে পারতেন না তার গান। সে যে মশাই এই কয়লার দেশে মুখুজ্জেগিন্নী হয়ে গেছে তা কী করে জানব?

দাদা জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু তুই বেনারসীকে চিনলি কী করে?

প্রশান্তবাবু সিগারেট ধরালে একটা।

বললে, বাবা, আমার কাছে চালাকী। এই ইন্সিওরেন্সের দালালী করে খাই, কত মক্কেল চরালাম, ও গরদের শাড়িই পরুক আর সিঁথিতে সিঁদুর দিক আমি ঠিক ধরে ফেলেছি—

দাদা জিজ্ঞেস করলে, তুই কি ওর ঘরে গিয়েছিলি?

প্রশান্তবাবু বললে, আরে, আমাকে তো নানান্ জায়গায় যেতে হয় মক্কেলের জন্যে, কেউ হোটেলে খেতে চায়, কাউকে পার্টি দিতে হয়, কাউকে মদ খাওয়াতে হয়, নিজেও খাওয়ার ভান করতে হয়, আবার কাউকে মেয়েমানুষের বাড়ি নিয়ে

BanglaBook.org

যেতে হয়, যে-যেরকম মক্কেল তাকে সেইভাবে খাতির করতে হয়, 'কেস' পাবার জন্যে—

ভূধরবাবু বললেন, থামুন মশাই, সতীলক্ষ্মীকে নিয়ে যা তা বলবেন না, জিভ খসে যাবে আপনার—

নটু ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন, ডাক্তারবাবু, ইনি আপনার বন্ধু নাকি?

ভূধরবাবু বললেন, তা আমাদের চেয়ে কী আপনি বেশি চেনেন মুখুজ্জে-গিন্নীকে? জানেন আমি মুখ দেখে ক্যারেকটার বলে দিতে পারি?

প্রশান্তবাবু বললে, তা চলুন না, ভজিয়ে দিচ্ছি আপনার সামনেই, ও মুখুজ্জেগিন্নী না বেনারসী।

—চলুন, চলুন, ওঁর মুখের দিকে চেয়ে ও-কথা বলবার সাহস কী করে হয় আপনার দেখি।

তা চলুন! ভজিয়ে দিচ্ছি সামনা-সামনি।

ভূধরবাবু প্রশান্তবাবু দু'জনেই উঠলেন—

নটু ঘোষবাবু বললেন, চলুন ডাক্তারবাবু, ব্যাপারটা কী দেখাই যাক্ না—কী জানি মশাই, আমি যে ওর হাতের রান্না খেয়েছি, আমার স্ত্রীও খেয়েছে, ছেলে-মেয়েরা সবাই খেয়েছে। কী হবে?

ভূধরবাবু বললেন, আমিও তো খেয়েছি মশাই, ওঁর তৈরি সত্যনারায়ণের সিন্নী খেয়েছি তাঁরই বাড়িতে বসে, জানেন। তা হলে বলছেন আমি লোক চিনি না? জানেন, আমি এই বয়স পর্যন্ত মুখুজ্জেগিন্নী ছাড়া আর কারও হাতের ছোঁয়া খাই নি!

প্রশান্তবাবু বললে, অত কথায় কাজ কি মশাই, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার—চলুন না—

কথাটা মেয়ে-মহলেও ছড়িয়ে পড়ল!

নটু ঘোষের বউ বললে, ওমা সে কি সর্বনেশে কথা মা, শুনে আমার যে হাত-পা হিম হয়ে আসছে।

সাহেব-বউ বললে, তা কখনও হতে পারে দিদি?

স্টেশন মাস্টার অম্বিকা মজুমদারের বউ বললে, ওমা, কী কেলেঙ্কারীর কথা ভাই, জাত জন্ম সব গেল যে আমাদের!

সবাই ভিতরে গিয়ে ঢুকল। আমিও চললাম সঙ্গে। কিন্তু মুখুজ্জেগিন্নী নেই। মুখুজ্জেগিন্নী মুখুজ্জে মশাইয়ের সঙ্গে তখন বাড়ি চলে গিয়েছে। মাথা ধরার জন্য আর থাকতে পারে নি।

প্রশান্তবাবু বললে, তা হলে চলুন তার বাড়িতেই যাই—

ভূধরবাবু বললেন, চলুন—

নটু ঘোষবাবু বললেন, থাক্ থাক্ এত রাত্তিরে আর গিয়ে কাজ নেই, কাল সকাল বেলাই এর বিহিত করলে হবে'খন, আপনিও তো আছেন, আর আমরাও আছি—

প্রেমলানী সাহেব বললেন, সেই ভালো—

সে-রাত্রের মতন সেইখানেই সে-গোলমাল থামল। যা কর্তব্য পরের দিন স্থির করলেই চলবে। যে-যার বাড়ি চলে গেলেন। সভা আর বেশিক্ষণ জমলো না। ভাঙা আসর ভেঙে গেল মাঝ পথে।

কিন্তু সকাল বেলা আবার যখন সবাই জড়ো হলেন, তখন ভূধরবাবুই আগে এসে হাজির আমাদের বাড়ি।

BanglaBook.org

বললেন, কাল সারারাত আমার ঘুম হয় নি মশাই—যাকে মা বলে ডেকেছি তার এমন কাণ্ড যে ভাবতেই পারা যায় না মশাই—চলুন—

নটু ঘোষবাবুও এসে গেলেন শেষকালে।

বললেন, সারারাত কাল আমার স্ত্রী কেঁদেছে মশাই জানেন, কতদিন ছোঁয়া-মেশা করেছে ওর সঙ্গে, শেফালি তো ওকে কাকীমা বলতে অজ্ঞান—

কলোনীর দক্ষিণ দিকে উঁচু খাদের উপর তের নম্বর কুঠি। বাইরে ফুলের বাগান। ফুল ফুটে আছে গাছে গাছে। মুখুজ্জেগিন্নীর কত সাধের বাগান। কিন্তু কাছে যেতেই দেখা গেল সদর দরজায় তালা ঝুলছে। কেউ কোথাও নেই। মুখুজ্জে গিন্নীর বাড়ির ঝিটা আসছিল এই দিকে।

নেপাল জিজ্ঞেস করলে, এই লছমী, তোর মা কোথায়?

নগেন সরকার বললে, হ্যাঁরে, মুখুজ্জেগিন্নী কোথায় গেছে রে?

লছমী বললে, মা কাল রাত্তিরের ট্রেনে চলে গেছে।

—চলে গেছে! কোথায়! সবাই যেন একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে।

—তা জানি নে বাবু!

—মাল-পত্তর নিয়ে গেছে?

লছমী বললে, মাল-পত্তর কিছুই নেয় নি বাবু, খালি হাতে চলে গেছে—

সেই শেষ। মুখুজ্জে মশাই আর মুখুজ্জেগিন্নীর সঙ্গে আর দেখা হয় নি কারও। আর তারা ফিরেও আসে নি কোনোদিন। কলোনী আরও কয়েক বছর ছিল সেখানে। চিরিমিরি পর্যন্ত রেল লাইন তৈরি হতে আরও চার-পাঁচ বছর লেগেছিল। লাইন শেষ হওয়ার পর কলোনী উঠে গেল। অফিসও উঠে গেল। সকলের চাকরিও চলে গেল। তালা ভেঙে মুখুজ্জেগিন্নীর জিনিসপত্রগুলো অফিসে জমা দেওয়া হয়েছিল। হারমোনিয়াম, বাঁয়া-তবলা, তাকিয়া-বালিশ সমস্ত। তারপর সে জিনিসগুলো কী হল শেষ পর্যন্ত—কেউ আর খবর রাখে নি।

আজ এতদিন পরে বিডন্ স্কোয়ারের পাশে সেই মুখুজ্জে মশাইয়ের সঙ্গে যে আবার দেখা হবে ভাবতেই পারা যায় নি।

বললাম, মুখুজ্জেগিন্নী কোথায়?

মুখুজ্জে মশাইয়ের মুখটা যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

বললাম, শেষকালে কিনা আপনি অনুপপুরের সকলের জাত মারলেন মুখুজ্জে মশাই?

মুখুজ্জে মশাইয়ের চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল টপ্ টপ্ করে।

বললাম, বিয়ে করতে আর মেয়ে পেলেন না আপনি? ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে শেষকালে কি না...

মুখুজ্জে মশাই আমার হাত ছাড়িয়ে চলে যাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি ধরে রাখলাম।

বললাম, বলুন আপনি, আপনাকে বলতেই হবে, কেন আপনি বিয়ে করে-ছিলেন একটা বাজারের মেয়েমানুষকে? কোত্থেকে পরিচয় হল আপনার সঙ্গে।

মুখুজ্জে মশাই আমার দিকে অসহায়ের মত চাইলেন।

বললেন, বিশ্বাস কর ভায়া, আমার সঙ্গে বেনারসীর ছোটবেলা থেকে ভাব ছিল, সেই দু-তিন বছর বয়স থেকে। আমাদের এক গাঁয়ে বাড়ি কিনা, বেল-ডাঙ্গাতে—

BanglaBook.org

মুখুজ্জে মশাই এইটুকু কথা বলতেই যেন হাঁপিয়ে পড়লেন।

তারপর বললেন, তোমরা বিশ্বাস করবে না জানি ভায়া, কিন্তু বারো বছর বয়স পর্যন্ত আমি জানতাম ওর সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে, বেনারসী আমাকে খুবই ভালবাসত কি না! আর আমিও ওকে ভালবাসতাম—সত্যি কথা বলতে কি!

বললাম, তারপর?

—তারপর কী যে হল, ওরা ওদের এক মামার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করতে কলকাতায় গেল একটা যোগে, তারপর আর ফিরল না। গেল তো গেল। গরীব বিধবা মা, বাড়িটাও ছিল ভাঙা—

—তারপর?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, তা তোমার বয়স হয়েছে, তোমাকে বলতে আর লজ্জা নেই, প্রায় কুড়ি বছর পরে বেনারসীর সঙ্গে আবার হঠাৎ দেখা—

বললাম, কোথায়?

—ওই ওরই ঘরে, দুর্গাচরণ মিত্তির স্ট্রীটের একটা বাড়িতে তখন ও থাকে, সেখানে গান শুনতে গিয়েছিলাম ওর, খুব ভালো ঠুংরি গাইতে পারত কিনা ও, তা আমি ওকে চিনতে পারলাম প্রথম। বললাম, বেনারসী না?

মুখুজ্জে মশাই কোটের একটা হাতা দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন।

বললেন, সেই দিনই বামুন ডেকে ও আমায় বিয়ে করে ফেললে—

বললাম, তারপর?

মুখুজ্জে মশাই বললে, এই পার্কের মিটিং দেখতে দেখতে তাই ভাবছিলাম, আইনও পাস হল তো সেই, কিন্তু আর কটা বছর আগে পাশ হলে কী ক্ষতি হত!

এতক্ষণে যেন আমারও অনুপপুরের মুখুজ্জেগিন্নীর কথা মনে পড়ল।

বললাম, মুখুজ্জেগিন্নী এখন কোথায়?

মুখুজ্জে মশাই তেমনি বলতে লাগলেন, তারপর থেকে ভায়া চাকরি নিয়ে যেখানেই গিয়েছি, সব জায়গাতেই একদিন-না-একদিন ধরা পড়ে গিয়েছি— কোথাও গিয়ে শান্তি পাই নি।

আবার বললাম, মুখুজ্জেগিন্নী এখন কোথায়?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, মারা গেছে।

আমি চুপ করে রইলাম শুনে।

মুখুজ্জে মশাই বলতে লাগলেন, শেষ জীবনটা ভায়া বড়ই কষ্টে কেটেছে তার, মনের মধ্যে দগ্ধে দগ্ধে পুড়েছে, আর কেবল লুকিয়ে এসেছে, শেষের কদিন তো কথাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—

॥ সমাপ্ত ॥

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org